প্রভু অতুলকৃষ্ণ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ্য ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী

আচার্য্য কাশীনাথ মল্লিক ভাগবত বিদ্যালয়।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী
সম্পাদক-সঙ্কর্ষণ
১৬১, হ্যারিসন রোড্
কলিকাতা
১৮৯৩।

নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস, ৬, ডাফ্ ষ্ট্রীট, হইতে
শ্রীরঙ্গলাল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"স্মৃতি অর্ঘ্য"

হে অতুলানন্দ সমুৎসারিত প্রেমপ্রমূর্ত্ত-বিগ্রহ অখণ্ডানন্দ-দানবিলাসিন্, মধুরানন্তাশ্চর্য্য পথচারিন্ !

হে সুমঙ্গলসংবিজ্ঞান রসৈকধারাসমুচ্ছলিতবক্ষ জনগণমনোভিরমণীয় বন্দনীয় চরণার বিন্দাচার্যবর্য্য !

হে দিব্যালোক প্রদায়কাদর্শ নিখিল গুণরাজ বিমণ্ডিত সন্তশিরোমণি !

হে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরৈক নাম-কৈরব প্রবোধন-চতুর সাধক সুধাকর !

হে সজ্জনবিলসিত নিত্যবৃন্দাবন লীলা বিহঙ্গম !

হে নিত্যানন্দান্বয়-প্রণয়মিলিততনু ভগবৎ-কৃপামরন্দ সেবনাকৃষ্ট পরিত্যক্তপরিজন বৃন্দারণ্যপলায়িত প্রেম-প্রমত্ত ভৃঙ্গরাজ !

হে নিকুঞ্জাভ্যন্তর প্রেমবিলাস সুখদ সরোবর বিকশিত সুকোমল কমল সংলালিত ভাগবত পরমহংস গুরুমহারাজ ! তোমার জয় হউক !!

সঙ্কেত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ভক্তি চরিত্র	...	...	...	১॥০
সন্ধানীর সাধুসঙ্গ	...	...	...	১॥০
জ্ঞানেশ্বরী	...	...	...	৪৲
উপদেশ ও শিক্ষা	...	...	...	॥০
গল্পে ভাগবত	...	...	...	২৲

প্রাপ্তিস্থান—(১) **কাশীনাথ মল্লিক ভাগবত বিদ্যালয়**

১৬১ নং হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা

(২) **ডি, এম, লাইব্রেরী**

৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুটি কথা

প্রভুপাদ স্বয়ং আমাকে তাঁহার জীবনের অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে নির্দ্দেশ দিতেন। তখনও বুঝি নাই আমাকেই এই মহিমান্বিত পুরুষের জীবনকথা সঙ্কলন করিতে হইবে। ভক্তচরিত্র, সন্ধানীর সাধুসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি মহাপুরুষ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছি কিন্তু শ্রীগুরু পাদপদ্মের কথা বর্ণনা করিতে বসিয়া কি লিখিব আর কি লিখিব না ভাবিয়া চঞ্চল হইয়াছি। শ্রীগুরু মহিমা সীমাহীন, আমার যোগ্যতা ও সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। আত্মকথা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি এই গ্রন্থের বহুলাংশ প্রভুপাদের নিজের লেখা বলিয়া আমি বুকে বল পাইয়াছি। চতুরশীতি বর্ষারম্ভে এই গ্রন্থরূপে তাঁহার পুনঃ প্রকাশ হউক।

ঢাকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী তাহার শেষ সম্বল পর্য্যন্ত দান না করিলে এই গ্রন্থ প্রকাশ হইত না। এই দানের নিমিত্ত আমরা চির-কৃতজ্ঞ থাকিব। এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে যাঁহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন সেই আমার গুরুভ্রাতা গোবর্দ্ধনাশ্রিত গোপীনাথ বসাক, শ্রীহরিলাল বসাক, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সিংহ মহাপাত্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া শ্রীগুরুদেবের জীবনাদর্শ জনসমাজে সুপ্রচারিত করিতে থাকুন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী—

প্রাণকিশোর
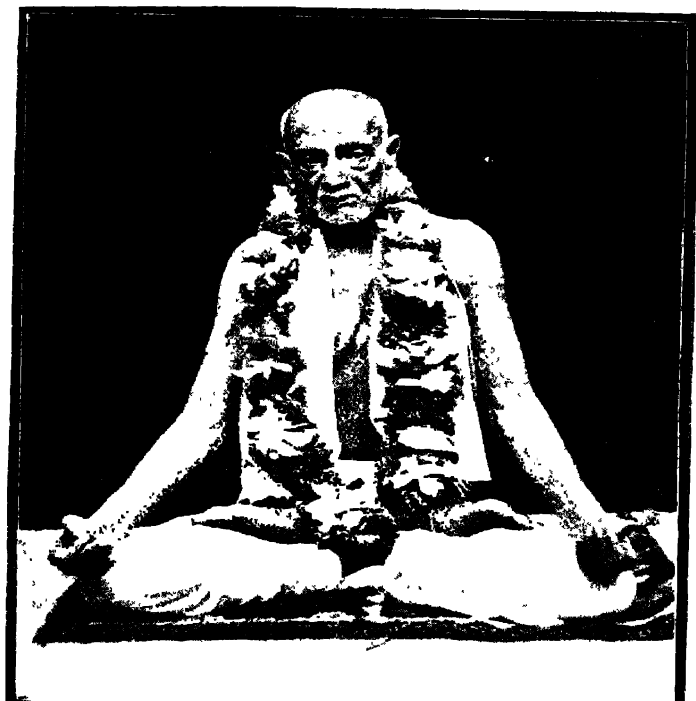
প্রভু অতুলকৃষ্ণ

প্রভু
অতুলকৃষ্ণ

—অবতরণিকা

ভারতীয় মহামানবের পরিচয়ে ভারতীয় সাধনার পরিচয়। সাধনার বৈচিত্র্য ভারতের বিশিষ্ট সম্পৎ। বিচিত্র সাধনার একতানতা, যোগ-ভঙ্গী ও সমন্বয় মহাসাধকের জীবন-ছন্দ। ভারত-সেবাব্রতী মহাপুরুষ নানা বিরোধের মধ্যেও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি দ্বারা অখণ্ড সাধনার ধারা অকুণ্ঠ গতিতে করিয়াছেন চির-প্রবাহিত। দেশ কাল ও সমাজের সীমারেখা তাঁহাদের অধ্যাত্ম জীবন-প্রবাহকে কোনরূপে সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ। অনন্ত আনন্দ অভীপ্সা সাধকের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করিয়া কালাতীত প্রেমের ছবি দেখাইয়া দিয়াছে। যাঁহারা অনাদি অতীতকে বর্ত্তমানের আকাঙ্ক্ষায় রূপায়িত করিয়াছেন—ভবিষ্যতের যোগসূত্র ধরাইয়া নবজীবনের সূচনা করিয়াছেন—তাঁহারাই ভারতের মহাপুরুষ।

অগণিত মানব প্রতিজনেই পৃথক আকার, প্রকৃতি ও গতির মধ্যে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য ও আনন্দ ক্ষুধাকে ছন্দোবদ্ধ করিবার নিমিত্ত লালসান্বিত। এই অক্লান্ত লালসা তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের অভিব্যঞ্জক। ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে অন্তরের গভীর সংবেদন হয় প্রতিধ্বনিত। প্রতিটি পদ-চারণায় তাঁহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রকাশ। সকল সমাজে সব সময় বিশিষ্ট ব্যক্তির মর্ম্মসুষমা ধরা পড়ে না। বিলক্ষণ শক্তিমান পুরুষের কাছে সেগুলি বিশেষ মহত্বপূর্ণ বলিয়াই অনুভূত হয়। মহানের আদর্শ অনুকরণ করিয়া অযোগ্য ব্যক্তি যখন অনুচর-সহধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তখন প্রাণহীন মিথ্যানুকরণ হয় সমাজে একান্ত শোচনীয় ও হাস্যাস্পদ।

রণকুশল রাজ্যলোলুপ বিজয়ীবীর অকুণ্ঠপ্রতাপ নৃপতির দুর্দ্দান্ত গৌরবের কথা অধিককাল মানবের মনকে আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ রাখিতে পারে না। শান্তি, সুখ ও আনন্দের ক্ষুধায় মানব-মন সহজভাবেই বিমোহিত হইয়া থাকে সেই সকল মহানের চারিত্রিক মাধুরীর আকর্ষণে—যাঁহারা যুগে যুগে আনন্দময়ের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন তাপদগ্ধ ক্লিষ্ট মানবের হৃদয় দ্বারে। দেহের পরাভব অল্পকাল স্থায়ী—অন্তরের জয় চিরন্তন সুখের প্রবর্ত্তক। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ভারত মনের অভিলষিত আনন্দের মূর্ত্তরূপ। কবীর, নানক, রুইদাস, রূপ, রঘুনাথ, সনাতন, মীরা, তুলসীদাস প্রভৃতি সেই আনন্দবার্ত্তা বহন করিয়া অধ্যাত্মলোকে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছেন।

নবপ্রাণধারায় পরিপুষ্ট ভারতীয় মহাপুরুষগণের মধ্যে এই সেদিনও যাঁহারা বাংলার ভূমিকে ধর্মামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন, রামপ্রসাদ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার বিশেষত্ব সকল দেশের সকল বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করিয়া একান্ত আপনার করিয়া লওয়ার মধ্যে। বাঙ্গালী এই দিক দিয়া যে প্রাণধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রমাণ বাংলার ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বাঙ্গালীর জীবনে। দ্রাবিড় সভ্যতা, পশ্চিমের দেবতা, উত্তরের সাধনার সঙ্গমতীর্থ বাংলা দেশ। অন্যান্য সাধনার কথা ছাড়িয়া দিলেও যে ভক্তি দ্রাবিড় দেশে আলোয়ারের গানে উৎপন্না তাহার নবীন প্রাণ স্পন্দনের পরিচয় বাংলার কীর্ত্তনে। যে পরমদেবতা কৃষ্ণ বাসুদেব পশ্চিমে মথুরা বৃন্দাবনে আবির্ভূত তাঁহার অখিল রসামৃত মূর্ত্তির উপাসনা বাংলা দেশে। উত্তর কাশ্মীরের শিবশক্তি মিলন তন্ত্র বাংলার

সহজ তন্ত্রের মধ্যে বাউলের দেহতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া সঙ্গত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড বাংলার মাটিতে কোনোকালে সমাদর লাভ করিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। স্মৃতির কঠোর শাসনে সমাজকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা কতদূর সম্ভব তাহা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেই পণ্ডিতাভিমানীগণ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন। রসশূন্য তান্ত্রিকতার স্থান বাংলায় হইতেই পারে না; সহজীয়া খুব সহজ রীতিতেই তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। এদেশে পদাবলী, মঙ্গলগান, বাউল, ভাটিয়াল, পল্লীসংগীত, ধ্রুপদ ও খেয়ালকে কোণ ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। গানের সঙ্গে বাঙ্গালী সুকঠিন সাধনার মিলন ঘটাইয়াছে অতি রমণীয় ভাবে। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও বাঙ্গালী তাহার স্বাধীন সরল মধুর রস সংস্কৃতিকে চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবেই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। বাংলার প্রাণ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ চিন্ময় প্রেমপ্রবাহ রূপে শিল্প, কলা, সংগীত, সাহিত্য ও সাধনায় মূর্ত্ত রহিয়াছেন বাংলাদেশে।

বাংলার ধর্ম্ম—উহা শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব যাহাই হউক উহার মধ্যে প্রেমগন্ধ থাকিবেই। বাংলা দেশে মাটি দিয়া শিবমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা হয়। দক্ষিণ দেশ বা কাশ্মীর প্রদেশের শিবপূজার সঙ্গে এই পার্থিব শিব পূজার বেশ পার্থক্য আছে। বাংলা দেশে উমা শংকরের বিবাহের কথা খুবই প্রচলিত। বাংলার মা উমাকে নিজের মেয়ে বলিয়া জামাই শিবের নেশা করার কথা উল্লেখ করে। এখানে শক্তি আরাধনার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তন্ত্র প্রভাব বিস্তৃত হইলেও প্রেম ভক্তিকে কোনো মতে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। মালসী গানে মায়ের সঙ্গে সাধকের যে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়, উহা কোনো তন্ত্র বা মন্ত্র পারে না। কঠিন মন্ত্র উচ্চারণ বা তান্ত্রিক সাধনা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের জন্য। গানের ভিতর দিয়া সাধনা ও অনুভূতি সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের জন্য। শিব

গৌরী এই প্রীতি মাখা ভাবের মধ্য দিয়াই বাংলার বুকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

এক কালে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমগ্র বাংলা প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল উহাও কালক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বড় বড় পণ্ডিতের অভাবে চারিদিক্ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর আক্রমণ হইতেছিল। মুসলমানেরা অনেককে প্রলুব্ধ করিয়া বা জোর করিয়া মুসলমান করিল। বড় বড় বিহারগুলি মুসলমানেরা দখল করিয়া লইল। এমন কি বালানড়া পরগণায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল উহাও মুসলমানের অধিকারে গেল। এখন সেই বালানড়ায় সব মুসলমান। তাহারাই মাদুর বুনে মাদুর বুনিবার জন্য হিন্দু এক ঘরও সেখানে নাই। বিহার নষ্ট করিয়া সেখানে মুসলমান বসিল এবং অনায়াসে চারি পাশের লোক মুসলমান করিয়া লইল। তাই মুসলমান বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া লয়। বৌদ্ধরা যাহারা মুসলমানের প্রভাব হইতে রক্ষা পাইল তাহারা সমাজে প্রবেশের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এই সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ তাহাদিগকে হিন্দুর সমাজে বৈষ্ণব সাধনার অংশীদার করিয়া গ্রহণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র এই সংস্কার ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাৎকালিক সমাজের সকল প্রকার বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অগণিত পতিত, ভ্রষ্ট ও দুরাচার ব্যক্তিকেও বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করাইলেন। তাহাদিগকে বৈষ্ণব সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বীরচন্দ্র পতিত-পাবন নিত্যানন্দ কুলের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের জন্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে, যথা—

ধন্য ধন্য বহু লক্ষ্মী বলে সর্ব্বজন।
পুত্র প্রসবিলা যেমন চন্দ্রবদন॥

পঞ্চদশ মাস তেজোরূপী যে রহিলা।
মার্গশীর্ষ শুক্ল চতুর্থীতে প্রসবিলা॥
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার॥

বীরচন্দ্র প্রভুর তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ, মধ্যম রামকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ রামচন্দ্র। এই কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহ গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করেন। প্রাচীনকাল হইতে গৌরনিত্যানন্দ অনুরাগী উড়িষ্যা ও প্রদেশান্তর হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দকে এই শ্যামসুন্দর মন্দিরে আশ্রয় দেওয়া হইত এবং প্রসাদ দেওয়া হইত। অদ্যাবধি শ্রীপাট খড়দহে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের সেবা রামচন্দ্র প্রভুর বংশধরেরাই করিতেছেন। রামচন্দ্রপ্রভুর শাখায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের আবির্ভাব। প্রভুপাদের পরিচয় দিতে যাওয়া আর প্রদীপ হাতে সূর্য্য দেখাইতে যাওয়া এককথা। তিনি "আত্ম পরিচয়ে" যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি। "আমি খড়দহের গোস্বামী। খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জিউর পালা আজিও আমাদের আছে। বালাখানা বাটীই তথাকার বাটী ছিল। প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আমাদের আদি পুরুষ আমি তাঁহা হইতে ত্রয়োদশ। বংশবল্লী এইরূপ,

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু
২। বীরচন্দ্র (বীরভদ্র)
৩। রামচন্দ্র
৪। রাধামাধব
৫। রাঘবেন্দ্র
৬। গোপালবল্লভ
৭। হরিরাম

৮। লালবিহারী

৯। কৃষ্ণচন্দ্র

১০। অদ্বৈতচন্দ্র

১১। হরনাথ

১২। মহেন্দ্রনাথ

১৩। অতুলকৃষ্ণ

নবম পর্য্যায়ে অবস্থিত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভু খড়দহ বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। সন ১২০৫ সালে সিমুলিয়ার বাটী খরিদ হয়। কোন এক ভক্ত শিষ্য অর্থ সাহায্য করেন।"

[illegible]

যে সততই শ্যামসুন্দরের সমীপেই পড়িয়াছিল এ বিষয় নিঃসন্দেহ। প্রভুপাদের প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক খড়দহে বাড়ী খরিদ করিয়া রাখার সখ দেখিয়া উহা বুঝা যায়। এখনও শ্যামসুন্দরের মন্দির সংলগ্ন একটি গৃহ প্রভু কিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রভুপাদের ভক্তগণ মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাপূজা দিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি প্রভুপাদের যে প্রীতি তাহা বর্ণনাতীত। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন—"যাহোক বাড়ীখানিতে যে দুটো ফুল ফোঁটে উহাতো শ্যামের সেবায় লাগে। এইতো বাড়ীর সার্থকতা। তবে আমার আরো একটু স্থান ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে সেটুকু হলে শ্যামের নিজস্ব একটি বাগানবাড়ী করা যাবে।" মাতামহকুলের পরিচয় দিয়া তিনি বলিয়াছেন,—তারকেশ্বরের নিকট গাবাজার পাড়াম্বো গ্রামে মাতুলাশ্রম। মাতামহ ৺মুক্তারাম রায়। ইহাদের কামারবুড়ী ঠাকুর আছেন। বড় জাগ্রত ঠাকুর। (১৩১৪ সালের লেখা) এক বিধবা মামী আছেন, আর কেহ নাই। আমি একবার মাত্র

তথায় গিয়াছিলাম। ছেলেবেলায় ভোলানাথ মামাকে দেখিয়াছি সামান্য মনে পড়ে। মার নাম ভুবনমোহিনী। অমন মা কারুর হয় না।

তাঁহার জন্য আজিও সকলে ঝুরে মরে। লোকজনকে খাওয়াইতে এত ভালবাসিতে কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহার রন্ধন যে খাইয়াছে, ভুলিতে পারিবে না—যেন অমৃত। পতি ভক্তি যতদূর থাকিতে হয়। বাবা ১২টা ১টা যত রাত্রেই বাটী আসুন না কেন মা তাঁহাকে গরম গরম লুচি ভাজিয়া দিতেন। পিতার নাম মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ইনি পুরাণশাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইংরাজীও ভাল জানেন, সে কালের এল-এ, ফেল। স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। শ্রীমদ্ভাগবত খানা প্রায় সবই তাঁহার মুখস্থ। ছেলে বেলায় যাহা পড়িয়াছেন বার্দ্ধক্যেও তাহা ভুলেন নাই। মাতার মৃত্যুর পর অনেকে তাঁহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। মাতার মৃত্যুর পরদিন হইতে তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে এখন কষ্ট হয়। দুরারোগ্য রোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। প্রভু মহেন্দ্রনাথ জীবদ্দশায়ই এরূপ প্রসিদ্ধি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পবিত্র নামটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য যে গলিটিতে তাঁহার বসতবাড়ী উহার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মহেন্দ্র গোস্বামী লেন রাখা হয়। অদ্যাবধি এই নামে গলিটি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি ছিলেন ৺গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। পুরাণশাস্ত্র ভিন্ন তিনি ন্যায়শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে চাকুরী করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রভু-সন্তান অপরের চাকুরী করিতে যাইতেছে এই বিষয় লইয়া শিষ্য মহলে অত্যন্ত উদ্বেগের সৃষ্টি হওয়ায় এক দিনের কথায় সে কালের একশত টাকা মাহিনার চাকুরী তিনি অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া দেন।

তিনি স্বনাম-ধন্য মহাপুরুষ। সহ্যগুণ শিখিতে হয়তো তাঁহারই কাছে শিখিতে হয়। এরূপ সহ্যগুণ রক্তমাংসের শরীরে যে হইতে পারে তাঁহাকে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

তাঁহার তিন বৎসর বয়সে মাতার এবং আট বৎসর বয়সে পিতার পরলোক হয়। জ্যাঠাইমা মানুষ করেন। তাঁহার নাম মধুমুখী। ইনিই সিমলার মা গোঁসাই নামে পরিচিত। মা গোঁসাই খুব ভজননিষ্ঠ ও অতিথি-সৎকার-প্রিয় ছিলেন। নিজে খাইতে বসিতেছেন এমন সময় অতিথি আসিল, নিজের পাতখানি তাঁহাকে ধরিয়া নিজে উপবাসী থাকিতেন। ইহা বহুবার দেখিয়াছি। মা গোঁসাই যাহাকে যাহা বলিতেন তাহাই ফলিত, যাহাকে যাহা হাতে করিয়া দিতেন, তাহাই তাহার মহৌষধি হইত। তাঁহার জীবদ্দশায় আমাদের সংসার আনন্দের হাট ছিল। কত লোক কত জন বাড়ীতে থাকিয়া খাইয়া দাইয়া লেখা পড়া শিখিত, কত লোক আসা যাওয়া করিত, কত গান বাজনা কীর্ত্তন কথকতা হইত, তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই।

পিতা পড়া শুনাই করিতেন, শিষ্য সেবক বড় একটা দেখিতেন না। নিজে উপযাচক হইয়া কাহাকেও মন্ত্র দেন না। বিনা আহ্বানে কাহারও বাটী যান না। এক ভগবান্ ভিন্ন কাহারও কাছে কিছু চান না। তাঁহার শিষ্যের তালিকা নাই, ও সকলের খোঁজ খবর রাখেন না। জানেন এক শাস্ত্রচর্চ্চা আর সাধন ভজন।

নবদ্বীপ চাঁদ প্রভু (শ্রীবাস অঙ্গনের) শাস্ত্রীয় বিচারে এক আমার পিতা ছাড়া আর কাহারও ভয় করিতেন না। তাহার মত যে কতদূর ভ্রান্ত-অযুক্তি-যুক্ত তাহা দেখাইয়া আমার পিতা একবার "জন্মাষ্টমী ভ্রমখণ্ডন" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে পিতার আদরও যথেষ্ট। আজিও সর্ব্বত্র সসম্মানে বিদায় পাইয়া থাকেন। পাঠ

ব্যাখ্যা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। সেই অর্থই এখন তাঁহার জীবিকা। তাহার মত আত্মনির্ভরশীল সংসারে আসক্তি শূন্য সতত সাবধান মহাজন অতি বিরল। আহার সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সতর্ক। তিনি বলেন আমার সমসাময়িক যাহারা প্রস্রাবের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের একজনও ইহলোকে নাই। সকলেই ডাক্তারের পরামর্শে মাংস খাইয়াছে। প্রথম প্রথম একটু আধটু উপকার বোধ করিয়াছে। তার পর শীঘ্র শীঘ্র।যমালয়ের অতিথি হইয়াছে। আমিই কেবল মাংস খাই নাই তাই আমিই কেবল আজিও বাঁচিয়া আছি। ১৭৫৭ শকাব্দায় ২৭শে কার্ত্তিক তাঁহার জন্ম।

—জন্মকথা

ঘোর অমাবস্যার রাত্রি। আজ যেন খুব বেশী বেশী অন্ধকার বলিয়াই বোধ হইতেছে। বৎসরের মধ্যে এমনতর অন্ধকার রাত্রি বুঝি আর একটিও নাই। এই অন্ধকারপূর্ণ অমাবস্যার রাত্রির সঙ্গিনী হইয়াছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দেবী কালিকা। মাঝে মাঝে ঢাকের বাজনাও শুনা যাইতেছে। এ কি অন্ধকার রজনীর অন্ধকার যে আর বুঝা যাইতেছে না! হঠাৎ দীপশ্রেণী গৃহের দ্বারে দ্বারে সাজাইয়া রাখিল কেন? বুঝিয়াছি আজ দীপান্বিতা। একদিকে অন্ধকার অপরদিকে আলোক শ্রেণী মানাইয়াছে ভাল। সঙ্গে মহাশক্তির আবাহন মন্ত্র ও উচ্চারিত হইতেছে। এমন সময় পৃথিবীতে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। ১২৭৪ সাল কার্ত্তিক মাসের দশম দিনে রাত্রিকালে দেবীর পূজার সময়েই তাঁহার মর্ত্ত্যলোকে আগমনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইনিই মাতা গোস্বামী ভুবন মোহিনীর সাধনার ধন "অতুল" পিতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভুর মূর্ত্তিমান জীবনাদর্শ বুঝি এই "চাঁদ"কেই খুঁজিতেছিল। মহামায়ার পূজার ঢাক যাঁহার আগমন কালের মঙ্গল বাদ্য

হইয়াছিল—শঙ্খধ্বনি যাঁহার বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল—বৈষ্ণবী শক্তির আবাহন মন্ত্রই যাঁহার জন্মকালীন স্বস্তিবাচন হইয়াছিল—গৃহে গৃহে প্রজ্বলিত দীপশ্রেণী যাঁহাকে অজানিত ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—সেই বরেণ্য প্রভু অতুলচাঁদ শিমুলিয়ার গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। প্রভুপাদকে আমরা অতুলকৃষ্ণ বলিয়াই জানি। তাঁহার আর ভাইএদের নাম গোকুলচাঁদ গোবিন্দচাঁদ ও মাণিকচাঁদ। প্রভুর নাম কেন অতুল"চাঁদ" না হইয়া "কৃষ্ণ" হইল একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "আমার নাম—অতুলচাঁদই ছিল। এখন হইয়াছি অতুলকৃষ্ণ। ইহার একটু বিশেষ ইতিহাস আছে। তাহা এই—আশুতোষদের (তারক প্রামাণিক মহাশয়েদের) বাড়ীতে একজন এন্‌গ্রেভার আসিতেন। সকলে তাহাকে মিস্তির-জা বলিয়া ডাকিত। একবার তিনি আশুতোষের একটি মনোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া আনেন, দেখিতে বেশ। উপরে রাধা কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। শ্রীমতীজী স্বর্ণ বর্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণজী শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত তাহার নিম্নে আশুতোষের নাম লোহিত বর্ণে সুশোভিত। সকলেই বেশ বেশ বলিতে লাগিলেন। আমারও বড় ভাল লাগিল, বন্ধু-বৎসল আশুতোষ তাহা বুঝিতে পারিল। আমার অজ্ঞাতসারেই মিস্তির-জাকে আমার নামে ঐরূপ মনোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া দিতে আদেশ করিল। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই মিস্তির-জা দুটি পিত্তলের মনোগ্রাম ও পাঁচশত করিয়া ঐ মনোগ্রাম ছাপা চিঠির কাগজ ও খাম লইয়া আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। চিঠি কাগজের মনোগ্রামটি ঠিক আশুতোষেরই মত। খামের মনোগ্রামটি সাধারণ বাদামী মোহরের মত বেগুনে রঙে ছাপা। দুইটিই বেশ পছন্দ সই। কিন্তু ও হরি, একি হইয়াছে, নাম পড়িতে গিয়া দেখি, অতুলচাঁদ অতুলকৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে! আমি আশুতোষকে মনোগ্রাম দেখাইলাম। পরিবর্ত্তিত নাম দেখিয়া একটা খুব হাসির ধুম পড়িয়া গেল। আশুতোষ হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল বেশ বেশ আজ হইতে তুমি

অতুলকৃষ্ণই হইলে। আমিও বলিলাম তথাস্তু। সেই হইতেই আমি অতুলকৃষ্ণ হইয়াছি।

ইহাই হইল নাম পরিবর্ত্তনের প্রধান ও প্রকৃত কারণ কিন্তু আমি রহস্য করিয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে অন্যান্য কারণও বর্ণনা করিয়া থাকি। তাহার দু' একটিও বলিয়া রাখি।

কাহাকেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলি জান না হে, আমাদের মতে এটা যে দ্বাপর যুগ, তাই "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" কাহাকেও বা বলি আগে বড়ই ভাল ছিলাম—চাঁদই ছিলাম, কলঙ্ক একটু আধটু ছিল মাত্র। এখন কলঙ্কের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে, সব কালোয় কালো হইয়া গিয়াছে, তাই চাঁদ ঢাকা পড়িয়া কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে! অতুলকৃষ্ণ কি না তুলনা রহিত কালো। আবার কারুর কাছে এরূপ ব্যাখ্যাও করি—আমি নরকের কীট "আশুতোষ আমায় নরক হইতে কাড়িয়া কৃষ্ণ পাদপদ্মে স্থান দিয়াছে। লবণাকরে যাহা কিছু পড়ে সবই লবণ হইয়া যায়। আমিও কৃষ্ণ পাদপদ্মে স্থান পাইয়া কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছি। সে যাহা হউক আমার গুরুজন সকলে এখনও আমাকে অতুলচাঁদ বলিয়াই ডাকেন। কলেজে অতুলচাঁদই নাম ছিল। বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রে ১৩০৩ সাল ৭ই অগ্রহায়ণ—সেবার আমার ব্যাখ্যা বক্তৃতার প্রথম প্রশংসা বাহির হয়। আমার বেশ মনে আছে, তাহারা লেখেন, গোস্বামী—অতুলচন্দ্র কালে অতুলচন্দ্রই হইবেন। আমার অদৃষ্টে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি চাঁদ না হইয়া কৃষ্ণ হইয়া গেলাম। কেহ মরিয়া গেলে অনেকে বলে অমুকের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি বলি আমারও হইয়াছে তাহাই, রোগে শোকে আমিও বাঁচিয়া মরিয়া আছি, কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

ইহারা চারি ভ্রাতা ও দুই ভগিনী। সকলের বড় ভগিনী নাম রতনমঞ্জুরী। বাগবাজারে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র চণ্ডীচরণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভগ্নীপতি ভাল চাকুরী করিতেন, ৫৫০ টাকা মাহিনা পাইতেন। সকলের ছোট নাম রাণী। আহিরীটোলা নিবাসী ৺নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পূর্ণচন্দ্র বি, এ পাশ ক্লার্কসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একবার এক সাহেবের সহিত কি কিটির মিটির হয় সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করে সাহেবের চাকুরী আর করিবে না। সামান্য ছেলে পড়াইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রাণীর অপর নাম খুদী।

বড় ভাইর নাম গোকুলচাঁদ। ইনি শৈশবে খুব ভাল ছিলেন। বেশ লেখাপড়া করিতেন। সংস্কৃত কলেজে দুই ভাই একত্র পড়াশুনা করিতেন। প্রভুপাদ বলেন—দাদা ফার্ষ্ট প্রাইজ পাইলে আমি সেকেণ্ড প্রাইজ পাইতাম। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত এইরূপেই কাটিয়া যায়! দাদার পড়াশুনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। চরিত্রও পবিত্র ছিল। এক বুড়ী দাদাকে মানুষ করে। তাহাকে আমরা বুদী বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের পুকুর ধারে তাহার খোলার ঘর ছিল। তাহার লুকানো টাকা অনেক ছিল। কেহই জানিত না। মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। বুদী মরিবার সময় ঐ টাকাগুলি দাদাকে দিয়া যায়। প্রভুপাদের পরে গোবিনচাঁদ। ইনি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর মাণিকচাঁদ। প্রভুপাদের খুল্লতাত অপুত্রক ছিলেন। তাহার উইলের আদেশ অনুসারে খুড়ীমা তাহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। কাজেই এখন প্রভুপাদ একাই।

—বিবাহ

প্রভুপাদ আত্মকথায় লিখিয়াছেন, "আমার বিবাহও এক অদ্ভুত ব্যাপার। মাতা মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া পড়িয়াই আমার বিবাহ দিবার আয়োজন করেন। আমি কিন্তু বিবাহ করিতে কিছুতেই সম্মত হই না। আমার একটা কেমন জেদই ছিল বিবাহ করা হইবে না। মা কিন্তু আমার কথায় কান

না দিয়া বিবাহের যোগাড় যন্ত্র করিতে লাগিলেন। গায় হলুদের দিন পর্য্যন্ত ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল। আমি বেগতিক বুঝিয়া একদম বাঁকিপুর চম্পট দিই। ইহা হইল বৈশাখ মাসের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাসে মাতার মৃত্যু হয়। বাঁকিপুরে আমার ভারি জ্বর। মাতার আসন্নকাল উপস্থিত এই ভাবে টেলিগ্রাম যায়। আমি পথ্য পাইলেই রাধাকিশোর কাকা আমাকে ঔষধ ও লোক সঙ্গে দিয়া কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। যেদিন কলিকাতা আসি, তাহার দুই দিন পরেই মাতা আমাদের চিরতরে ছাড়িয়া চলিয়া যান। বাঁকিপুর হইতে আসিয়া দেখি, মাতার বাক্‌রোধ হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। মরিবার দিন প্রাতঃকালে তাঁহার মুখে কথা ফুটে। গৌর কবিরাজ মহাশয়ের সহিত রম্বে-আম ও দুধ দিয়া ভাত খাইবেন বলিয়া অনেকক্ষণ আব্দার করিলেন। কবিরাজ মহাশয়ও খাইতে বাধা দিলেন না। দাদা খাওয়াইয়া দিলেন। দুই একটি ভাত পেটে গেল কিনা সন্দেহ। তাঁহার আবার বাক্য বন্ধ হইয়া গেল। সকাল বেলা আমি যখন মার কাছে যাই, তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমি তোমার কিছু করিতে পারিলাম না; ইহাই মার মুখের শেষ কথা। সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গে আমরা সকলেই গিয়াছি কেবল বাবাই একা যান নাই। বোধ হয় শেষের দৃশ্যটা দেখা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

আমরা মাকে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চৈস্বরে শুনাইতেছি। গঙ্গার পূত সলিলের সমীপেই তাঁহার শয্যা স্থাপিত। চারিদিকে লোকজন অনেক। মা যেন কাহাকে দেখিবার জন্য এদিকে ওদিকে নয়ন ফিরাইতেছেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল এমন সময় বাবা আসিলেন আমার জাসতুতো ভগ্নীপতি দীনবাবু বলিয়া উঠিলেন, মেজ কাকিমা—ঐ দেখুন মেজ গোঁসাই এসেছেন। কথা শুনিয়াই মা ব্যস্ত সমস্তভাবে বাবাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। মা'র নয়ন সমক্ষে বাবা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মা একবার প্রাণ ভরিয়া বাবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। শেষ বাবার পদপ্রান্তে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিলেন। নয়নজল অবিরল ধারে বহিয়া যাইতে লাগিল। প্রাণবায়ুও তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে বিনির্গত হইয়া গেল। চারিদিকে ঘন ঘন হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমি মাতৃহারা হইলাম।

আমি ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও শেষের দৃশ্য দেখি নাই। ইহাই প্রথম। শ্মশানের মধ্যে আর যাইতে পারিলাম না। দাহক্রিয়ার অবসানে চুল্লীতে জল ঢালিতে গিয়াছিলাম। মাতার মৃত্যুর পর বড় মাসী আমার বিবাহের জন্য চেষ্টাচরিত্র করিতেন। আশুতোষদের বাটীর সকলেরও এবিষয়ে আগ্রহ যত্ন যথেষ্টই ছিল। কিন্তু আমি রাজী নই বলিয়া বড় একটা কেহ জোর জবরদস্তী করিতেন না।

এই ভাবেই দু' এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি গান বাজনায় মাতিয়া আছি। মাইফেল প্রায় ফাঁক যায় না। থিয়েটার দেখিতে যাই। অনেক বড়লোকের বাগানে বৈঠকখানায় যাতায়াত করি। যেখানে সেখানে খাই দাই, আর দিন কাটাই। মার শোক গানের ঝোঁকেই ভুলিয়া থাকি। প্রেমময় ভগবানকে বুঝা আর প্রেম বুঝা, প্রায় একই কথা মনে হয়। প্রেম বুঝিতে গিয়া অনেক সময় কামের আগুনেই অনেককে পুড়িয়া মরিতে হয়। পীরিতির পবিত্র প্রবাহে অবগাহন করিতে গিয়া কুরীতিই অনেককে লাভ করিতে হয়। উদ্দাম ইন্দ্রিয় লইয়া প্রেম বুঝিতে যাইলে ইহার অধিক আর কিই-বা আশা করা যাইতে পারে?

সত্যের অনুরোধে বলিতে কি, এই অসংযতচিত্ত ইন্দ্রিয়কিঙ্করকেও ঐ সময় এক কঠোর পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। প্রেম বলিয়া পীরিতি বলিয়া কি ধরিতে উধাও হইয়া ছুটিয়া ছিলাম। পা পিছলাইয়া পড়ি পড়ি হইয়াছিলাম। বন্ধুবর আশুতোষ না থাকিলে—হাত ধরিয়া না তুলিলে কোন্ নরককুণ্ডে

যাইয়া পড়িতে হইত বলা যায় না। একে দাদার চরিত্রদোষে বাবা সর্ব্বদাই দুঃখিত, তাহার উপর আমিও যদি দাদার মত চরিত্রহীন হইয়া পড়ি, তাহা হইলে তাঁহার আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। ইহাই হইল তখন আমার প্রধান চিন্তার বিষয়।

আমি আশুতোষের উপদেশে আসঙ্গলিপ্সা লইয়াই পীরিতি পর্ব্বের উপসংহার করিয়াছি। দুর্ব্বার ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রিয় ক্ষুধার সামগ্রী সম্মুখে পাইয়াও উপভোগ করিতে পারে নাই। অকৃত ব্রহ্মচর্য্য যথেচ্ছভোজী জীবের পক্ষে তখন তাহাদিগকে লইয়া স্থিরভাবে ঘর করা বিষম ব্যাপার। আমি তখন এক নূতন চিন্তায় অভিভূত হইলাম। অনেক চিন্তার পর ধর্ম্মপত্নী পরিগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। মানুষের ইচ্ছা যে কিছুই নয়, ভগবদ্ ইচ্ছাই যে পূর্ণ হয়, এ বিবাহ ব্যাপারে বেশ বুঝা গেল। আশুতোষকে হৃদয়ের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম! সে শুনিয়া ভারী খুসী হইল। বিবাহের চেষ্টা চরিত্র চলিতে লাগিল। শহুরে মেয়ে বিস্তর আসিয়া জুটিল। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে মেয়ের উপরই আমার আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে সেইরূপ সম্বন্ধই স্থির হইয়া গেল। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মশাগ্রামের চৌধুরী বংশীয় ৺কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অম্বুজাবালা দেবীর সহিত আমার বিবাহ হইল। শ্বশুর মহাশয় তখন তমলুক চাকুরী করিতেন, তাই তমলুক গিয়াই বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তখন আমার বয়স কুড়ি বা একুশ, পত্নীর বয়ঃক্রম দশ কিংবা একাদশ। বিবাহের পর বহুদিন সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। ১৫।১৬ বৎসর পরে সন ১৩১০ সালে ১২ই শ্রাবণ রাত্রি ১টার সময় একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। চারি মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই ১০ই কার্ত্তিক তারিখে ভগবান তাহাকে আপনার কাছে টানিয়া লইয়াছেন। ঐ ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসের প্রারম্ভ হইতেই আমি অনিরূপিত দুরারোগ্য জটিল পীড়ায় কাতর।

—সৎসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতীয় রাসলীলাদি অনুবাদ-প্রসঙ্গে মহানুভব ভাগবতাচার্য্য যথার্থ-ই বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানে অমৃত খাঞা
কে নহে অমরে।"

সাধুসঙ্গ অমৃত অপেক্ষাও অমৃত—পরামৃত। জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক তাহার ফল ব্যর্থ হইবার নহে।

আমারও হইয়াছিল তাহাই ; শৈশবে আমি অনেক মহাজনের সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জীবন তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। শৈশবের সে অজ্ঞানকৃত সৎসঙ্গ ব্যর্থ হয় নাই।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমি সৎসঙ্গ বলিতে বর্ণোচিত এবং আশ্রমোচিত ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জনের সঙ্গই বুঝি। কোন প্রকার আহার্য্য-শোভা-পরায়ণ ভেক-ধারীর সঙ্গ আমার এ সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গের বিষয়ীভূত নহে। অবশ্য যাঁহারা প্রেমভক্তি প্রভাবে বর্ণাশ্রমাদির গণ্ডী পার হইয়া প্রেমধামে অহরহ বিচরণ করিতেছেন, তাহারা যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান করুক না কেন, সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রদ্ধা-সমুচ্চারিত "সাধু" শব্দের সম্পূর্ণ দাবী রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচরণ আমাদের অনুকরণ বা অনুসরণের যোগ্য না হইলেও তাঁহাদের অঙ্গের পবিত্র বায়ুতে আমরা অসামান্য পবিত্রতা লাভ করিতে পারি। তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা সাধারণের বোধগম্য নহে। "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়—অন্যে পরে কা কথা। শালগ্রামের যেমন ছোট নাই বড় নাই, সাধুও তেমনই ছোট নাই বড়ও নাই। সাধু সবই সমান ; তা বর্ণশ্রেষ্ঠই হউন আর বর্ণাধমই হউন, কিংবা বর্ণ বহির্ভূতই হউন। ইহাই আমার ধারণা। একাদশ স্কন্ধে ভগবান

১৩১৪ সাল, অগ্রহায়ণ মাসে লিখিত।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সমীপে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুলীন গ্রামীর নিকটে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ বিভিন্নতা প্রখ্যাপন, তাঁহারা ভগবান, তাঁহাদেরই মুখে শোভা পায়। আমাদের মত বিষয়ান্ধ জীবের অতটা স্পর্দ্ধা ভাল নয়। তাই ঐ কথা বলিলাম। আমার সাধুসঙ্গের পরিচয় দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার কাঁসারীপাড়া নিবাসী প্রামাণিক পরিবারেব সঙ্গেরই উল্লেখ করিতে হয়। বিশ্ব-বিশ্রুত বদান্য ৺তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের নাম কে না শুনিয়াছেন? তাঁহার অনুরূপ পুত্র ৺কালীকৃষ্ণই বা কয়জনের অপরিচিত? তাঁহার চারিটী পুত্র—আশুতোষ, মন্মথনাথ, প্রমথনাথ ও বিনোদবিহারী। আশুতোষ আমার সমবয়স্ক। মাত্র তিন মাসের বড়। ৬ বৎসর বয়স হইতেই আমার তাহাদের বাটী গতিবিধি।

প্রামাণিক পরিবারের প্রকৃত পরিচয় প্রমাণ দুই চারি কথায় হইবার নহে। কেবল তাহাতেই একখানি বিপুল কলেবর গ্রন্থ হইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে তাহাতে বিরত থাকিতে হইল।

সংস্কৃত কলেজে এক গাড়ীতে পড়িতে যাইতাম। এক ক্লাশেই পড়াশুনা করিতাম। সকাল সন্ধ্যা তাহাদেরই বাড়ীতে তাহাদেরই গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করিতাম। তাহাদেরই দ্বারবান, বেহারা আমাকে বাটী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিত, আবার সঙ্গে করিয়া বাটীতে রাখিয়া আসিত। আহারাদি অনেক সময় একত্রেই হইত। আশুতোষ একটি দিবস আমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিত না। আমিও একদিন তাহাকে না দেখিলে অধীর হইয়া পড়িতাম। আশুতোষ স্ব-সম্পর্কিত যাঁহাকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করিত, আমিও তাঁহাকে তাহা বলিয়াই সম্বোধন করিতাম।

তাঁহাদের নিকট হইতেও তদনুরূপ ব্যবহারই পাইতাম, আজিও যাহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের কাছে সমব্যবহারই পাইয়া আসিতেছি।

আশুতোষ আশৈশব সংস্কৃতানুরাগী, আমিও তাহাই। তাই দুজনে মিলিয়াছিল ভাল। হুগলীর বর্ত্তমান সবজজ্ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশুতোষের প্রথম গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মত আদর্শ চরিত্রবান, সংযতেন্দ্রিয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সুকবি ও সুপণ্ডিত এ সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহার ন্যায় মহাজনের সঙ্গ স্বল্প সৌভাগ্যে ঘটে না। তিনি আমাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের জন্য—শাস্ত্রীয় সদাচার প্রতিপালনের জন্য যে কত যত্ন কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। আমরা গোড়াগুড়ি তাঁহারই হাতে গড়া, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার অনেকগুলি কবিতা "কবিকুঞ্জ" নাম দিয়া আমি প্রকাশ করি। তাহার পর সুপ্রসিদ্ধ সুকবি পরম ভাগবত পূজ্যপাদ তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় আমাদের গৃহশিক্ষকতা করেন। তাহার "মা" "কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে যে ভক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে, পঠদ্দশায় আমাদের অন্তরে তাহার যে কিঞ্চিৎমাত্রও সঞ্চার হয় নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? ভট্টপল্লী নিবাসী বিশুদ্ধ চরিত্র পূজ্যপাদ গণপতি বিদ্যানিধি মহোদয়ও আমাদিগকে কিছুদিন কাব্য সাহিত্য ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাহার সঙ্গও কিছুদিন পাইয়াছিলাম।

প্রবীণ ভক্ত মুন্সীজীর মুখে আমরা প্রতিদিন ভক্তি সহকৃত গীতা সহস্র নাম পাঠ শুনিতে পাইতাম।

আশুতোষ ও আমি উভয়ে একসঙ্গে তাঁহার নিকট উর্দ্দু ও ফারসী পড়িতে আরম্ভ করি, কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিল না, ছাড়িয়া দিই। আশুতোষ অনেক বই পড়িয়া ফেলে। মুন্সীজী দক্ষিণ দেশবাসী ব্রাহ্মণ

ছিলেন। ঠাকুরদাদা মহাশয়ের অর্থাৎ ৺তারকনাথ প্রামাণিকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতিদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা শ্যামলাল গোস্বামী, অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত উপেন্দ্র মোহন গোস্বামী প্রভু এবং আমার পিতা শ্রীপাদ মহেন্দ্র নাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, কত বড় বড় কথকঠাকুর কথকতা করিতেন, প্রথিত নামা কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন করিতেন, মাসিক বৃত্তিভোগী গায়কগণ হরিগুণ গান করিতেন, কত শত শত মহানুভব আসিয়া পদধূলি প্রদান করিতেন, বুঝি বা আর নাই বুঝি শৈশবে প্রামাণিক বাটিতে এ সকল সঙ্গ ঘটিয়াছে তো? ইহা কি কখনও ব্যর্থ হয়? নিজ বাটীতেও নিত্য হয় কথকতা, না হয় কৃষ্ণ মঙ্গল কিংবা রামায়ণ গান হইতই হইত। মার মুখেও নানাপ্রকার পৌরাণিক উপাখ্যান নিত্যই শুনিতে পাইতাম। পিতা প্রভৃতির সদাশয়তার কার্য্যাবলী প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতাম প্রস্রাব করিয়া জল লইতেছি কিনা, অভোজ্য ভোজন করা হইতেছে কিনা, চন্দন নগরের ঠাকুর দাদা মহাশয় তৎপ্রতি সততঃ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

সময় সময় নানাপ্রকার সরল শাস্ত্রীয় চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আমাদের চিত্ত-রঞ্জন করিতেন। এ সমস্তই বা ব্যর্থ হইবে কি প্রকারে?

চন্দন নগরের ঠাকুরদাদা বাবার জেঠাইমা মধুমুখী মা গোস্বামীর ভ্রাতা। নাম কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য। বাঁকিপুরের প্রধান উকিল রাধা কিশোর ভট্টাচার্য্য ইহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। চন্দননগর বুড়ো শিবতলায় ইহাদের বাড়ী। ইনি এবং ইহার চারিপুত্র রাধা কিশোর, জগৎ, গৌর ও নিতাই আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন। ছেলেদের লেখা পড়া প্রভৃতির সমস্ত ভার মা গোস্বামীরই ছিল। ঠাকুর দাদা মহাশয় মহাপুরুষ ছিলেন। আমি তাঁহারই সমীপে গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করি। তিনি কখনও শোকে কাতর হইতেন না। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অতুলনীয়। সহ্যগুণ অসাধারণ চাল চলন সাধারণ। রহস্য-পটুতা বাবদুকতা মৃতসঞ্জীবন। তিনি কথায় কথায় গল্পরচনা করিতে

হাসাইয়া হাসাইয়া লোকের পেট ফাঁসাইতে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখিতেন। ভারি তেজী, স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

মহানুভব রামকৃষ্ণ পরমহংস যে কি বস্তু, তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, শৈশবে তাঁহারও সঙ্গ পাইয়াছিলাম। পাথুরিয়াঘাটা প্রসিদ্ধ জমিদার যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বর বাগানবাটীতে একবার একমাস পুরাণ পাঠ হয়। বাবা ঐ পাঠে ব্রতী ছিলেন। রাসমণির কালীবাটী এবং যদুবাবুর বাগান বাটী পাশাপাশি। পরমহংস মহাশয় ঐ কালীবাড়ীতেই থাকিতেন। ঐ সময় বাবার সহিত তাঁহার বড়ই বন্ধুতা জন্মে। প্রতিদিন অনেক রাত্র পর্য্যন্ত দুজনে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে বসিয়া ভাগবতীয় ভক্তিরস আস্বাদন করিতেন। একথা বাবার মুখেই শুনিয়াছি। পরমহংস মহাশয়ের প্রধান শিষ্য রাম ডাক্তার, মনোমোহন মিত্র ও সুরেশ মিত্র প্রভৃতির বাড়ী আমাদের বাড়ীর নিকটেই। বিশেষতঃ মনোমোহন বাবুর বাড়ী আমাদের বাটীর ঠিক সংলগ্ন বলিলেই হয়। তিনি সর্ব্বদা তথায় আসিতেন। ভক্তমণ্ডলী শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিতেন। সুমধুর হরিসংকীর্ত্তনের উচ্চরোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। আমরা অমনি তাঁহার অপূর্ব্ব নর্ত্তন দর্শন করিবার জন্য উধাও হইয়া ছুটিতাম। কিন্তু বুঝি আর না-ই বুঝি তাঁহার নৃত্য ও গীতি উভয়ই আমাদের যারপর নাই ভাল লাগিত। বন্ধুতার খাতিরে সময় সময় তিনি আমাদের বাটীতেও আসিতেন। প্রতি বৎসর শারদীয়া মহাপূজার মহানবমীর দিন সন্ধ্যার পর তিনি বিনা নিমন্ত্রণে আমাদের বাটীতে আসিতেন, মায়ের সম্মুখে বসিয়া বসিয়া কচি ছেলের মত সোহাগের, কত আব্দারের, কত অভিমানের, কত ভালবাসার কথা কহিতেন। কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও গলা ছাড়িয়া গান ধরিতেন, কখনও দু'বাহু তুলিয়া উদণ্ড নৃত্য জুড়িয়া দিতেন, আবার কখনও বা কিছুই

কহিতেন না মার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিতেন। তখন নয়নজলে তাঁহার বদন ভরিয়া যাইত। আবার কখনও নয়ন মুদিয়া কি যেন কি ভাবে বিভোর হইয়া অবস্থান করিতেন। আহা সে ভাব বড় মধুর বড় মধুর। রামবাবুর বাটীতে একদিন তাহার সহিত একত্র আহার করিতে হইয়াছিল। তিনি বাবার মুখে ভক্তিশাস্ত্রের সুললিত ব্যাখ্যা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যেখানে সেখানে বাবাকে ডাকাইয়া লইয়া যাইতেন।

নিজে শুনিতেন আবার সকলকেও শুনাইতেন। সেদিন রামবাবুর বাটীতে কি একটা মহামহোৎসব; শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং আনন্দের আর বিরাম নাই। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, পরমহংস মহাশয়ের উপর আহারের জন্য ঘন ঘন অনুরোধ হইতে লাগিল। কারণ তাঁহার না হইলে আর কেহ আহার করিতে চাহিতেছেন না। তিনি ধরিয়া বসিলেন বাবা না খাইলে তিনি খাইবেন না। বাবা বড় একটা কোথাও খান না। তিনি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনখানি পাতা করিবার হুকুম হইয়া গেল। বাবাকে ডানদিকে বসাইলেন। আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বামদিকের পাতে বসাইলেন, আর নিজে বসিলেন সেই মাঝখানের পাতে। চারিদিকে সারি দিয়া সেবকমণ্ডলী সেই ভোজন ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। খাইতে বসিয়া হাস্য পরিহাসের ফোয়ারা ছুটিয়া গেল। আমি তাঁহার স্নেহমাখা তিরস্কার খাইলাম। অপরাধ গোঁসায়ের ছেলে একখানার বেশী মালপো খাইতে পারি নাই। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। সকলে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে ভোজন আনন্দ-ভোজন;—লুচি, কচুরি নামমাত্র।

সেই মহাভাগের দর্শন, স্পর্শন, সংলাপ ও সহভোজন কি কখনও ব্যর্থ হইবার সামগ্রী। মুঙ্গেরের সাধুসঙ্গের কথাটা একটু বলি। বুঝি আর

নাই বুঝি তার একটা ধাক্কা আজিও প্রাণের ভিতর জাগিয়া রহিয়াছে। এ সাধু একজন নন, দুইজনও নন, তিনজন। তাঁহারা মুখ ফুটিয়া কথা কহেন নাই। কেবল একজন কথা কহিয়াছিলেন বীণাযন্ত্রে রাগরাগিণীর আলাপে। সে আলাপ কোন্ রাজ্যের জানি না। মনে হইলেও মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলে।

মাতার মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পরে একবার আমি মুঙ্গের যাই।

বারুইপুরের অন্যতম জমিদার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আমাদের পল্লীর প্রসিদ্ধ ধনবান প্রবোধচাঁদ মিত্র, সোনাগাছির নিকটে যে ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন আছে সেই ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরেন্দ্রনাথ এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত সোগন্ধা গ্রামের সম্বৃদ্ধ বসু বংশীয় অম্বিকাচরণ বসু এই কয়জন বন্ধুই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। গান-বাজনা উপলক্ষেই তাঁহাদের সহিত আমার সৌহার্দ্দ। হরদম গান-বাজনা আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্যই মুঙ্গের যাওয়া।

প্রবোধের পিতা ৺অতুল চাঁদ মিত্র মহাশয় ভাল সেতারী ছিলেন। ভূবন মোহন আচায্য তাঁহার সাকৃরেদ। ভারী হাত মিষ্টি। প্রবোধ তাঁহারই কাছে সেতার শিখিত। হারমোনিয়াম সে বেশ ভাল বাজাইতে পারিত। দু' চার খানা গান গাহিবারও ক্ষমতা রাখিত। প্রবোধের নিকট-আত্মীয় যতীনবাবু সুকবি। তাহার কবিতা-গ্রন্থও দুই তিন খানি আছে। নরেন প্রবোধের বন্ধু। অম্বিকা বাবু সুবাদে কাকা, কিন্তু ইয়ারকি চলিত।

সকলেই সৎ স্বভাব এবং সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী। যতীন বাবু কিছুদিন আমাদের পাড়ায় রামতনু বসুর গলিতে একটি বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। সেই সময় বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী অভিনয়ের আয়োজন হয়। আমি বিদ্যা দিগ্‌গজের পার্ট লইয়াছিলাম। যতীন বাবু কতকগুলি গান

বাঁধিয়াছিলেন। আমি তাহার সুর দিয়াছিলাম গান শিখাইতেও হইত আমাকে। প্রবোধ প্রভৃতিই অভিনেতা। সবই ঠিক ঠাক। অকস্মাৎ যতীন বাবুর স্ত্রী পুত্র বিয়োগ ঘটিল। উদ্‌যোগ-পর্ব্বেই অভিনয়ের যবনিকা পতন হইল।

মাতার মৃত্যুর পর আমি গানের নেশাতেই অনেকটা আপনাহারা হইয়া থাকিতাম। কখনও থিয়েটার দেখিতে গিয়া, হাফ্‌ আখড়াই, সখের পাঁচালী বা সখের যাত্রা শুনিয়া বড়লোকের বৈঠকখানায় মাইফেলে হাজিরী দিয়া গুরু প্রসাদ মিশ্র, শিবকুমার মিশ্র, বদ্রী মুকুল, কানাইলাল ঢেঁড়িজী কাশী প্রসাদজী প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যগণের বাড়ী ঘুরিয়া আর কখনও বা আপন আবাসে তব্‌লা পিটিয়া দিন রাত কাবার করিতাম।

আমাদের বাড়ীতে সঙ্গীতের চর্চ্চা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। আমার বড় জ্যেঠামহাশয় দেবনাথ গোস্বামীর (সকলে রাজা গোঁসাই বলিত) আমলে সারদা প্রসাদ, গোপাল প্রসাদ এবং টপ্পাবাজ্‌ জামীর নামক তিনজন ওস্তাদ মাহিনা করা ছিলেন। খুল্লতাত ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামীর (মা গোস্বামীর একমাত্র পুত্র) গান বাজনার খুব সখ ছিল দেখিয়াছি। 'নর্ম্মালস্কুলে' স্থিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের বাড়ীতেই থাকিতেন। খুড়া মহাশয় খরচ যোগাইতেন। বাবা সেতার শিখিয়াছিলেন। "বাঁধা নামের" সুর দিয়া দিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। হরীতকী বাগানের জ্যেঠামহাশয় (৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুলিশ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ইহাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র) আমাদের বাড়ীতে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখেন। আমাদের বাড়ীতে থাকিবার সময় দাঁড়া কবির দল করিয়াছিলেন। হাফ্‌-আখ্‌ড়াই এর বাতিক তাঁহার বেজায় ছিল। দাঁড়া কবিতে নিজে দাঁড়াইয়া ছড়া কাটিতেন। গালে হাত দিয়া গলা ছাড়িয়া কবির গান

গাহিতেন। কবিবর ৺ঈশ্বর গুপ্ত ও ৺রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্য গান বাঁধিতেন, ছড়া রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহাদের আড্ডাই ছিল জেঠামহাশয়ের বৈঠকখানা। সে এক আনন্দের সময়ই ছিল। এখন সে হাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। আমাদের পাড়ার প্রসিদ্ধ সখের পাঁচালির দলটী কিশোরীমোহন বসুর মৃত্যুর পর উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। আমি দাদার ও আমার তবলা শিক্ষক হারুলাল মল্লিক মহাশয়ের অনুরোধে সুপ্রসিদ্ধ বংশীবাদক হাবুবাবু (অমৃত লাল দত্ত) ও বাণীমাষ্টার প্রভৃতির সহায়তায় সেই দল চালাই। কিছু নতুন ছড়াও বাঁধিয়া দিই। কৃষ্ণসিংহের গলির হীরালাল পালের বাড়ীতে দর্জ্জিপাড়ার সখের দলের সঙ্গে পাঁচালীর লড়াই। আমাদের দলের জয় অবধারিত হইয়া যাইত। শেষ তাহাদের সহিত বড়ই বিবাদ বাধে। কথা কাটাকাটি হাতাহাতি হইতে হইতে ছুরি মারামারি ও রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। অনেক নিরীহ ভদ্রলোকও মার খাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া নাকে-কানে খৎ দিয়া আমিও পাঁচালির সঙ্গে ইস্তফা দিলাম। দাদার সখের বাউলের দল, কন্সার্ট পার্টী আর আমার হরিনাম সংকীর্ত্তনের দলই অনেক দিন ছিল। আমি প্রায় প্রতি দিনই প্রবোধদের বাড়ী যাইতাম। গান গাহিতাম। সে সেতার বাজাইত, তাহার সহিত সঙ্গৎ করিতাম। দুজনে ভারি মাখামাখি ভাব। তাই তাহাদের সঙ্গে মুঙ্গেরে যাইতে কোন আপত্তি হইল না।

মুঙ্গেরে কেল্লার মধ্যে 'পীশ্ কটেজ' নামক একখানি দ্বিতল বাটীতে আমরা পাঁচটী বন্ধুতে অন্যূন এক মাসের খোরাক লইয়া উপস্থিত হইলাম। সকাল-সন্ধ্যা এখানে ওখানে বেড়াইয়া বেড়াই। গঙ্গার পূত-সলিলে অবগাহন স্নান করি। খাই দাই আর গান বাজনা করিয়া দিন রাত গুজরান করি। হাস্য-পরিহাসের রঙ্গরসের তো আর সীমা-পরিসীমাই নাই।

এত যে আনন্দ, এত যে বান্ধববৃন্দের প্রীতি ভালবাসা তবু যেন আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা অভাবের অনুভূতি সদাই জাগিয়া আছে। প্রাণ কেমন থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া উঠে, কোথায় যেন উধাও হইয়া ছুটিয়া পলাইতে চায়।

একদিন অতি প্রত্যুষে আমরা কষ্টহারিণী ঘাটে বেড়াইতে যাই। ঘাটের নামটী সার্থক। বাস্তবিকই সেখানে গেলে যেন প্রাণের সকল কষ্টই দূরে যায়। স্থানটী বড় ভাল লাগিল প্রবোধকে বলিলাম এসো একটু বসা যাক। সকলে বসিলাম। দেখিলাম সম্মুখে মা গঙ্গা তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন, পরপারে সুদৃশ্য পর্ব্বত শ্রেণী উষার অরুণ রাগে প্রকৃতির কি এক মাদকতাময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, জল বিহঙ্গমগণ আনন্দ কাকলীতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, শত শত নর-নারী ভক্তি ভরে সেই জাহ্নবী-নীরে অবগাহন করিতেছেন। তাঁহাদের স্তুতি-গীতি কর্ণে যেন সুধার ধারা ঢালিয়া দিতেছে আর পূজা করা ফুলগুলি যেন কাহার উদ্দেশে কোন্ অচেনা দেশে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সেই ফুটন্ত ফুলগুলি দেখিতে দেখিতে আমি যেন কেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। মনে মনে বলিলাম ভাই ফুল একটু দাঁড়াও তো আমিও তোমার সঙ্গে যাই, আমার প্রাণ জানি না কার জন্য তোমারই মত সদাই ব্যাকুল। তুমি বুঝি আমার তাহারই কাছে চলিয়াছ! তা না হইলে অত ব্যাকুল হইবে কেন? তাই বলি ভাই, একটু দাঁড়াও দাঁড়াও, দুজনে এক সঙ্গেই যাই। ছিঃ ভাই ফুল, তুমি আমার কাতরতা কানেও তুলিলে না; একটীবার ফিরিয়াও চাহিলে না, সেই সমভাবেই উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিলে? ফুল তুমি না বড় কোমল। এই কি তোমার কোমলতা, তুমি যদি কোমল তবে কঠোর কে? আচ্ছা বেশ ভাই, যদি যাবে যাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু মিনতি করি, একবার বলিয়া যাও, যাহার

জন্য ছুটিয়াছ, সে কোথায় কোন্ রাজ্যে? ফুলকে লক্ষ্য করিয়া পাগলের মত কত কথা বলিলাম বর্ণা যায় না। বলিতে বলিতে আমার প্রাণ যেন গলিয়া গেল। সেই গলা প্রাণে গলা ছাড়িয়া গান ধরিলাম—"কাঁহা মেরি বৃন্দাবন কাঁহা যশোদা মাই"। গানটী গিরিশ বাবুর চৈতন্য লীলার।

গান গাহিতে গাহিতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হইলাম। সে সঙ্গীতে সকলেই বিমুগ্ধ সংজ্ঞাহীন। নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য কাহারও নাই। প্রায় চারি ঘণ্টা পরে আমার সংজ্ঞা হয়। তার পর সকলে বাসায় ফিরিয়া আসি। ঐ দিন হইতেই আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল।

আমরা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে কিংবা আশ্বিনের শেষে মুঙ্গেরে যাই। কেননা, বেশ মনে আছে, দেওয়ালি পর্ব্বটা সেবার সেইখানেই দেখি। ঐ সময়ে মুঙ্গেরে ব্যায়রাম স্যারাম বড় একটা হয় নাই। কিন্তু সেবার বেজায় কলেরার ধুম পড়িয়া গেল। বন্ধুগণ বিচলিত হইলেন। কলিকাতা হইতেও তাহাদের শীঘ্র ফিরিবার জন্য ঘন ঘন তাগিদা পত্র আসিতে লাগিল। মাত্র ১৩ দিন থাকিয়া তাহারা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন কিন্তু আমার প্রাণ তখন উড়ু উড়ু—কলিকাতায় যাইতে একান্ত নারাজ, সুতরাং আমার আর তাহাদের সঙ্গে যাওয়া হইল না। আমি একটী করুণ গীতির উপহার দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। প্রবোধ প্রভৃতি আজিও দেখা হইলে বলে, তোমার 'কাঁদে গো পরাণ আজি তোমা সবে ছাড়িতে' গানটী (রাজকৃষ্ণ রায়ের রচিত) আমাদের প্রাণে গাঁথা রহিয়া গিয়াছে। যখন তখন মনে পড়ে।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া আমি একাই সেই বাড়ীতে রহিলাম। বাড়ীটী গোরস্থানের মাঝ খানে। ভূতের ভয়

বলিয়া একটা প্রবাদও আছে। রাত্রিকাল, সেই বাড়ীতে একা থাকা অসীম-সাহসিকতা—বিশেষতঃ আমার মত একজন বিদেশী বাঙ্গালীর পক্ষে। কিন্তু করি কি? পেয়াদায় সব করায়।

সকলে চলিয়া গেল। আমি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দোতলার ঘরে গেলাম। তাহারও দ্বার রুদ্ধ করিলাম। সে ঘরে আর কেহই নাই, কেবল আমিই একা। আমি একা কি? না না, আর একজনও ছিল। সে কে জান? আমার চিরসহচরী চিন্তা। আমি চিন্তাকে লইয়াই অবস্থান করিতেছি দেখিয়া নিদ্রাদেবী অভিমানিনী রমণীর মত সেদিন আর আমার দিকও মাড়াইলেন না। কাজে কাজেই আমার কাছে চিন্তা ছাড়া আর কিছুই রহিল না। তাহাকে লইয়াই আমি সেই রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলাম। টুকু বলিতেছি বটে, কিন্তু সে যেন আর ফুরাইতে চাহে না—বাড়িয়া বাড়িয়াই চলে।

জিনিষ যা তাই থাকে। কিন্তু এ রাজ্যের এমনই মহিমা এমনই বিচিত্রতা সেই একই সামগ্রী কাহারও হেয়, কাহারও উপাদেয়, কাহারও প্রীতির, কাহারও দ্বেষের পাত্র। কাহারও কাছে ছোট, কাহারও কাছে বড়। এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।

রাত্রি কিছু আর সেদিন কেহ বড় করিয়া দেয় নাই। সকলেই যে বড় বলিয়া বোধ করিয়াছে তাহাও নয়, কিন্তু আমারই কেমন বেয়াড়া বড় বলিয়া বোধ হইল। আর বোধ হয় যাহারা আমারই মত হতভাগা, চিন্তার দাস, তাহারাও আমার মত বড় বলিয়া মনে করিতে পারে।

আমার বড় বা ছোট বলায় কি আসিয়া যায়। রাত্রি যাহার হুকুমে আসিয়াছিল, আবার তাঁহারই হুকুম তামিল করিয়া যথানিয়মে চলিয়া গেল। মাঝখান থেকে আমরা কেহ বড় কেহ ছোট বলিয়া লইলাম মাত্র।

সংসারে সকল সামগ্রীই যাঁহার আদেশে আসে, তাঁহারই আদেশে চলিয়া যায়। আর আমরা আপন আপন অভিরুচি অনুসারে তাহার শত্রু-মিত্র আপন-পর ভাল মন্দ নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। সে সামগ্রীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা তাহার স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্ত্তনও করিয়া দিতে পারিব না। মাঝখান থেকে দু'কথা বলিয়া লই মাত্র।

যাক্ সে কথা, রাত্রি প্রভাত হইল। চারিদিক সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইল। কেবল হইল না একটী স্থান। সেটীর চারিদিকে যেন রাশি রাশি জমাট বাঁধা অন্ধকার আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিতে লাগিল। সেটী যে কি, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সেটী আমার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়।

আজ আমি সংসারে একা, যথার্থই একা। বলি, হাঁগা, এই মিলনের রাজ্যে কেবল আমিই কি একা? এ রাজ্যের যে দিকেই দেখি না কেন, কেবল তো মিলনের দৃশ্যই দেখিতে পাই। পরমাণুতে পরমাণুতে মিলিতেছে, নদীতে সাগরেতে মিলিতেছে, লতাতে গাছেতে মিলিতেছে। পাখীতে পাখীতে মিলিতেছে আরও কত কি কত কিতে মিলিতেছে, কেবল আমারই কি মিলিবার কিছুই নাই? একথার উত্তর দিবার কেহ আছে কি? কই কাহারও তো সাড়া পাই না? কোথা যাই, কিই বা করি, একা বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছি। এমন সময়ে হঠাৎ পেট প্রভু বেজায় জ্বলিয়া উঠিলেন। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। জ্বালার চোটে সকল চিন্তা কোথায় চম্পট দিল, পেটের চিন্তাই সার হইল। এমন সময় হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বাবু!' 'বাবু!' সজোর ডাক হাক আমার চমক ভাঙ্গাইয়া দিল।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলাম। দেখি, অম্বিকা কাকার শ্বশুর বাড়ীর এক বেহারা আসিয়াছে। সে আসিয়া আমার রাত্রের কুশল

জিজ্ঞাসা করিল। কি খাবদাব বলিয়া দিলে সে সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতে প্রস্তুত তাহাও জানাইল এবং ঘরদোর ঝাঁটপাট দিতে লাগিল।

আমি সেই অবকাশে মুখহাত ধুইয়া লইয়া তাহাকে 'একটু অপেক্ষা কর' বলিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি স্নান প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাসায় আসিয়া দেখি বেহারা চুলায় আগুন দিয়াছে।

রাত্রে নানা দুশ্চিন্তায় আহার করি নাই, নিদ্রাও যাই নাই। ক্ষুধার আতিশয্যে শরীর যেন ঝিম ঝিম করিতেছে। তাহার উপর নিজেই রন্ধন ক্রিয়া করিতে হইবে ভাবিয়া শরীর যেন আরও এলাইয়া পড়িল। আমি বেহারাকে বলিলাম 'বাবা রান্নাবান্না এখন পরে হবে, তুমি আগে আমায় একটু জল দাও, খাইয়া বাঁচি'। ঘরে মাখন ছিল, মিছরীও ছিল। তাই একটু গালে দিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটী জল খাইয়া ফেলিলাম, ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। আমি তখন বেহারাকে বলিলাম, এই ভাঁড়ার পোরা চাল দাল, ঘী তেল মশলা টশলা, সমস্তই তুমি তোমার বাবুর বাটীতে একে একে লইয়া যাও, আমি কখনও রাঁধি নাই, রাঁধিবার দরকারও নাই, অমনি জলটল কিছু খাইয়া থাকিব। বেহারা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বলিল 'বাবু, তরিতরকারী কিছুই দরকার নাই, আপনি কেবল একটা ভাতে ভাত দিয়া ভাত ফুটাইয়া লউন, আমি দুধ আনিয়া দিতেছি, ঘী দিতেছি, দধি দিতেছি, চিনি দিতেছি ; বস্ কত খাবেন খান না'।

বেহারা একটী নূতন হাঁড়ি আনিয়া দিল, চাউল ধুইয়া দিল, একটী বড় কাঠিতে কতকগুলি আলু গাঁথিয়া দিল। আমি উনুনের উপর হাঁড়ি চাপাইয়া দিলাম। হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিলাম, চাউল জল-মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। ভাত টগ্-বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। বেহারা মাঝে মাঝে আসিয়া তদ্বির করিতে লাগিল ভাত ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে কি না, ভাত ঠিক তৈয়ারী হইয়া গেল। কিন্তু এইবার—এই বারেই যে বিষম ফেঁসাদ, ফেন

গড়াই কি করে ? বেহারা মৎলব বাৎলাইয়া দিল, বলিল 'বাবু কিছু করিতে হইবে না, আপনি হাঁড়িটার তলদেশে খুন্তীর ঠোক্কর দিয়া একটা ছোট ছেঁদা করিয়া দিন, হাঁড়িটা উনুনের উপরেই থাক, সব ফেন উনুনের মধ্যেই ঝরিয়া পড়িবে এখন'। তাহাই করিলাম, একটা যেন মহা হাঙ্গামা চুকিয়া গেল।

বেহারা পাতা করিয়া দিল, আলুভাতে মাখিবার জন্য তেল নুন আনিয়া দিল, ঘী, দই, দুধ সমস্তই সম্মুখে সাজাইয়া দিল। দূর হইতে দেখাইয়া দিতে লাগিল কেমন কৌশলে ভাত বাড়িতে হইবে, ভাতে ভাত মাখিতে হইবে আর তারপর কেমন মজা করিয়া খাইতে হইবে তাহাও রসিক বেহারা অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে দেখাইতে ভুলিল না।

গরজ বড় বালাই। মনিবের হুকুম—বাবুর হুকুম বেহারাতেই অবনত মস্তকে মানিয়া থাকে, কিন্তু গরজে পড়িয়া আজ বাবুকেও কথায় কথায় বেহারারই নির্দ্দেশ মত ভাত বাড়িয়া ভাতে ভাত মাখিয়া খাইতে হইল। পেট তখন চার চোদ্দং ছাপান্ন পুরুষান্ত করিতেছে, সেই ভাতে ভাত দিয়াই অন্য দিন অপেক্ষা অনেক বেশী ভাত খাইয়া ফেলিলাম। তাহাই যেন অমৃতবৎ বোধ হইতে লাগিল।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় অম্বিকা কাকার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন মনে মনে ভাবিতেছি, বেহারার জোগাড়-যন্ত্রে এ আছে, তাহার দশা হবে কি ; যদি মুঙ্গের ছাড়িতে হয়তো গাড়ী পাইতে রাত্রি ১২টার এদিক নয় তারই বা উপায় কি ?

অম্বিকাবাবু আসিয়াই স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন—এঃ আপনারতো দেখিতেছি বড়ই কষ্ট হইল, ভদ্রলোকের ছেলে হাত পোড়াইয়া খাওয়া বিষম কর্ম্ম ভোগ। আজ এ-বেলা যা হইবার হইয়া গিয়াছে, তার আর কথা নাই, আমার বাড়ীতে আমাদের দেশের জানা শুনা একজন প্রবীণা ব্রাহ্মণ কন্যা আছে, অতঃপর আপনি তাঁহারই হস্তে ভোজন করিবেন, নিজেকে আর

কর্ম্মভোগ করিতে হইবে না। আমি বাঁচিয়া গেলাম অম্বিকা বাবুর সহিত পাকা কথা হইয়া গেল—আজ রাত্রে তাঁহার বাড়ী লুচি আহার করা যাইবে। তিনি চলিয়া গেলেন। বেহারা জিনিষ পত্র ধৌত করিতে লাগিল। আর আমি একলা দোতলার ঘরে পড়িয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া নিদ্রা আসিয়া অবসর জুড়িয়া বসিলেন, আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখি, দিন প্রায় কাবার সূর্য্যদেব পাটে বসেন আর কি। আমি ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেখি অম্বিকা বাবুর বেহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমি আমার বিছানা পত্র ও তোরঙ্গটা তাহার বাবুর বাড়ীতেই লইয়া যাইতে বলিলাম। মুখ হাত ধুইয়া আমিও তথায় হাজির হইলাম। গিয়া দেখি, তাহার জ্বর হইয়াছে। তিনি আমাকে একটু জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও অম্লান বদনে তাঁহার উপহৃত ফলমূল মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে চলিয়া গেলাম। প্রাণ যে বড়ই অশান্ত। কেবল কোথা যাই, কোথা যাই।

একটু এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া কষ্টহারিণী ঘাটে গেলাম। তখন সন্ধ্যা। মায়ের পবিত্র সলিলের সমীপে গিয়া বসিলাম। হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাধা করিলাম। ভাগীরথীর কূলে বসিয়া থাকিয়াও চিন্তার অকূল পাথারে ভাসিতে লাগিলাম।

প্রথম চিন্তা, এখন যাই কোথা? একবার মনে হইল, জামুই যাই। তথায় আমাদের একজন গিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, আমি একবার তথায় যাই। কিন্তু তাঁহারই পত্রের আর একছত্র মনে পড়ায় সে চিন্তা ইস্তফা দিতে হইল। এবার জামুই অঞ্চলে বড় বড় বাঘের বেজায় উপদ্রব হইয়াছে।

এই সে দিনকার বাঘের তাড়া এখনও ভুলি নাই, মনে হইলে বুক ধড়াস্ করিয়া উঠে, আবার সেই বাঘের রাজ্যে সখ করে যাওয়া, বাবা! কাজ নেই আমার জামুই যাওয়া।

তবে যাই কোথা? কলিকাতাতেই ফিরিয়া যাইব? তবে রহিলাম কেন? প্রবোধের সঙ্গে গেলেই তো হইত? আর তথায় কোন্ সুখের আশাতেই বা যাব? মা তো নাই, কে আর আমায় আদর করিবে? তবে এখন যাই কোথা?

থাক, থাক, কোথাও গিয়া কাজ নাই, এ অশান্ত প্রাণ লইয়া কোথাও গিয়া কাজ নাই। মা হারা ছেলে—মায়ের কোলেই প্রকৃত জুড়াইবার স্থান। তবে মা গঙ্গা, এই নে মা তোর এই মাতৃহারা দিশেহারা ছেলেকে নে মা কোলে তুলে নে মা। আমার সকল জ্বালা সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া যাউক।

মায়ের কোলে গিয়া ঝাপাইয়া পড়িতে চাই, কিন্তু কে যেন কানের কাছে আসিয়া বলে, ছি ছি কি কর, কর কি? আত্মহত্যা যে মহাপাপ। বামুনের ছেলে অমন কাজ করিতে আছে কি?

আমি ব্যস্ত সমস্তভাবে ইতঃস্ততঃ চাহিয়া দেখি, কে সে? কে আসিয়া আমার শান্তির অন্তরায় হইল? দেখিলাম—কেহই কোথাও নাই। চারিদিকেই কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার। গঙ্গার কুলুকুলুধ্বনি ছাড়া শুনিবার সামগ্রীও তো আর কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না।

তবে তুমি কে গা? কানে কানে কথা কও, অথচ দেখাও দাওনা, ধরা ছোঁয়াও দাও না, তবে তুমি কে গা? সেই সে-দিন এই ঘাটের মাঝে আমায় অজ্ঞান অচৈতন্য করিয়া তুমিই কি আমার প্রাণের ভিতর একটা ওলট পালট করিয়া দিয়াছিলে না, সে তোমাদের দলেরই কোন লোক

হইবে ? চিম্‌টী কাটিয়া চলিয়া যাও, অথচ দেখাটি দাও না, কথাটিও কও না, তুমি বা তোমরা কেমনতর লোক গা ?

তোমাদের কি দয়া মায়া কিছু নাই ? কই সাড়াসুড়ি কিছুই পাই না যে, তবে আমি যাহা করিতেছিলাম তাহাই করি, জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জ্জন দিই।

আমি 'জয়-মা' রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া লম্ফ দিয়া গঙ্গা জলে ঝাপাইয়া পড়িতে গেলাম, কিন্তু বলিব কি, কে যেন, ভিতর হইতে আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আটক করিয়া ধরিয়া রাখিয়া দিল, প্রাণের ভিতর সুধা-নিন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিল ছি ছি কর কি, কর কি ?

আবার ভাবিলাম ভূতে পাইল না কি ? অন্ধকার রাত্রি একলা পাইয়া হয়তো ভূতেই পাইয়া বসিয়াছে।

আবার ভাবিলাম ভূত তো নাকি সুরে খোনা খোনা কথা কয়, এই কথা তো তেমন কথা নয়, এ যে অমিয়ের টুক্‌রা।

আরও ভাবিলাম, যদি ভূতও নয়, মানুষও নয়, কেহই নহে, তবে এ কে ? ধরা-ছোঁয়াও দেয় না, দেখা টেখাও দেয় না, কাছে আছে অথচ নাই, ঠিক যেন সেই—

"হাতে আছে হাতে নাই।
হাত বাড়ালে পেতে নাই॥"

হেয়ালিটির মত এ লোকটা কে ? এর শক্তি সামর্থ্যও তো সহজ নয়, অন্তরে বাহিরে সমানই অধিকার সমানই শক্তিপ্রয়োগ সামর্থ্য। দেহ আমার, ইন্দ্রিয় আমার, মন আমার, প্রাণ আমার, সকলই আমার, অথচ এই অজানা অচেনা লোকটার ইঙ্গিতেই তো তাহারা চালিত হইতেছে। আমার হইয়াও তাহারা যেন আমার কেহই নয়। তবে কি আমার এই দেহ রাজ্যে আমি ছাড়া আর একজন কেহ রাজা আছেন ? যাঁহার সর্ব্বত্র

সমান অধিকার যাঁহার শক্তির সীমা পরিসীমা নাই ? যিনি অন্তরে বাহিরে অহরহঃ অবস্থান করিয়া আপন ইচ্ছার অনুরূপ পথে আমাকে চালিত করিতেছেন ?

বলি হাঁ গা, তুমি কি আমার সেই রাজা নাকি ? আমি অজ্ঞ, আমি মন্দ-বুদ্ধি এতদিন আমি তোমার পরিচয় লইবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু নাথ ! আজ তুমি আমার মাথার ঝুঁটি নাড়িয়া শিখাইয়া দিয়াছ যে, আমি আমার হইয়াও 'আমার' নই আমি তোমার—আমি তোমার—আমি তোমার।

তুমি তো শিখাও প্রভু, দয়াময় তোমার জীবে তোমার বড় দয়া, তাই দয়া করিয়াই তো শিখাও প্রভু, কতবার কত আকার ইঙ্গিতে, কত শত শত প্রকারে সততই তো শিখাও প্রভু, কিন্তু তোমার শিক্ষার অমিয় ঝঙ্কার কয়জনার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রভু ? আমার প্রতি আজ তোমার করুণার অজস্র ধারা উথলিয়া পড়িয়াছে। তাই আমি তোমার করুণার বাণী কানে ও প্রাণে শুনিতে পাইয়াছি, তোমার অধিকার, তোমার শক্তি, তোমার সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আমি অতি অধম, আমি তোমার কাছে শত শত অপরাধে অপরাধী আমায় ক্ষমা কর প্রভু, আমাকে আত্মসাৎ করিয়া লও নাথ, আর যেন ক্ষণতরে তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে না হয়। আমাকে "আমার" বলা ভুলাইয়া দিয়া 'তোমার' বলার তোতাপাখী করিয়া দাও, আর ঐ বুলি বলিয়া বলিয়া আমি 'আমার' ছাড়িয়া চিরতরে 'তোমারই' হইয়া যাই।

নাথ, আর একটা কথা বলিয়া রাখি, তোমার কথা শুনিতে মনে হয়, তোমার স্বর যখন অমন মধুর ; অমন রসে ভরা তখন তোমার মূর্ত্তি না জানি কতই সরস, কতই মধুর, কতই সুন্দর। নাথ, যদি হৃদয়ের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া সুপ্ত প্রাণে প্রবোধের সঞ্চার করিয়াই দিলে তবে দয়াময়, লুকোচুরি

ছাড়িয়া এ অধমকে একবার তোমার মধুরিমময় মূর্ত্তিখানি দেখাইবে না কি? প্রাণনাথ, সে সৌভাগ্য এ অভাগার ভাগ্যে ঘটিবে না কি?

বলিতে বলিতে হৃদয়ের আর একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, আর যেন কত কালের জমা জল পল্ পল্ করিয়া পলকহীন নয়ন দিয়া বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি যেন কোন্ অপ্রাকৃত অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া গেলাম। জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি অনুমাত্রও থাকিবার অবকাশ পাইল না, বুঝি সেই জলের 'তর-তর' তোড়ে তাহারাও গা-ভাসান দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, ভিতরে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। আমি প্রথমে মাতৃ শোকের ভাগীরথী ধারায় অভিষিক্ত হইতেছিলাম, তাহার পর প্রণয়িজনের বিরহের যমুনা ধারা তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, এইবার কোন অজানা অচেনা অথচ অকপট আত্মীয়ের জন্য লালসাময়ী ব্যাকুলতার সরস্বতী ধারা অন্তরে অন্তরে আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিল। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করিয়া আমার আত্মা মনপ্রাণ সকলই পবিত্র হইয়া গেল। আমি আর সে আমি নই, আমি যেন আর এক নূতন রাজ্যের নূতন মানুষ, এই রাজ্যই কি সেই প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য?

আমার অবস্থা তখন বড়ই বিচিত্র। আমি যেন আপনার হইয়াও আর কারুর হইয়া গেছি। আমি যাহা কিছু করিতে চাই, ফল তাহার বিপরীতই হইয়া দাঁড়ায়। স্থির হইতে যাই, আরো যেন অধিক অস্থির হইয়া পড়ি। শরীরে সর্ব্বত্রই সে অস্থিরতার বিকাশ। শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। শীতানুভূতি নাই, জ্বর রোগাদিও নাই, ভীতির সঞ্চার নাই, তবে এ কাঁপুনি কেন? কারণ তো কিছুই বুঝা গেল না। আরও দেখি পুলকে সকল অঙ্গ পূরিয়া গিয়াছে। কই কাহারও তো সুখদ অঙ্গ স্পর্শ লাভ করি নাই, ভয়ও পাই নাই তবে এ রোমাঞ্চই বা কিসের নিমিত্ত? প্রাণে কিন্তু বড় আনন্দ। সাধ হইল, গলা ছাড়িয়া একটা গান গাই। গায়িতে যাই,

গায়িতে পারি না, গলা যেন কে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। একটী আস্ত কথাও মুখ ফুটাইয়া বাহির করা ভার। ইহারই বা কারণ কি? কার্ত্তিক মাস, রাত্রি কাল, নদীতীরে, আবরণ শূন্য স্থান, গ্রীষ্ম হইবারও তো কথা নয়, তবে সর্ব্ব শরীরে এত ঘর্ম্মই বা কোথা হইতে আসিল? আমিতো ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। কে যেন আমায় যাদু করিয়াছে। এমন সময় অকস্মাৎ কর্ণে বীণার সুমধুর ঝঙ্কার আসিয়া প্রবেশ করিল। সে ঝঙ্কার—

'কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

আমি আকুল প্রাণে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম এ কান-জুড়ানো মন-মাতানো বীণা বাজায় কে?

দেখিলাম, আমারই অদূরে তিনজন দীর্ঘাকৃতি মানবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহাদেরই একজনের হস্তে বীণা। অন্ধকারে তাঁহাদের মূর্ত্তি বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল না। কেবল এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল অঙ্গে আবরণ কাহারও নাই।

অগ্রে বীণাবাদক বসিলেন, তারপর অন্য দুইজনও তাঁহার উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বা আলাপ আরম্ভ হইল বীণায়। আমি সেই আলাপের ভিতর দিয়া কাহার যেন কত অমৃত মাখা কথা শুনিতে পাইলাম।

সে কথার মর্ম্ম আর কিছুই নয় ভালবাসো ভালবাসো ভালবাসো। তুমি আমায় প্রাণ ভরিয়া ভালবাসো, আমি তোমারই হইয়া রহিব। ভালবাসা পরম ধর্ম্ম। তুমি আপনাকে ভালবাসো, সেই আদর্শে জগতের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসো, তাহা হইলেই তোমার আমাকে ভালবাসা হইবে; আর আমিও চিরতরে তোমারই হইয়া যাইব।

আমি অনেক বড় বড় ওস্তাদের রাগ আলাপ শুনিয়াছি, তা গলাতেই বা কি আর বীণা, সুরবাহার এস্‌রাজ প্রভৃতি যন্ত্রেই বা কি, কিন্তু এ প্রকার অপূর্ব্ব আলাপ আর কখনও শুনি নাই। রাগ রাগিণীও তো অনেক শুনিয়াছি, অনেক শিখিয়াছি, কিন্তু এ রাগের নাম যে কি নির্দ্দেশ করিব, কিছুই তো ঠিক করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, এ রাগের নাম ভালবাসা—প্রেম বা অনুরাগই হইবে।

বীণা থামিয়া গেল। বীণাবাদক এবং তাহার সহচরদ্বয় যথাস্থলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহারা কে? মুঙ্গের মুঙ্গলপুরী মুঙ্গলঋষির আশ্রম মহা পুণ্য স্থান, এখানে অনেক মহাপুরুষেরই থাকিবার কথা। ইঁহারা কি সেই মহাপুরুষই হইবেন? কিংবা আমি যে অচেনা বন্ধুটিকে লইয়া হাবুডুবু খাইতেছি ইঁহারা তাহারই কোন আত্মীয় কুটুম্ব হইবেন? বোধ হয় তাহাই হইবে, কেন না ইঁহাদের বীণার সুরটা যেন তাঁরই সকল ভুলানো সুরেরই মত। বীণার কথা আর তাঁর কথায় তো তফাৎ কিছু বুঝা গেল না। যদি তাহাই হয়, তবে আর আমি চুপ্‌টী করিয়া এখানে বসিয়া থাকি কিসের জন্য? যাই—ইঁহাদের চরণতলে লুটাইয়া পড়ি, কাকুতি করিয়া বলি, ঠাকুর গো, আমার মত অধম মহাপাতকী এ সংসারে আর নাই, আপনাদেরও দয়ার অবধি নাই, তাই কাতরে প্রার্থনা করি আমার প্রতি আপনারা করুণা বিস্তার করুন—আমার প্রাণবন্ধুর সমাচার নিশ্চয়ই আপনারা রাখিয়া থাকেন, আমাকে তাঁহার উদ্দেশ বলিয়া দিন, আর যদি পারেন তো সঙ্গে করিয়া তাহার সমীপে লইয়া চলুন, নচেৎ আমি আপনাদের সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

তাঁহাদের কাছে যাইবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা হইল বটে, কিন্তু কে যেন আমার পা দুটি চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল, যাইতে বাধা দিতে লাগিল। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখি ওঃ রাত্রি যে অনেক হইয়া

গেছে। তাই তো অম্বিকাবাবু কি মনে করিতেছেন? খাবার দাবার লইয়া সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যাই বা কত না কষ্ট পাইতেছেন? আহা সেই বেহারাটাও বোধ হয় আমায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রান হইয়া বেড়াইতেছে। ইত্যাদি জাগতিক চিন্তা অকস্মাৎ আসিয়া আমায় আক্রমণ করিল। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। চাহিয়া দেখি—সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ রাজ্যে আসিলে তো আর তাঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না। তাই বোধ হয় তাঁদের পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম। প্রাণে যে বিমল আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছিল তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বরং তাহার পরিবর্ত্তে বিষম ভয় আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিল। একে একে শত শত দুশ্চিন্তা আসিয়া আসরে দেখা দিতে লাগিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অম্বিকা বাবুর বাসার অভিমুখে দ্রুত পদক্ষেপে চলিতে লাগিলাম। ভয়ে সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল; বুকের ভিতর গুড় গুড় করিতে থাকিল। ভয় আর কিছুর জন্য নয়। বিশেষ ভয় সাপের। মুঙ্গেরে এখন কি রকম বলিতে পারি না, তখন তো ভয়ঙ্কর সাপের আমদানী স্ব-চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। সাপই বা কি ছোট খাটো, মস্ত মস্ত বড় বড় বিষধর গোখুরা সাপ। সে দিন কষ্টহারিণী ঘাটে আসিবার সময়ও একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ আমার সামনে দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া চলিয়া গেল। কেল্লার প্রান্তর প্রাচীরের চারিধারে গেটগুলির উপর নীচে বিশেষতঃ নবাবী আমলের গঙ্গায় যাইবার সোপান শ্রেণীটা তো সাপের খোলসে ভরা। যেখানে সেখানে বড় বড় সাপের খোলস। দিবসে দেখিলেই ভয় হয়। আর এই রাত্রিকালে একা আমি সেই কেল্লার ভিতরে সেই নবাবী সিঁড়ি পার হইয়া কেমন করিয়া যে বাসায় ফিরিয়া যাইব, ভাবিয়াই অধীর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু করি কি, উপায় তো কিছুই নাই, বাসায় তো ফিরিতেই

হইবে। তা সাপেই খাক্ আর বাঘেই খাক্। অন্ধকারই কি কম। কোলের ছেলে দেখা যায় না। সে যাহা হউক, আমি সাপের ভয় করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে বাসার অভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি, বিষম ব্যাপার। সারাদিনের অশ্রান্ত পরিশ্রমে বেহারার শ্রম-জ্বর হইয়াছে। অম্বিকাবাবুর তো পূর্ব্বেই জ্বর হইয়াছিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী হা হুতাশ করিতেছেন। সকলেই আমার জন্য অসামান্য চিন্তার মধ্যেই পড়িয়া গেছেন। রাত্রি তো আর কম হয় নাই ১১টা বাজে বাজে।

অধিক রাত্রির জন্য আমি কি যে কৈফিয়ৎ দিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না, অমনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সারিয়া লইলাম। হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিয়া বাটীর ভিতর যাইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আহারের আয়োজন কিছু গুরুতর গোছেরই তর-বেতর তরকারী, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দুধ, রাবড়ি প্রভৃতি থরে থরে সাজানো। কিন্তু অত খায় কে? খাই-ই বা কি প্রকারে? চিন্তাতেই যে পেট পূরিয়া রহিয়াছে। রাত্রি ১২টার সময় গাড়ী। ষ্টেশনও এখান হইতে অনেকটা। বেহারাটার জ্বর। তোরঙ্গটা লইয়া যায় কে? এত রাত্রে মুটেই বা জুটাইয়া দেয় কে? এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলাম, আর খাইতেও লাগিলাম, খাবার যতই ভাল হউক, আর যতই রকমারি হউক এ অবস্থায় গলাধঃকরণ করা যায় কি? সে যাহা হউক, 'আমি খাওয়া নয়—গেলা' গোছের এক রকম কোরে আহার ক্রিয়া সমাপন করিলাম। তাঁহাদের কাছে বিদায় লইয়া বাটীতে আসিলাম। আসিয়া দেখি আমাদের সীতাকুণ্ডের পাণ্ডা ঠাকুর কানাই লাল আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহে অনেকটা চিন্তার হাত এড়াইতে পারিলাম। তিনিই একজন

বেহারা জোগাড় করিয়া আনিয়া দিলেন। আমি নূতন প্রাণ নূতন চিন্তা লইয়া বাঁকিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

—শাস্ত্র-চর্চ্চা

প্রথম জীবনে প্রভু ব্যবসা করিয়া বড়লোক হইবেন ভাবিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর তিনি হরিহর ছত্রের মেলায় যাইতেন। সেখানে ঘোড়ার দালালী করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। কলিকাতা সহরে কোম্পানির কাগজের স্পেকুলেশনও চলিত। কিছুদিন এক দর্জির দোকানও করিলেন, তাহাতেও বড় স্থবিধা ঠেকিল না। পাথর কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। আসানসোল গিয়া কয়লার খনির জন্য জমি দেখেন। এক সাহেব সেই কাজে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু এবার মশল্লার দোকান খুলিলেন। প্রবাদ আছে, শ্রীনিত্যানন্দ সন্তান কোনো ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিবে না। এই কথা প্রভুর জীবনে সত্য সত্যই ফলিল। নানাকাজে বিফল মনোরথ হইয়া প্রভু অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলেন। এমন সময় তাঁহার যোগ্য আসনে বসিবার ডাক আসিল। পিতা মহেন্দ্রনাথ একদিন পুত্রকে স্নেহকণ্ঠে গম্ভীরভাবে বলেন "বাবা, এসংসারে লাভ লোকসান কিছু বোঝ কি? যাহা স্বজাতীয় পেশা নয়, তাহাতে আপাততঃ লাভ হইলেও লোকসান, আর যাহা স্বজাতীয় পেশা, তাহাতে আপাততঃ লোকসান হইলেও উহা অপরিমিত লাভের সামগ্রী।"

পিতার স্নেহ ওলাহনে আদর্শপুত্র অতুলকৃষ্ণের শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হইল। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রভু, আপনি কি শ্রীজীব গোস্বামি পাদের ষট্ সন্দর্ভ পড়িয়াছেন। তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন "বাবা, আমি আর পড়িবার সময় পাইলাম কোথায়? শ্রীসম্মিলনীতে আমার বই আছে প্রয়োজন হইলে দেখিও।" এ কথায় আমার অত্যন্ত কৌতুহল জাগিল। শ্রীসম্মিলনীতে গিয়া দেখিলাম, সত্যই তিনি কতদূর নিপুণতার সঙ্গে দার্শনিক

গ্রন্থগুলি পড়িয়াছেন তাহার চিহ্ন বইগুলির প্রতিপৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। যেখানে গ্রন্থাশুদ্ধি আছে, যেখানে পাঠান্তর আছে, যেখানে সন্দেহ যেখানে যাহা বক্তব্য, পরিষ্কারভাবে সেই সকল বিষয় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এমন কি স্থানে স্থানে সমাধান ও গ্রন্থান্তরের সঙ্গতিসূচক বাক্য প্রভৃতিও রহিয়াছে। এরূপ একখানা নয় শত শত গ্রন্থে প্রভুর স্বহস্তাঙ্কিত চিহ্নাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

আমাদের গুরুভ্রাতা অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বঙ্গীয় মহাকোষ সম্পাদন কালে একদিন বলেন "ভাই কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু সমাধান করিয়া লইতে হইলে আর ঠাঁই নাই। প্রভুপাদের কাছে একটা না একটা সমাধান মিলিবেই। কোনো কিছু আট্‌কাইলে তাই প্রভুপাদের কাছে ছুটিয়া আসি। প্রভুপাদ অনেকবার বলিয়াছেন "আমার মত ভবঘুরে যে আবার শাস্ত্রচর্চা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবে একথা এক সময় স্বপ্নে অগোচর ছিল। তাঁহার শাস্ত্র চর্চা ব্যাপারে প্রবৃত্তির মূলেও এক অপূর্ব্ব কাহিনী জড়িত। তিনি উহা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।

একবার এক মহারাষ্ট্র রমণী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু শ্রোতা আগ্রহ সহকারে সেই ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। প্রভুপাদও সেই সভায় উপস্থিত। ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছেন। প্রভুপাদ কিন্তু উহা তেমন মনোযোগ করিয়া শুনিতেছেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বে পিতা প্রভু তাঁহাকে যে তিরস্কারের স্বরে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন উহাই থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

"সন্ধ্যা হইল। ব্যাখ্যা শেষ হইয়া গেল। ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কাছে আসিয়া—দুইজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতকে দেখাইয়া স্নেহমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোঁসাই! এই দুজন পণ্ডিতকে

জানো?—ইঁহারা ভারি পণ্ডিত,—দর্শন-শাস্ত্রে ইহাদের অসাধারণ অধিকার,—ইহাদের সঙ্গে আলাপ করো।"

তাঁহাদের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া আমার কেমন ভক্তির উদ্রেক হইল। আমি ভূমি-লুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। পদধূলি লইয়া মাথায় দিলাম। পরস্পর হিন্দীতেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

শৈশব হইতেই আমার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগ। এই জীবন-সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াও—নানা-স্থানী হইয়াও নানা সঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও সংস্কৃতের চর্চ্চা একটি দিনও ছাড়ি নাই। জীবন সখার ন্যায় কিছু-না-কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্গে সঙ্গে থাকিতই থাকিত। বিশেষত গীতা-ভাগবত কখনও কাছ ছাড়া করিতাম না। আমার অশান্ত প্রাণে শান্তির শীতল সলিল সেচন করিতে গীতা ভাগবত ছাড়া আর কেহই ছিল না। কিছু বুঝি আর নাই বুঝি গীতা ভাগবত নিত্য পাঠ করিতাম। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত; সময় সময় এমন হইত যে, এক অধ্যায় পাঠ এক ঘণ্টাতেও শেষ হইত না। সকলের মুখেই শুনিতাম, বেদান্ত না পড়িলে গীতা-ভাগবত কিছুই বুঝা যায় না। তাই বেদান্ত পড়িবার ঝোঁকটা প্রাণের ভিতর অনেক দিন হইতেই ছিল। বাবার কাছে বেদান্ত সার পড়িতে পারিয়াছি কাশীধামে গিয়া ভাল করিয়া বেদান্ত শিক্ষা করিব, এরূপ সাধও সময় সময় হইত।

আমি উভয় মহাত্মার সহিত আলাপে অবগত হইলাম,—ইঁহাদের একজনের নাম—দেবীসহায়জী, অপরের নাম—বেণীমাধব শাস্ত্রীজী। দেবীসহায়জী পুরাণ শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রীজী দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। রাজা শিবপ্রসাদ বগলা বাহাদুর ইঁহাদের ৺কাশীধাম হইতে আনাইয়াছেন। ইঁহারা তাঁহার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ জীউর মন্দিরে (৫১নং কটন ষ্ট্রীট্, বড়বাজার) অধ্যাপকতা করেন। সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণসন্তান মাত্রই বিনা বেতনে

বেদাদি সকল শাস্ত্রের উপদেশ পাইতে পারেন। শাস্ত্রীজীর সহিত আলাপে আমার মন কেমন ভিজিয়া গেল। তিনিও আমায় কেমন একটু স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি সেই স্নেহের ঘোরে আমাকে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিলেন এবং দর্শনশাস্ত্র পড়ি না কেন, বলিয়া বারবার অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—পণ্ডিতজী! আমার বেদান্ত পড়িতে বড় সাধ, পড়াইবেন কি? তিনি তখনই বলিয়া উঠিলেন,—কেঁও নেহি পড়ায়েঙ্গে, কাল্ বহুত আচ্ছা দিন হ্যায়, তোম কালহীসে সত্যনারায়ণজীকা মন্দিরমে আয়া করো।

পণ্ডিতজী তো পড়াইবেন এখন পুস্তক পাই কোথায়? বেদান্ত-দর্শন পঞ্চদশী প্রভৃতির মূল্যও তো অল্প নয়। আমি এখন পাই কোথায়? আমার ব্যবসা-টাবসা সবই তো পরের ধনে পোদ্দারী।

ভগবানের দয়ায় পুস্তকের জন্যও ভাবিতে হইল না। বন্ধুবর আশুতোষ আপনা-হইতেই সে ভার আপনার ঘাড়ে লইল। আমি এ-দেশ ও-দেশ কোরে বেড়াই, আশুতোষের তাহা ভাল লাগিত না; সে ভাবিল—এইবার যদি অতুল স্থির হয়, হইলও তাই। আমি তাহার পরদিন হইতেই শাস্ত্রীজীর কাছে বেদান্ত পড়িতে যাইতে লাগিলাম, দোকান-পাট করা ঘুচিয়া গেল। নবজীবন আরম্ভ হইল।

ব্যাখ্যা

আমার মত ভবঘুরে যে কখনও স্থির হইয়া বেদীতে বসিয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। বিশেষতঃ এই ব্যাখ্যার দায়েই আমায় সাধের বাঁকিপুর ত্যাগ করিতে হয়। সে বড় রহস্যের কথা।

বাঁকিপুরে মথুর বর্ম্মণ মহাশয়ের বাড়ীতে একটি হরিসভা ছিল। প্রতি রবিবারে সভার অধিবেশন হইত। আমি ঐ সভায় গান গাহিতাম।

একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। দৈবযোগে একদিন পণ্ডিতজী হাজির হইতে পারেন নাই। সভ্যবৃন্দ সকলে ব্যাখ্যাটা বন্ধ যাবে ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রবীণ বনমালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় রহস্যের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আজ গোঁসাইজী আমাদের ব্যাখ্যা শুনাইবেন। গোঁসাইর ছেলে ভাগবত জানে না, একি, কখনও হোতে পারে ?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাটা হাওয়ায় মিশাইয়া গেল না। বাঁকিপুরে আমার কাছে দু'একজন সংস্কৃত কাব্য নাটক পড়িতেন। একজন ভাল সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত বলিয়া তথায় আমার একটু খোসনামও ছিল। সুতরাং ভাগবত জানা আমার আছেই আছে এবং আমাকেই যে ব্যাসাসনে বসিয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেই হইবে, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে স্থির হইয়া গেল। আমি "জানি না—জানি না" বলিতে-বলিতে সকলে পাঁজাকোলা কোরে আমাকে ব্যাসাসনে বসাইয়া দিলেন। আমি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম।

আমি ফুল বড় ভালবাসি। বিশেষতঃ বেল-জুঁই। আমাদের পাড়ায় সরকার্স লেনে বিশ্ববৈষ্ণব-সভা ছিল। অমন জমকাল হরিসভা কলিকাতায় আর ছিল না। যত বড় বড় ধর্ম্মপ্রচারক—সকলেই সময় সময় ঐ সভায় আসিয়া শাস্ত্র-উপদেশ দিতেন। ব্যাখ্যাতৃ-প্রবর নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে ঐ সভায় ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা সভায় গেলে সকলে বড় আদর-যত্ন করিতেন, গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেন; আবার আসিবার সময় হরির লুটও কিছু পাওয়া যাইত। আমি ফুলের মালার লোভে সভায় মাঝে মাঝে যাইতাম। ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যার ধার ধারিতাম না। ব্যাখ্যা শুনা ছল মাত্র।

সে-বার বাঁকিপুর যাইবার পূর্ব্বে আমি একবার সভায় ব্যাখ্যা শুনিবার অছিলায় যাই। সে দিন নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো" (১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়) শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার মধুমাখা ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিমুগ্ধ। আমিও সেদিন কি জানি-কেমন আত্মহারা হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যা আগাগোড়া শুনিতে থাকি। এত মন লাগাইয়া শুনি যে, সে-দিনকার ব্যাখ্যাটা মায়-শ্লোক আমার এক প্রকার মুখস্থই হইয়া যায়। তখন আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল।

আমি অর্থ-সহ ভাগবত পড়ি নাই। ব্যাখ্যা কাহাকে বলে জানি না—বুঝিও না। বেদীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন করি কি? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ আমার সেই টাট্‌কা শুনা 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত' শ্লোকটি মনে পড়িয়া গেল। ফনোগ্রাফ-যন্ত্রের মত আমি গোস্বামিমহাশয়ের সেই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দসমক্ষে প্রসব করিয়া গেলাম। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের "কেঁও, কেয়া হুয়া, কর্‌কর্‌কর্‌কে, ইস্‌লিয়ে" প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া তাঁহাদের কান পচিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আমার মুখে গোস্বামিমহাশয়ের সেই সুধা-বিজয়িনী ব্যাখ্যা শুনিয়া আপন-হারা হইয়া গেলেন। আমাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই স্থির করিলেন—পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যা আর শুনা হইবে না, অতঃপর প্রতি সভায় আমিই ভাগবত ব্যাখ্যা করিব।

আমি মহাসমস্যায় পড়িয়া গেলাম। আমার তো পুঁজির ভিতর মাত্র ঐ একটি শ্লোক। তাহা তো ফুরাইয়া গেল। এখন করি কি? আর করিবই বা কি। তাঁহাদের হরিসভার অধিবেশনের পূর্ব্বেই আমাকে বাঁকিপুর হইতে চম্পট দিতে হইল। তখনও ভাবি নাই ভগবান এই ব্যাসাসনই আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার ভয়ে পলাইয়া

আসিলাম, তাহাই যে আমার জীবনের অবলম্বন হইবে, এ কথা একবারও মনে হইল না।

যে কথা আমাকে বাঁকিপুর ছাড়া করিল, সে কথাটি কিন্তু আমাকে ছাড়িল না; তাহা হৃদয়ে গাঁথা রহিয়া গেল। যখন তখন তাহা মনে হয়, কষ্টও হয়।—"গোঁসাইর ছেলে ভাগবত জানে না, এ কি কখনও হোতে পারে?"

কথাটা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ আর পাই না। এতদিন পরে সে সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিকে শাস্ত্রীজীর সমীপে বেদান্ত পড়িতে লাগিলাম, অপরদিকে বাবার কাছে ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। জীবন যেন ধন্য বোধ হইতে লাগিল। মাতার মৃত্যুর পর হইতে প্রাণের ভিতর যে এক অনির্ব্বচনীয় জ্বালা অনুভব করিতেছিলাম, তাহাও যেন অনেকটা থামিয়া গেল। আমি কায়মনোবাক্যে ভাগবত-সেবক হইয়া পড়িলাম।

মনসাতলা গলির ৮ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট ৺গয়াপ্রসাদ মল্লিক বাবার শিষ্য। তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছা হইল—নিয়মসেবার সময় একটু করিয়া ভাগবত শুনেন। আমাকে অনুরোধ করায় রাজি হইলাম। দশম-স্কন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের শেষে তাঁহারা একটু ব্যাখ্যা শুনিবার আব্দার করিলেন। তাহাও পূর্ণ করিতে হইল। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ব্যাখ্যার উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রাত্রে নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা এ-খানে ও-খানে শুনিয়া বেড়াইতে এবং বেদান্ত আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার ব্যাখ্যা সকলের পছন্দসই হইতে লাগিল। কিছু টাকাও পাইতে থাকিলাম। উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি ক্রমশঃ একজন ব্যাখ্যাতা হইয়া পড়িলাম।

এর ওর তার বাড়ীতেই ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটু খোসনাম বাহির হইল। সভা-সমিতিতে ব্যাখ্যা করিবার শুভ অবসর উপস্থিত হইল।

১ নং বাবুরাম শীলের লেনে রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ী। ঐ পল্লীর বালকবৃন্দের একটি হরিসভা ছিল। সভার অধিবেশন ঐ ঠাকুর-বাড়ীতেই হইত। একদিন পণ্ডিত ভূদেব কবিরত্নের অনুরোধপত্র লইয়া কতিপয় বালক আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের সভায় সাংবৎসরিক উৎসবে আমায় ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমি সম্মত হইলাম। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন ব্যাখ্যা করিলাম। সভায় সুপণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ কবিরাজ প্রমুখ অনেক শ্রোতৃবৃন্দ ব্যাখ্যার শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এতদিনে সভায় ব্যাখ্যা করা আরম্ভ হইল। ইহা সন ১৩০১ সালের কথা।

বক্তৃতা

সন ১৩০৩ সালে ১লা চৈত্র তারিখে কাণপুর হরিসভায় আমি প্রথম বক্তৃতা করি।

শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৪ পরগণা, পৃথিবা নামক স্থানে বাটী, জাতি কায়স্থ। বড়ই শাস্ত্রানুরাগী। আমার কাছে দর্শন শাস্ত্র পড়িতে আসিত। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। আমার কিসে উন্নতি হয়, কিসে শীঘ্র একজন নামজাদা লোক বলিয়া জাহির হইয়া পড়ি, রাজনের ইহাই একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ।

রাজন একবার বদরিকাশ্রমে যায়। হাতে একটিও পয়সা ছিল না। যোগে-যাগে কাণপুর পর্য্যন্ত গিয়া আর যাইতে পারে না। তথায় চাকুরি করিয়া টাকা রোজগার করিয়া তবে যাইতে পারে

কাণপুরে থাকিবার সময় সে তথাকার সকলেরই স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা অধিকার করে। কাণপুর হরিসভার সাংবৎসরিক মহোৎসব। একজন ভাল বক্তা চাই। তাঁহারা কলিকাতায় রাজনকে তজ্জন্য পত্র লিখিলেন।

রাজন মনে মনে স্থির করিল,—আর কাহাকেও না পাঠাইয়া এবার সে আমাকেই তথায় বক্তার আসনে দাঁড় করাইবেই করাইবে।

আমি, তখন মধুপুরে। প্রমথর বড় অসুখ। তাহাকে হাওয়া বদলাইতে লইয়া গিয়াছি। রাজন একখানি চাতুর্য্যপূর্ণ পত্র লিখিল,—পত্রপাঠমাত্র আমার কলিকাতায় আসা আবশ্যক। আমিও আসিলাম। সেই দিনই রাজন একখানি কাণপুরের রিটার্ণ টিকিট, কতকগুলি ছাপান নিমন্ত্রণ পত্র ও কিছু টাকা লইয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। একখানি পত্র আমার হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—এই দেখুন পত্রে কি লেখা আছে,—আপনাকে কাণপুরের হরিসভায় বক্তৃতা করিতে হইবে, বেশী দেরী করিলে চলিবে না, আজই পাঞ্জাবমেলে রওনা হইতে হইবে; এই নিন টিকিট, আর এই নিন পথখরচের টাকা, আপনি ঠিক থাকুন, আমি রাত্রে সঙ্গে করিয়া গাড়ীতে চাপাইয়া দিয়া আসিব, আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি, তথায় ষ্টেসনে আপনার জন্য লোক থাকিবে।

রাজনের কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। বক্তৃতা কখনও করি নাই। দাঁড়াইয়া বলিতে গিয়া একবার দায়ে ঠেকিয়া ভয়ও প্রাণে ছিল। বিশ্ববৈষ্ণব সভার শেষ অবস্থায় আমি সম্পাদক ছিলাম। একবার মাঘমাস-ভোর সভায় মহামহোৎসব হয়। সে দিন কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতা। তাঁহার জ্বর, আসিতে পারিবেন না বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ঐ কথা ক'টা আমাকে সভার মাঝে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। আমি তাঁহার পত্রখানি হাতে লইয়া যাই সভা-মধ্যে দাঁড়াইয়াছি, আমার পা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চোখে যেন কিছু দেখিতে পাই

না, কানে যেন কিছু শুনিতে পাই না, গলা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে, জিভ্ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া—আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া তবে অনেক কষ্টে আমি কথা-কটা কোন রকমে বলিয়া ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। আর সেই আমায়, কোথায় কোন্ সুদূর পশ্চিম প্রদেশে গিয়া, অপরিচিত মানবমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে হইবে, ভাবিয়া ভয় হয় না কি?

আমি রেহাই পাইবার জন্য রাজনকে যত বলি, সে কিছুতেই মানে না। আমি দু'একবার প্রভুপাদ গোকুলচাঁদ গোস্বামীজীউর 'ভাগবত-ধর্ম্ম মণ্ডল' সভায় পুঁথি না লইয়া শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করি। তাহা শুনিয়াই রাজনের ধারণা হইয়াছিল—আমি খুব বক্তৃতা করিতে পারিব। সেই বিশ্বাসবশেই রাজন (আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ গ্রন্থের গ্রন্থকার) এতদূরে আমাকে পাঠাইতে চিন্তিত নহে।

রাজনেরই জয় হইল। আমি সেই রাত্রেই কাণপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার প্রথম বক্তৃতা—গুরুতত্ত্ব।

—গুরুতত্ত্ব

কেহ বুঝিয়া আর কেহ না বুঝিয়া গুরু সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেন। আর বলিবেন বই কি? অপার গুরু মহিমা সম্বন্ধে যে নানা প্রকার কথাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আচার্য্য সমাশ্রয় ভিন্ন তো আর কোন বিদ্যাই লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই নানা বিদ্যার নানা রকমের গুরু আছেন, আর নানা প্রকার শিষ্যও আছেন, তাহারাই গুরুর মহিমা বিচিত্র ভাবেরসে রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করেন। একালে তো ঘরে ঘরে অবতার! দ্বিজেনের গুরু একজন অবতার—আবার হরেনের গুরু আর একজন অবতার। কেহ গুরুকে শিব করেন, কেহ গুরুকে নারায়ণ করেন, কেহ গুরুকে সর্ব্বভুক্ ভাবে দেখিয়া সন্তুষ্ট, কেহ গুরুকে সর্ব্ববিদ্যা-

বিশারদ দেখিয়া খুশী, কেহ বা গুরুকে অর্থদাতা ভাগ্যোন্নতিকারকরূপে পাইলেই কৃতার্থ। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। সত্যকার সাধনার জীবন যাপন করিবার জন্য যাহাদের ঔৎসুক্য আছে, তাহারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বাক্য অন্বেষণ করেন। প্রথম যাহার সমীপে ভগবদ্-বিষয়ক—ভজন বিষয়ক উপদেশ পাইয়া মনটা সেই পথে ধাবিত হয়, তাহাকে বর্ত্ম উপদেশক গুরু বলা যায়। ইহার পর সাধুদের কাছে ভগবানের কথা শুনিয়া তাহাদের সাধন ভজনের আনন্দ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও পদাশ্রয়ে মন্ত্র উপদেশ বা দীক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি মন্ত্রদাতা বা দীক্ষা গুরু হন। দীক্ষা গ্রহণ করার পর নানা প্রকার ভজন-অঙ্গ শিক্ষার জন্য সেই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ অপর সাধুদের নিকট সেই সাধন ক্রম শিক্ষা করা যায়। এইরূপ শিক্ষাদাতা গুরু শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিচিত হন। ভগবানের আরাধনার জন্যই শ্রীগুরুপদাশ্রয়। এমনও অনেকে আছেন, যাহারা "গুরু সেবাই ভগবানের সেবা" এই বলিয়া পৃথক্‌ভাবে ভগবানের সেবা হইতে বিরত হন। বৌদ্ধধর্ম্মেও এইভাবে বুদ্ধদেবের উপাসনাই অপর দেবতার সেবার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আধুনিক সমাজেও এইভাবে অনেকে দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন গুরুর সেবা প্রচার করিতেছেন। ফল হইতেছে নব নব উপদলের সৃষ্টি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত আচার্য্য গোস্বামিগণ শিব বা বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া বলিলেও শ্রীগুরুকে শিব বা বিষ্ণুর প্রিয়তম রূপেই অভিন্ন ভাব পোষণ করেন। যাহারা বৈষ্ণব গুরুর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তস্বরূপেই পূজা করিবেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব ভাবনার প্রধান দুইটি দিক্। একটি তাহার ব্যষ্টিভাব বা ব্যক্তিগত—আমার তোমার পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিতে পৃথক্ গুরু; আর একটি আমার তোমার সকলকার সমষ্টিভাবে গুরুচিন্তা ও তাঁহার

পূজা। শ্রীভগবানের বামে সমষ্টি গুরুকে পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। আর ব্যষ্টি গুরুপূজা করিবার সময় শ্রীগুরুদেব যে ভাবে দৃষ্ট হইয়াছেন সেই ভক্তভাবেই করিতে হইবে। গুরুদেব কখনও গোবিন্দের প্রিয় তুলসীকে চরণে দলিত করেন নাই, কাজেই ভক্তও তাহার গুরুর চরণে তুলসী দিতে পারেন না—দেন না। গুরুদেব কখনও ভগবানে নিবেদিত ভিন্ন কিছুই ভোজন করেন না—কাজেই গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদি সামগ্রীই নিবেদন করিতে হইবে—তাঁহার প্রিয়তম বলিয়া। তুলসীর প্রণাম বন্দনা করিয়া যে গুরু সুখী হন, সেই তুলসী কি তাহার চরণে দিলে তিনি সুখী হইতে পারেন? যে গুরু ভগবানের প্রসাদি বস্তু ভিন্ন কখনও গ্রহণ করেন না তাহাকে অপ্রসাদি বস্তু দিলে তিনি সুখী হইতে পারেন? অনেকে আবার শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই বলেন—আরে গুরুসেবা করিলেই সব হইল, আবার কি করিতে হইবে? ঐ গুরুপদেই সব কিছু। এইরূপ মত মোটেই সাধু বৈষ্ণব সমাজে আদরণীয় নয়। ভগবানেরই নির্দ্দেশ 'গুরুদেবকে আগে পূজা করিয়া তারপর আমার পূজা করিবে, তবেই আমার প্রীতি'। শ্রীনবদ্বীপ লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-সেবক এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলায় শ্রীরাধার প্রতি অধিকতর প্রীতিসম্পন্না যুগলসেবাপরায়ণা মঞ্জরী স্বরূপটি ধারণা করিয়া গুরুদেবের ভজনা করিতে হয়। গোস্বামিপাদগণের অনুগত বৈষ্ণবগণ রাগানুগা ভজন পথে শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিন্ন ভাবনা করেন না। যাহারা অভেদ ভাবনা করিয়া গুরুকে কৃষ্ণ সাজাইয়া বসেন তাহারাই সৎপথ অতিক্রমজনিত দোষাবলিপ্ত হইয়া পড়েন; গুরুসেবা লইয়াও অনেকে ভুল করিয়া থাকেন। গুরুর দৈহিক সেবা করাই গুরুসেবা নয়। তাঁহার আদেশ অনুসারে ভগবদ্‌ভক্তির যাজনই তাঁহার প্রকৃত-সেবা। সেবাদ্বারাই সন্তোষ। সদ্‌গুরু শিষ্যের সমীপে ধন, জন, মান, মর্য্যাদা কিছুই আকাঙ্ক্ষা

করেন না। তিনি ইচ্ছা করেন—আমার শিষ্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, ভক্তি-অঙ্গ যাজন করিতে থাকুক। সে কৃষ্ণসেবা করুক ভগবানের প্রিয় সাধুগণের বৈষ্ণবগণের সেবা করুক তবেই তো আমার আনন্দ। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে সপার্ষদ মহাপ্রভু এবং শ্রীবৃন্দাবনে যুগলকিশোরের কুঞ্জসেবা লাভ হয়। তাই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ কোন আশা।

আমার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট; টাট্‌কা বেদান্ত পড়া; বাংলাগ্রন্থ অনেক পড়া, তাই ভাষাটাও চোস্ত; ইংরাজীর জলও একটু পেটে আছে; থিয়েটারি ঢংটাও যে ছিল না, এমন নয়;—ফল নানা রকমে বক্তৃতা সকলেরই প্রীতিপদ হইল। রাজন খুবই বাহবা পাইল। বাবাকে সভা হইতে আমার বক্তৃতার বহু প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখা হইল। বাবা আনন্দে অধীর হইলেন।

—বাংলা লেখা

বিবিধ-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রকাশক মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়কে অনেকেই জানেন। তাঁহার একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। নাম—বঙ্গনিবাসী। সম্পাদক ছিলেন—দোয়ারি মুখুয্যে মহাশয়। আমাদের বাটীর ঠিক উত্তর দিকে ৩৯ নং সিমলা ষ্ট্রীটে—সাম্রানন্দ প্রেস। প্রেস মহেশবাবুরই। ঐ প্রেসে বঙ্গনিবাসী ছাপা হইত। মহেশবাবু অতি মহাশয় ব্যক্তি। দ্বিজ-দেবতায় বড় ভক্তি। আমাদের বড় সম্ভ্রমের সহিত দেখিতেন, ছাপাখানায় আদর করিয়া বসাইতেন। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়া গেল। ইহা বোধ হয় সন ১৩০০ সালের কথা হইবে।

আমি হিন্দী জানি। বঙ্গনিবাসীর বিনিময়ে অনেকগুলি হিন্দী সংবাদ-পত্র আসে। কিন্তু দেখিবার কেহ নাই। আমিই সেগুলি পাঠ করি। মধ্যে মধ্যে মহেশবাবুকে নূতন খবর বাংলায় বুঝাইয়া দিই।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গনিবাসীর সম্পাদক হইলেন। তাঁহার সহিত খুবই সৌহার্দ্দ্য হইল। তিনি ও মহেশ বাবু—উভয়েই আমাকে হিন্দী সংবাদপত্রের সংবাদগুলি বঙ্গনিবাসীর জন্য বাংলায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও লিখিতে লাগিলাম। ইহাই হইল বাংলা লেখার হাতে খড়ি।

হাতের লেখা কাগজে ছাপিয়া বাহির হয়, প্রথম প্রথম দেখিয়া বড় আনন্দ হইতে লাগিল। সংবাদগুলি অল্প কথায় আমি বেশ গুছাইয়া লিখিতে পারি বলিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রভৃতি খুব বাহবা দিতে লাগিলেন। আমারও লেখার আগ্রহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন 'অনুসন্ধান' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। তাঁহার সহিত আলাপ হইল। তিনি একদিন পটোলডাঙ্গা টেমার্স লেন—'অনুসন্ধান' অফিসে আমাকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। তথায় দুর্গাদাস লাহিড়ী, যোগেন্ দাদা, যজ্ঞেশ্বর দাদা, (ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজস্থানের অনুবাদক পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বিদ্যারত্ন।) ভুবনচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। সকলেই 'অনুসন্ধানে' কিছু লিখিবার জন্য আমায় বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

দামোদর বাবু প্রথম আলাপ হইতেই কেমন যেন স্নেহের চোখে দেখিলেন। প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, কত গল্পগুজোব, হাস-পরিহাস, আমোদ আহ্লাদ করিতেন। আর আমাকে 'অনুসন্ধানে' কিছু লিখিবার জন্য সস্নেহ অনুরোধ করিতেন।

দামোদর বাবু আমায় কিছুতেই ছাড়িলেন না। আসরে নামাইয়া তবে হাঁপ ছাড়িলেন। আমি প্রতি মাসে 'অনুসন্ধানে' লিখিতে লাগিলাম। লেখা-ও যে-সে বিষয়ের নহে। বেদান্ত লইয়া আসরে নামিলাম।

পঞ্চদশী গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে অনুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি সরল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করাই হইল আমার প্রধান লক্ষ্য। করিতে লাগিলাম-ও তাহাই। মাঝে মাঝে এক আধটা পদ্যও লিখিতে লাগিলাম।

দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতি আমাদের ভবনে আসেন, আমিও তাঁহাদের বাড়ীতে যাই, ক্রমশই খুব মাখামাখি হইয়া পড়িল।

একদিন দামোদর বাবু প্রভৃতি সকলে বসিয়া পরামর্শ করা হইল—একখানা জমকালো গোছের গীতা বাহির করিতে হইবে। যে কথা সে-ই কাজ। দুর্গাদাস বাবুর নামে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। গ্রাহকও জুটিতে লাগিল। এই গীতাই দামোদর বাবুকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

দামোদর বাবু হইলেন গীতার সম্পাদক, আমি এবং অনেক পণ্ডিত হইলাম সহকারী সম্পাদক। পণ্ডিত নবচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রুফ সংশোধন করিতে ব্রতী হইলেন।

বিজ্ঞাপনে অনেক পণ্ডিতের নাম বাহির হইল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে বড়-একটা কাহারও দেখা পাইয়া উঠি নাই। আমাকেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হইত। আমি বিজ্ঞাপন বিলি করি, নোট লিখি, তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কিছু কিছু লিখি, পুঁথি-পাঁথা সংগ্রহ করি, প্রুফও দেখি। কোন কোন দিন অহোরাত্র মধ্যে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইয়া উঠি নাই। বলিয়া রাখা ভাল, এই অশ্রান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমি দামোদর বাবুর নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতাম না। বরং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও করিতাম। কারণ দামোদর বাবুর আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না।

গীতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার একটু বিশেষ কারণ এইখানে বলিয়া রাখা ভাল। একে তো গীতা আমার আশৈশব সহচর—পরম প্রীতির সামগ্রী। তাহার উপর একবার গীতাই আমাকে জীবন দান করেন। সে ঘটনা এই,—

মাতার মৃত্যুর পর আমার প্রায় পেটের পীড়া হইত। একবার অত্যন্ত বেশী অসুখ হয়। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ করিতেছি, যত্ন আর তেমন হয় না। আমার উপর যেন সকলেই বিরক্ত। আমি যেন কত অপরাধী। সকলে তিরস্কার করে। প্রাণে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নাই। নীরবে সকলই সহ্য করি।

আমি বরাবরই বড় অভিমানী। কাহারও কথা সহ্য কবিতে পারি না। এবার কারে পড়িয়াই কেবল সকলই সহ্য করিতেছি। অন্যের তিরস্কার তত গ্রাহ্য করিতাম না, তাহাতে তত অভিমানও হইত না; কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীও বড় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, অল্প-স্বল্প তিরস্কারও করিলেন। তাহার স্বল্প তিরস্কার আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। তখনই দিন-দুপুরে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য—গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন করিব।

চলিতে পা টলিয়া টলিয়া পড়ে, দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে, অথচ অভিমানের এমনই প্রভাব, আমি সেই অবস্থাতেই চলি-চলি পা-পা করিয়া গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিলাম।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট আমাদের বাড়ী হইতে এক মাইল হইবে। ঐ পথটুকু যাইতে বোধ হয় আমার দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল। আমি ঘাটে গিয়াই সটাং শুইয়া পড়িলাম। মিটি মিটি করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি,—লোকজন বড় একটা ঘাটে যাওয়া-আসা করিতেছে কি না।

মৎলবটা এই—একটু ফাঁক পাইলেই ঝপাং করিয়া গিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িব। সকল যাতনার অবসান হইয়া যাইবে।

আমি যতই ভাবি, লোক-জন একটু কম হইলে হয়; কিন্তু ফলে লোকের আমদানী ও রপ্তানী যেন উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমিও নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলাম। সে এক নূতনতর যাতনা। মৃত্যুর পূর্ব্বে বোধ হয় ঐরূপ যাতনাই হয়।

বেলা ৪টা বাজিয়া গেল। আমি আর সুযোগ পাই না। করি কি? ফিরিয়া বাটী যাইবারও ইচ্ছা নাই—শক্তিও নাই। এখন করি কি? আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া বসিলাম।

ঘাটের লোহার থামে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছি। আকাশ-পাতাল, ছাই-ভস্ম কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় একটি আনন্দময় ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণের পায়ে জুতা নাই, পরিধানে একখানি মটকার কাপড়, উত্তরীয় বস্ত্রখানিও মটকার, দাড়ি ও মাথার চুলগুলি বড় বড়. শরীর শুষ্ক অথচ যেন তাহার ভিতর দিয়া তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আকৃতি দীর্ঘ।

তিনি গালভরা হাসি হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া, যেন কত পরিচিত বন্ধুর মত, সুমিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি গীতা ভালবাস?"

আমি তখন মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, কেবল একটু সুযোগ পাইলেই হয়। তখন কি আর গীতা-ভালবাসার কথা কানে ঢোকে? আমি তাহার কথায় উত্তর না দিয়াই চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া রহিলাম। বরং যেন কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবি,—এ বালাই আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?

আমি মুখ টিপিয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে, ঠাকুরটি উঠিয়া-পড়িয়া আমার পাছে লাগিলেন। তাঁহার সেই একই ভাব, সেই এক রকমই হাসি, আর সেই একই প্রশ্ন—আমি গীতা ভালবাসি কি না ?

তিনি প্রায় একঘণ্টা ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতেছেন, তবুও আমার মুখে একটি কথা ফুটিতেছে না। তাঁহার তাহাতে একটুও বিরক্তি বোধ নাই। অবশেষে তিনি যেন একটু অভিমান মাখানো স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি গীতা ভালবাস না, আমি তবে যাই।"

তিনি এই কথা বলেন, একটু যেন চলিয়া যাইবার ভাবে মুখ ফিরান, আবার আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"তুমি গীতা ভালবাস না, আমি তবে যাই।"

তবুও আমার মুখে কথা ফুটিল না। ব্রাহ্মণও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তখন স্নেহ-মধুর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ আমি গীতা বড় ভালবাসি, গীতা আমার প্রাণ, গীতা আমার জীবন, গীতা সকলেরই জীবন।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের সকল শরীর যেন এলাইয়া পড়িল, নয়নযুগল অশ্রুতে ভরিয়া গেল ; সে যেন কি এক অপ্রাকৃত ভাবে তাঁহার সকল শরীর ছাইয়া ফেলিল।

আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার সেই অমিয়-মাখা মূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিলাম। কি করিতে আসিয়াছি, কি করিতেছি, কি-ই বা করিতে হইবে, সকলই যেন ভুলিয়া গেলাম।

ব্রাহ্মণ তখন আমার কানের কাছে মুখখানি আনিয়া প্রেম-গদ্গদ স্বরে গীতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'এই শ্লোকটি জান কি ?'

শ্লোকটি শুনিয়া আমার প্রাণ কেমন ছাৎ করিয়া উঠিল,—যেন চটক ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণের ভিতর যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহা যেন জল দিয়া কে নিভাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণ সেইভাবে দুই বাহু দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, কাণের ভিতর মুখখানি দিয়া গীতার আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, একেবারে হাসিয়া ফেলিলাম। আমি যেন আর সে আমি নই।

ব্রাহ্মণ-দেবতার পবিত্র-অঙ্গ স্পর্শে আমার শরীরের সকল পাপ-তাপ যেন কোথায় পলাইয়া গেল, সকল শরীর পুলকে পূরিয়া গেল, চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কথা কহিতে প্রাণ চাহিতে লাগিল; কিন্তু মুখে আর কথা ফোটে না। শরীর, মন, প্রাণ, সকলই যেন অবশ।

প্রাণের জ্বালা-যন্ত্রণা এতটুকুও নাই, সংশয়-সন্দেহ সকলই মিটিয়া গিয়াছে, প্রাণে বিমল আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে। কেবল মনে হইতেছে,—এ ব্রাহ্মণ কে? আমার জীবন রক্ষার জন্য,—এ মহাপাতকীকে আনন্দ-রসে অভিস্নাত করিয়া দিবার জন্য, এ মহাপুরুষ কোন্ অপ্রাকৃত ধাম হইতে আগমন করিলেন?

ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, তিনিও করিতে বাধা দিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। কত দুঃখের সুখের কথা কহিয়া, আবার দেখা হইবে বলিয়া, কোথায় চলিয়া গেলেন। ঐ ব্রাহ্মণের দর্শন ৺কাশীধামে দুইবার পাই। তাঁহার কৃপায় অনেক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করি। সে অনেক কথা লিখিলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়।

আমার গীতার উপর ভালবাসা আরও বাড়িয়া গেল। গীতা আমার ধ্যান জ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এক মুহূর্ত্তও গীতাকে আর কাছ ছাড়া হইতে দিই না।

দামোদর বাবু আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম গীতাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত, তাই আমি তাঁহার কার্য্যে মনঃপ্রাণ সকলই ঢালিয়া দিলাম। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিলাম।

দামোদর বাবুর সহিত আত্মীয়তা খুবই বাড়িয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদি আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন। আমি দামোদর বাবুর কথার এতই বাধ্য যে, তিনি মরিতে বলিলে মরি, আর বাঁচিতে বলিলে বাঁচি। তাঁহার বাড়ীই আমার বাড়ী হইয়া পড়িল।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় পর্য্যন্ত দামোদর বাবুর গীতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল। তাহারপর নানা কারণে সদ্ভাবের কিছু অভাব ঘটিয়াছিল। ঐ গীতার প্রথম ষট্‌কে নানা স্থানে—পাদ-টীকায় আমার নাম (অ, কৃ, গো, কিংবা অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী) ছাপা আছে। আমার সকল লেখায় নাম নাই।

—গ্রন্থ-সম্পাদন

মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রকাশিত নানা-টীকা-সমন্বিত বঙ্গানুবাদযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতই আমার স্বাধীনভাবে প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ।

রোহিণীনন্দন সরকার মহাশয় ঐ ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সম্পাদন করেন। আমি তাহার পর হইতে ৩য় স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সম্পাদন করি।

ঐ সময় মহেশ বাবুর বিষম সাংসারিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই ভয়াবহ আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তাহার বঙ্গনিবাসী, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ একে একে সকলই বন্ধ হইয়া গেল। প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল।

কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ও ঠিক ঐ সময় শ্রীমদ্ভাগবতের এক সুন্দর সুবিশুদ্ধ সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি যদিও আর একখানি ঐরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পাদক, তথাপি কৃষ্ণগোপাল বাবু কোন পুঁথি চাহিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করিতাম। কুটিলতা করিয়া ওজোর আপত্তি তুলিতাম না।

কারণ, জগতে বিশুদ্ধ গ্রন্থ প্রচারই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, তা যে দিক দিয়াই হউক, হইলেই হইল।

কৃষ্ণগোপাল বাবুর সংস্করণটি হইতেছিলও বড় ভাল। একে তাঁহার মত ছাপাখানার কাজ-জানা পাকা লোক বাঙ্গালীর ভিতর নাই বলিলেই হয়, তাহার উপর পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ও বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভু তাঁহার কার্য্যের সতত সহায়, তাহার উপর সকলের আন্তরিক ও ঐকান্তিক যত্ন, ভাল না হইবে কেন?

বল্যাইদাদা কৃষ্ণগোপাল বাবুর সঙ্গে থাকিয়া ছাপাখানার কাজের হাড়হদ্দ জানিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়া গেল।

সুলভে সুবিশুদ্ধরূপে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। শান্তিপুরধামের মদনগোপাল প্রভুকে প্রাণের কথা জানাইলাম। তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা দিয়া শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থখানি সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অনুবাদ ও তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রথমে আমি একা-একাই শ্রীগ্রন্থখানি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করি। সুপার রয়েল ৩২ পেজী এক ফর্ম্মা কম্পোজও হইয়া যায় অর্ডারী ফর্ম্মাটি একবার বলাই দাদাকে দেখাইতে গেলাম। তাঁহার পছন্দ হইল না। বলিলেন,—করিতে হয় তো এমনতর করিয়া করিতে হইবে, যাহা দেখিলে লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে। আমার ইচ্ছাটাও তাহাই, কিন্তু একা সেরূপ করিয়া তোলা ভার। বলাই দাদা আমার কার্য্যের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরিশ্রমও যথেষ্ট করিতে লাগিলেন। আমাদের উভয়ের সম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের সম্পাদন প্রণালী দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমি গীতা ছাড়া আর কিছুর জন্য সময়ক্ষেপ করি,—কোথাও কিছু লিখিটিখি, ইহা দামোদর বাবুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার গীতার কার্য্যারম্ভ হইবামাত্রই তিনি আমাকে অনুসন্ধান পত্রিকায় আর লিখিতে দিতেন না, কোথাও বড় একটা যাইতেও দিতেন না; সর্ব্বদাই আগ্‌লাইয়া রাখিতেন। গীতার কার্য্যে সারাদিন তো কাটিয়া যাইতই। রাত্রেও অনেক সময় গীতার সেবাতেই অতিবাহিত করিতে হইত। তাহার উপর আবার বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। তথা হইতে আসিতে প্রায় রাত্রি ১টা ২টা বাজিয়া যাইত।

বহুবাজারের ধরেদের বাড়ীর ছেলেরা এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক মিলিয়া ঐ থিয়েটার স্থাপন করেন। বাঁধা ষ্টেজ, ভাল ভাল সিন, পোষাক পরিচ্ছদ জম্‌কাল। এবার তাঁহারা দামোদর বাবুর লক্ষ্মণ বর্জ্জন অভিনয় করিবেন। তাই এত যাওয়া আসা। দামোদর বাবু নিজেই পুস্তক খানি ড্রামাটাইজ করিয়া দেন। অনেকগুলি গান রচনা করিয়া দেন। আমাকে সেই গান গুলির সুর দিতে হইয়াছিল। কেবল সুর দিয়াই অব্যাহতি পাই নাই, মাঝে মাঝে শিখাইতেও যাইতে হইত। অভিনয় খুব উচ্চ অঙ্গেরই হইয়াছিল।

এইরূপে দামোদর বাবু যেন আমাকে একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। মহেশ বাবুর ভাগবত সম্পাদন তাঁহার ভাল লাগিল না। আমার তখন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য অর্থের একান্ত আবশ্যক। মহেশবাবু তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ দিয়া অর্থ দিয়া আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। দামোদর বাবুর কাছে টাকা পাই না, বরং অনেক গুলি টাকা আশুতোষের কাছ হইতে লইয়া দিয়া বসিয়াছি। আশুতোষের কাছে নিত্য টাকা চাহিতে লজ্জাও করে। তাই দামোদর বাবুর অনভিপ্রেত হইলেও আমাকে মহেশবাবুর

ভাগবত-সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। ইহাই পরস্পর মনোমালিন্যের প্রধান কারণ।

যাউক সে কথা, ঐ ভাগবত-সম্পাদন-সময় হইতেই আমি একে একে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্ব্ব-প্রধান মহোদয়গণের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলাম।

বঙ্গনিবাসী মহেশ বাবুর নিকট হইতে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লইলেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় হিতবাদীর সম্পাদক হইলেন। হিতবাদী অফিসে প্রায়ই যাই। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ আমার সহাধ্যায়ী। তিনি ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক। সকলেই আমায় ভালবাসেন। হিতবাদীর অর্ডারিপ্রুফও আমাকে দেখিতে দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

বেদব্যাস সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিতও আলাপ হইল। তাঁহার পকেট-গীতায় একটী সুবিস্তৃত সূচী করিয়া দেওয়া অবধি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। পাঁচকড়িকে (বঙ্গবাসী প্রভৃতির সম্পাদক আমার পরম সুহৃৎ শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁহার বাড়ীতেই পাইলাম। ভূধর বাবুই একদিন আমাকে বঙ্গবাসীর যোগেন বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। তিনি কি জানি-কি ভালবাসার চক্ষে আমায় দেখিলেন। আমার উন্নতির শত শত পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। (সন ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ডায়েরি হইতে।)

—ভাষা আলোচনা

বঙ্গভাষার সমালোচনায়—তাঁহার যে নৈপুণ্য তাহার কিঞ্চিৎ তিনি আত্মকথায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"ভাষার ভিতর—সামান্য ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্‌লা, প্রাচীন বাঙ্‌লা, হিন্দী, এবং উৎকল ভাষা আমার জানা আছে।

আমি ইংরেজীতে বেশ কথা বার্ত্তা কহিতে পারি না। তবে কেহ কিছু বলিলে অনেকটা বুঝিতে পারি। খবরের কাগজ পড়া ছাড়া ইংরেজীর আর কোন বিশেষ চর্চ্চা এখন নাই।

সংস্কৃততেও কথা কহিতে হইলে কোঁতাইতে হয়। কেন না রেওয়াজ বড় কম। তবে কেহ কিছু কহিলে কিংবা লেখা পড়িলে প্রায়ই বুঝিতে পারি।

বাঙ্‌লা তো মাতৃভাষা। বাঙ্‌লাভাষা লইয়াই চব্বিশ ঘণ্টা নাড়াচাড়া। দেশের ভাল ভাল লেখকের লেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ করিবার বাতিক খুবই আছে। একটু আধটু লিখিয়াও থাকি। সভামধ্যে দু'চার কথা যাহা বলিতে হয়। তাহা বাঙ্‌লা ভাষাতেই তো বলিতে হয়। বাঙ্‌লা ভাষাই আমার আরাধ্যা দেবী।

প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষার চর্চ্চাটা শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন উপলক্ষেই ঘটিয়া গিয়াছে। ৺কালীদাস নাথের নিকট ইহার জন্য আমি যার-পর-নাই ঋণী। কালিদাস নাথ জাতিতে কাঁসারী। আগে বড়বাজারে বাসনের দোকান ছিল। সাহিত্য অনুরাগে সে সকল নষ্ট হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে কালিদাসই প্রকাশ করে। অমৃতবাজার অফিসে এবং পরে আমার কাছে চাকুরি করিয়া কালিদাসকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এ চাকুরী সাহিত্যিক। অমৃতবাজার অফিসে কালিদাসের নাম ছিল—পণ্ডিত মশাই। কালিদাসের গুণ একমুখে বলা যায় না। অমন পরিশ্রমী অকপট সাহিত্যসেবী আর দেখা যায় না। বাড়ী ছিল শান্তিপুর। কলিকাতাতেই বাসা করিয়া থাকিত। ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। পরে বলিবার ইচ্ছা আছে। শিশির বাবুর বৈষ্ণবতার মূলে কালিদাসই বিদ্যমান।

আমি হিন্দীতে একটু আধটু কথাবার্ত্তাও কহিতে পারি, কেহ কিছু বলিলে অনেকটা বুঝিতে-সুঝিতেও পারি। গান-বাজনা উপলক্ষে, বেদান্তাদি অধ্যয়ন উপলক্ষে, পশ্চিম প্রদেশে দীর্ঘকাল আসা-যাওয়া উপলক্ষে হিন্দুস্থানবাসীর সঙ্গ আমার যথেষ্টই ঘটিয়াছে। তুলসীদাসী রামায়ণ, সুরদাসের সঙ্গীত, দোঁহাবলী প্রভৃতি হিন্দীগ্রন্থ আমার পড়িতে বড় ভাল লাগে। হিন্দী সংবাদপত্র অদ্যাবধি নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকি। সমস্ত সময় হিন্দীতে বক্তৃতা করিতেও হইয়াছে। তাই রেওয়াজ রাখিতেও হয়। সকল দেশের সকল লোকেই আর কোন ভাষা বড় একটা জানুক আর না-ই জানুক, একটু-আধটু হিন্দী প্রায় জানিয়া থাকেই থাকে। হিন্দীভাষা—সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বলৌকিক ভাষা। আমি হিন্দী বড় ভালবাসি। সকলকে ভালবাসিতেও উপদেশ দিই।

বাঙ্‌লা ১৩১১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাস হইতেই প্রায় মাঝে মাঝে ৺পুরীধামে আমার যাতায়াত হইতেছে। যখন যে দেশে থাকিতে হয়, ব্যবহারের খাতিরে সে দেশের ভাষা তখন কিছু-না-কিছু শিখিতেই হয়। প্রথম প্রথম আমার তাহাই হইয়াছিল। তারপর একটি বিশেষ কারণে আমি রীতিমত উৎকল ভাষা শিক্ষা করি। সে কারণটি বলিয়া রাখি।—

প্রাচীন বাঙ্‌লা গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে উৎকল-শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উক্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকায় কল্পনা-সাহায্যে নানা-জনে নানা প্রকার অর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ফলে, অনেকে আসল পাঠেরও বিকৃতি করিয়া ফেলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা—১০ পঃ) একটি উড়িয়া পদ আছে। মহাপ্রভু একদিন ঐ পদ গাহিয়া মহানৃত্য করিয়াছিলেন। পদটি এই—"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই"।

পদটির ব্যাখ্যা অনেক প্রকারই দেখিয়াছি, কিন্তু ঠিক মনের মত কোনটিই বোধ হয় নাই। তাই ৺পুরীধামে অবস্থানকালে ঐ পদের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিতে থাকি। উড়েদের অনেকেরই ভাষা-জ্ঞানটা বড় উড়ো-উড়ো। ভাষার জন্য ভাষার আলোচনা তাহাদের নাই বলিলেই হয়; সুতরাং কোন কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের অনেককেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়।

আমি একদিন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছি। ঐ পদের কথা পদে পদে মনে পড়িতেছে। প্রাণ বড় অশান্ত, আসিবার পথে কতিপয় কেতাবের দোকান আছে। একটি দোকান হইতে হঠাৎ আমার কানে আওয়াজ আসিল—'পরিমুণ্ডা তোর যাইরে'। চাহিয়া দেখি, একজন উড়িয়া সুর করিয়া কি একখানি গ্রন্থ তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছে।

'পরিমুণ্ডা' কথাটা শুনিয়া আমি ছুটিয়া তাহার কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি বই পড়িতেছ? সে বলিল—'কপট পাশা'।

প্রঃ। কাহার তৈয়ারী?

উঃ। ভীমা ধীবরের।

প্রঃ। উহাতে 'পরিমুণ্ডা' 'পরিমুণ্ডা' কি পড়িতেছিলে?

উঃ। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে লইয়া যাইতেছে, তাই দ্রৌপদী তাহাকে কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিতেছেন—

'দুঃশা! সভাকু না নিয়
পরিমুণ্ডা তোর যাই রে।'

প্রঃ। ইহার অর্থ কি হইল?

উঃ। অর্থাৎ হে দুঃশাসন! তুমি আমাকে সভার মাঝে লইয়া

যাইও না, আমি তোমার পায়ে মাথা কুটিতেছি। এই যেমন চলতি কথায় বলে না, "তোর গোড়ে ধরি মোরে ছেড়ে দে।"

প্রঃ। 'পরিমুণ্ডা' শব্দটির অর্থ কি?

উঃ। 'পরিমুণ্ডা' শব্দের পৃথক অর্থ নাই। 'পরিমুণ্ডা যাই' এই দুইটি শব্দের এক সঙ্গে অর্থ করিতে হয়। পরিমুণ্ডা যাওয়া আর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটোপুটী খাওয়া—একই কথা।

ভাষায় এইরূপ জোড়া-জোড়া শব্দ অনেক আছে। যথা,—বলি-যাই। বালাই যাই। হাথসান-দিয়া। মাত-জানে। মৎ-কহ প্রভৃতি।

(ক) বলি যাই—বলিহারি যাই। 'বলি' ও 'যাই' শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ করিতে গেলেই বিপদ। হিন্দীতে এই 'বলি যাই' বা 'বলি যাউ'র প্রয়োগ প্রচুর।

(খ) বালাই যাই—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ।

(গ) হাথসান দিয়া—হাত-নেড়ে ইঙ্গিত করিয়া। 'দিয়া'—দান করিয়া—এইরূপ স্বতন্ত্র অর্থ করিতে গেলেই মুস্কিল।

(ঘ) মতি-জানে—না জানে। (চৈঃ চঃ ৩৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)
(চৈঃ চঃ ৩১০ পৃঃ বং সং)

(ঙ) মৎ-কহ—বোলো না। (ঐ ১০২ পৃঃ)

(চ) ভদ্র কর—ক্ষৌর করাও—কামাও (ঐ ২০৩-২০৪)

(ছ) মধ্যাহ্ন করি—মধ্যাহ্ন-কৃত্য করিয়া (ঐ ১৯০)

(জ) মূল্য লয়—কিনিয়া লয় (ঐ ২৯১)

শ্রীজগবন্ধুর কৃপায় এতদিন পরে 'পরিমুণ্ডা যাই' কথার প্রকৃত অর্থ পাইলাম, ভাবিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি সেই দোকানীকে সাধুবাদ দিয়া তখনই তাহার নিকট হইতে একখানি

'কপট-পাশা' এবং একখানি উৎকল ভাষার 'বর্ণপরিচয়' ক্রয় করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমি পূর্ব্বে আর একবার উড়িয়া ভাষার দুই তিনখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু চর্চ্চা না থাকায় সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে একবার শেখা ছিল বলিয়া অক্ষর পরিচয় করিতে একদিনের অধিক সময় লাগিল না।

● আমাদের বাসা ছিল—'কুণ্টই বেণ্টসাহী' নামক পল্লীর অন্তর্গত 'মরীচ-কোটি রোড'—গলীর ভিতর ৺প্রাণবল্লভ ঘোষ উকিলের বাড়ীতে। বসু রামানন্দ বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসু মহাশয় আমাদের বাসার ঠিক সম্মুখেই থাকিতেন। গোপীবাবুর বয়স অনেক হইয়াছে। অনেক বড় বড় চাকুরীও করিয়াছেন। এখন পেন্সন্ লইয়া হরি-ভজন করিয়া—গান-বাজনা করিয়া সদানন্দে দিন-যাপন করেন। একদিন তাঁহার সহিত আলাপ হইয়া গেল। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাতায়াত করি। উৎকল ভাষায় ও পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার, ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাও অল্প-বিস্তর জানিতেন। উৎকল ভাষার অর্থ তাঁহার কাছে শিখিতে লাগিলাম। তিনি আমায় 'দার্ঢ্যভক্তি রসামৃত' বলিয়া একখানি বই পড়িতে দিলেন। গ্রন্থখানি বড় ভাল লাগিল। সে-দেশী ভক্তের চরিত্রই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। আরও অনেক গ্রন্থ গোপীবাবুর সাহায্যে পড়িতে লাগিলাম। ইহাই হইল উৎকল ভাষা শিক্ষার ইতিহাস।

উৎকল ভাষা শিক্ষা করায় প্রাচীন বাঙ্‌লা গ্রন্থ আলোচনা করিবার পক্ষে আমার যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া আর কি জানাইব। আমি উৎকল গ্রন্থ পাঠকালে উৎকল ভাষা ও প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক একটি 'তালিকা' প্রস্তুত করিয়াছি। যদি কখনও ঐ

তালিকা প্রকাশ করিবার সুযোগলাভ করিতে পারি, তবে বাঙ্‌লা ভাষায় একটা বড় কাজ করিলাম, বলিয়া মনে করিতে পারিব।

ভাষা না জানা থাকিলে যে শব্দের অর্থ কতদূর বিগ্‌ড়াইতে পারে, আমি নিজের গড়া একটি উৎকল-শব্দের অর্থ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

'পশুপাল' একটি উৎকল শব্দ। ইহার অর্থ করিতে কেবল কল্পনার সাহায্য লইলে—অর্থ করিতে হইবে—যাহারা গবাদি পশুর পালক বা রক্ষক। কল্পনায় ইহা ছাড়া অন্য অর্থ আসিতে পারে কি?

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি কল্পনা সহায় করিয়া তথায় ঐরূপ অর্থই লিখিয়াছি। কিন্তু ৺পুরীধাম গিয়া দেখি,—শ্রীজগন্নাথজিউর যাঁহারা বেশ রচনা করেন, সেই পাণ্ডাগণকেই সকলে 'পশুপাল' বা 'পশুপালক' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল কোথায়—বেশ-রচনাকারী; আর কল্পনার অর্থ হইল কি না,— গবাদি পশুর পালক!

প্রকৃত ভাষা না জানা থাকিলে শব্দের স্বরূপেরও যে কতদূর বিকৃতি ঘটে—চেহারা যে কতদূর বদ্‌লাইয়া যায়, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত দেখাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটি উৎকল শব্দ আছে 'উপল ভোগ।' মহাপ্রভু অতি প্রত্যূষে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে যাইতেন এবং ঐ উপলভোগ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। (মধ্য লীলা, ১ম ও ১৫শ পরিচ্ছেদ) (অন্ত্যলীলা ১৬শ পরিচ্ছেদ)

উপলভোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ উপর ভোগ—নিয়মিত ভোগের অতিরিক্ত বাড়্‌তি বা উপরি ভোগ। সংপ্রতি এই ভোগের নাম ছত্র-ভোগ। শ্রীজগন্নাথের ভোগমণ্ডপ মধ্যে দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়াইয়া এই ভোগ হয়।

জগবন্ধুর নিয়মিত ভোগ তিনটী।—প্রথম ধূপ বা কোট-ভোগ কিংবা রাজ-ভোগ। দ্বিতীয় ধূপ—মধ্যাহ্ন ধূপ বা মধ্যাহ্ন-ভোগ। আর তৃতীয়

ধূপ—সন্ধ্যা ধূপ বা সন্ধ্যা-ভোগ। এই তিনটী ভোগ জগন্নাথের রত্নবেদী-সমীপে হয়।

'ত্রিধূপ পঞ্চ অবকাশ' জগন্নাথে খুব প্রসিদ্ধ কথা। বল্লভ-ভোগ বা বড় শিঙ্গারের পাখাল-অন্নভোগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ—ভোগের ভিতরে গণ্য নয়। অবকাশের মধ্যে পরিগণিত।

মহাপ্রভু জগমোহনের ভিতর গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে রহিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিতেন। গরুড়ের অগ্রভাগে আর অগ্রসর হইতেন না। বোধ হয়, ভক্তিশিক্ষাগুরু ভক্ত-স্বভাব-সুলভ দীনতা দেখাইবার জন্যই গরুড়ের পিছনেই থাকিতেন। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, জাতাশৌচাদিতেও তথাকার অধিবাসিগণ গরুড়ের পশ্চাতে অবাধে গমন করেন এবং তথা হইতেই জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু অশুচি অবস্থায় গরুড়ের অগ্রে যাইবার হুকুম নাই। দৈন্যই প্রেমরাজ্যের প্রধান সম্পত্তি। এমন কি দৈন্য এবং প্রেমের পার্থক্য নিরূপণ করা সময়ে সময়ে বড় কঠিন হইয়া পড়ে। বীজ আগে কি অঙ্কুর আগে, যেমন ঠিক করা কঠিন, তেমনি প্রেম আগে কি দৈন্য আগে নির্ণয় করাও সহজ নয়। মহাপ্রভু "আপনি আচরি ভক্তি জীবেরে শিখায়।" তিনি অনন্ত গুণের অফুরন্ত খনি হইলেও দীনতাবশে দেখাইতেন, যেন তাঁহার কোন গুণই নাই; তিনি শুচিশুদ্ধ-শিরোমণি হইলেও দেখাইতেন, যেন তাঁহার মত অশুচি অশুদ্ধ আর দুইটি নাই। তাই তিনি গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতেই অহরহঃ অবস্থান করিতেন।

ভোগমণ্ডপ—গরুড়-স্তম্ভের ঠিক পশ্চাতে। মহাপ্রভু ঐ ভোগমণ্ডপেরই দ্বারে দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিতেন। অদ্যাবধি ঐ দ্বারের প্রস্তরভিত্তিতে মহাপ্রভুর তিনটি অঙ্গুলি চিহ্ন বিদ্যমান। সেই চিহ্ন দর্শন-স্পর্শন করিয়া শত শত ভক্ত আজিও নয়নজনম সার্থক করিতেছে।

তিনটি নিয়মিত ভোগ কিংবা বল্লভভোগাদি—মহাপ্রভু যেখানে থাকিতেন, তথা হইতে অনেক দূরে ঘরের ভিতরে হইয়া থাকে, সুতরাং সে ভোগ দর্শন করা তাঁহার কিছুতেই সম্ভবে না। ভোগমণ্ডপের দ্বারদেশেই তিনি সতত থাকিতেন, সুতরাং ভোগমণ্ডপের ভোগ দর্শন করাই তাঁহার ঘটিয়া উঠিতে পারে। এদিকে প্রতিদিনই ঐ ভোগমণ্ডপে যাত্রীর তারতম্য অনুসারে কম বেশী অতিরিক্ত বা উপরি ভোগ লাগিয়া থাকেই থাকে আমি তো এমন দিনই দেখি নাই, যেদিন প্রথম ধূপের ঠিক পিঠোপিঠি ভোগমণ্ডপে ভোগ না লাগিয়া থাকে। মহাপ্রভু ঐ ভোগ-মণ্ডপের ভোগ দর্শন করিয়াই ভোগদর্শনের সাধ মিটাইয়া বাসায় বা সমুদ্রতীরে মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিতেন।

উৎকল ভাষায় 'র'কারের বদলে ল'কারের প্রয়োগ বড় বিরল নহে। তাই উপর শব্দটিকে 'উপল' হইতে দেখিয়া বিস্ময়েরও কিছুই নাই।

কিন্তু যাঁহারা ঐ উপল শব্দটি বদ্‌লাইয়া 'উপান' পাঠ খাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মনগড়া অর্থের সঙ্গতি করিবেন কি প্রকারে?—আমি তো কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

তাঁহারা বলেন যে, উপানভোগ কি?—না, অন্ন-ভিন্ন ভোগ। অর্থাৎ ফলমূলাদি। যাঁহারা জগন্নাথের সেবা-নিয়মাদির সমাচার রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এক বল্লভভোগ ছাড়া জগন্নাথের অন্ন-ব্যতিরিক্ত ভোগ আর হয় না। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—

"গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥"

* * *

"হেনকালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগাইল।
শঙ্খঘণ্টা-আদি-সহ আরতি করিল॥"

ইত্যাদি বলিয়া পরে বলা হইয়াছে—

উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা।

এই অংশ দেখিয়া কি মনে হয় বল দেখি?

শ্রীচরিতামৃতে গোপালবল্লভ ভোগই এখন বল্লভভোগ নামে পরিচিত। বল্লভভোগ—আমাদের দেশের বাল্য-ভোগ। জগন্নাথের অবকাশের অর্থাৎ হস্ত-মুখ-প্রক্ষালন স্নানাদির কিছুক্ষণ পরেই এই ভোগ লাগিয়া থাকে। মাখন, মিছরি, সর, ফলমূলাদি ও মুড়কি এই ভোগের উপকরণ। এই বল্লভ ভোগের পর প্রথম ধূপ, তাহার পর ছত্রভোগ হইয়া থাকে। বল্লভভোগের মুড়কি প্রসাদের আস্বাদন অতি অপূর্ব্ব। শ্রীমন্দিরে বেড়ার মধ্যেই ঐ প্রসাদ কিনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যেরূপ ভীমসেনের বদলে—ভীম, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের বদলে—কৃষ্ণ কিংবা দ্বৈপায়ন এবং বলরামের বদলে বল বা রাম প্রভৃতির প্রয়োগ, এখানেও তেমনি গোপাল-বল্লভের বদলে বল্লভের প্রয়োগ। গোড়ায় একটা গোপাল-টোপাল না থাকিলে খালি বল্লভের মানেই বা কি হইবে? কালপ্রভাবে কথার কাট্‌-ছাঁট্‌ কিংবা অদল-বদল হইয়াই থাকে। ঐ বল্লভভোগ ছাড়া যখন জগন্নাথের অন্য কোন অন্নহীন ভোগই নাই, তখন 'উপান'—উপান্ন বা অন্ন-ব্যতিরিক্ত ভোগ বলিতে গেলে—নাম জানি আর না-ই জানি—নাম বলি, আর না-ই বলি, ঐ বল্লভভোগই আসিয়া পড়ে না কি? আর যদি তাহাই হইল, অর্থাৎ উপানভোগ এবং বল্লভভোগ একই হইল, তাহা হইলে শ্রীচরিতামৃতের উপরি উদ্ধৃত অংশে অভিহিত—বল্লভ-ভোগ দর্শনের পর আবার উপলভোগ দর্শনের সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ না হওয়ায়—একটা যা তা অর্থ লাগাইবার জন্যই উপল-পাঠের পরিবর্ত্তে

উপান-পাঠের কল্পনা করা হইয়াছে। উৎকল দেশের অন্ন-ভিন্ন প্রসাদকে 'নিসকড়ি' প্রসাদ বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। (বং সং ১৫৮ পৃঃ)। এদেশেও ঐ প্রসাদ 'নিসকড়ি' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। (ঐ ২৯০ পৃষ্ঠা দেখ)।

উপরে উপল-পাঠের যে প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় কি? আর যদি উপলভোগের ঐ অর্থ-ই না হয়, তাহা হইলে আর অর্থ-ই বা কি করা যাইতে পারে?

একজন এদেশী ভক্ত একদিন বলিয়াছিলেন—আমি তো মনে করিয়াছিলাম—সংস্কৃতে উপল শব্দের অর্থ প্রস্তর—পাথর। উপলভোগ কি! —না পাথরের উপর—অর্থাৎ পাথরের পাত্রের উপর রাখিয়া যে ভোগ, তাহাই বোধ হয় 'উপলভোগ' হইবে।

ভক্তবর কখনও ৺পুরীধামে গমন করেন নাই, শ্রীজগন্নাথের ভোগদর্শনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটিলে ওরূপ অর্থ আর তিনি কখন কল্পনা করিতে পারিতেন না। কেন না শ্রীজগন্নাথের ভোগ প্রধানতঃ মৃৎপাত্রেই লাগিয়া থাকে। ধাতুপাত্রের মধ্যে—তিনখানি বড় বড় থালায় বাড়া ভাত আর টবের মত কয়েকটি পাত্রে পক্কান্ন রাখিয়া ভোগ লাগাইবার প্রথা পরিলক্ষিত হয়। ৺পুরীধামে একজন প্রাচীনের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বর্ত্তমান ভোগমণ্ডপটী ছিল না। তখন শ্রীজগবন্ধুর সম্মুখে—মণিকোঠার বাহিরে যে স্থানটুকু আছে, জয়বিজয়দ্বার দিয়া গিয়া সিঁড়িতে নামিয়া যে স্থানটুকু পাওয়া যায়, ঐ স্থানেই উপরভোগ বা ছত্রভোগ হইত।

দেশ-প্রচলিত ভাষা শব্দের—তা বাঙ্‌লাই হউক, উড়িয়াই হউক, আর হিন্দী হউক সংস্কৃত শব্দের মত আকৃতি দেখিয়া সংস্কৃতের অর্থ তাহার উপর আরোপ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া যায়। উপরের দৃষ্টান্তে

তাহা তো দেখা গেলই, তথাপি আমি নিম্নে আরও কতিপয় শব্দ দেখাইতেছি, যাহাদিগের সংস্কৃতের অর্থ আলাদা আর দেশপ্রচলিত ভাষার অর্থ স্বতন্ত্র।

(১) গর্ব্বিত। সংস্কৃতে ইহার অর্থ—গর্ব্বযুক্ত। কিন্তু ভাষার অর্থ—গৌরবের পাত্র। যথা—

"কি তার গর্ব্বিত-গুরু কিবা ভয় লাজ"

(কাশীদাসী মহাভারত, সভাপর্ব্ব, বঙ্গবাসী সং ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

"ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য-লীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ)

আমরা ধোঁকায় পড়িয়া ঐ গর্ব্বিতকে 'পর্চ্চিত' অর্থাৎ 'পরিচিত' করিয়া ফেলিয়াছি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও একস্থানে ঐ গর্ব্বিত শব্দের প্রয়োগ আছে। আমরা সেটিকেও 'পর্চ্চিত' বলিয়া ভ্রান্তিতে পড়িয়াছি।

(২) গৌড়। সংস্কৃতে ইহার অর্থ—গৌড়দেশ। কিন্তু ভাষার অর্থ—গোয়ালা বিশেষ। উড়িয়া দেশে ঐ গোয়ালাকে কলা-পিঠিয়া বলে। ইহারাই জগন্নাথের রথ টানে। যথা—

"প্রভু কহে—পণ্ডিত! তৈল আনিল গৌড় হৈতে"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩২২, বং সং)

"গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ"

(ঐ ৩৫১ পৃষ্ঠা)

(৩) প্রত্যক্ষে।—সংস্কৃতে প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ—বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ-জনিত জ্ঞান—বাঙ্গালায় অর্থ—প্রত্যেক। প্রত্যক্ষে—প্রতি জনে জনে।

"প্রত্যক্ষে সভারে দিল শচী সুচরিতা"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ৫৬ পৃষ্ঠা, বং সং)

"প্রত্যক্ষে সভারে দেন উত্তম আলয়

(কাশীদাসী মহাভারত ৬৬১ পৃঃ, বং সং)

"প্রত্যক্ষে সভারে দিল বসন ভূষণ"

(ঐ ১১৩৬ পৃষ্ঠা)

"প্রত্যক্ষে শুনহ যত মর্ত্ত্যে অবতার"

(ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা)

(৪) বিষয়ী।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—যে বিষয়-বিমুগ্ধ প্রভৃতি। কিন্তু উৎকল দেশে ইহার অর্থ—দেওয়ান। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত উড়িষ্যার চিত্রগ্রন্থে ১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই বিষয়ী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

যথা,—"নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল" (চৈঃ চঃ ১৭৬ পৃষ্ঠা বং সং)

"বিশ্বাস" এবং "অধিকারী" শব্দও এইরূপ।

ঐ ১৭৭ এবং ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"দানী" শব্দও এই শ্রেণীর। ঐ ৮৯।৯৩ পৃষ্ঠা প্রভৃতি।

(৫) মুকুলিত।—সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ—মুকুলযুক্ত, বাঙ্‌লা ভাষার অর্থ মুক্ত। যথা—"মুকুলিত কেশভার গলিত বসন" (কাশীদাসী মহাভারত, ৩৭০ পৃষ্ঠা, বং সং)।

(৬) কাম।—সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ—মদন, বিষয়াভিলাষ প্রভৃতি, কিন্তু বাঙ্‌লায় অর্থ—কর্ম্ম। ইহার প্রমাণ প্রচুর।

যথা,—"যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম" (চৈঃ চঃ ১৩ পৃঃ বং সং)

(৭) বারি—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—জল। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় অর্থ হইতেছে—বাহির। যথা—

"দেখিয়া তোমার পদ বারি হবে প্রাণ"

(কাশীদাসী ম-ভাঃ, ৮৭১ পৃঃ, বং সং)

"ধিক ধিক্ জীবন যাউক বারি হয়্যা"

(ঐ ১০১৫ পৃষ্ঠা)

"বারি" শব্দের অপর একটি অর্থও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থ—বেড়া বা ঝাড়। যথা,—

"পথে সিজার বারি হয়, ফুটিয়া চলিলা"

(চৈঃ চঃ ৩২৫ পৃঃ বং সং, অন্ত্য ১৩পং)

(৮) প্রমাণ।—সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রভৃতি। কিন্তু ভাষার অর্থ—বড়।

"প্রমাণ কুটীর তথা কৈলা দুর্য্যোধন"

(কাশীদাসী ম-ভা, ১২৪পৃঃ, বং সং)

"কান্ধে করি প্রমাণ-কুটীরে থুইল লৈয়া"

(ঐ ১২৬ পৃষ্ঠা)

(৯) আস্য।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—মুখ (চৈঃ চঃ ১৬২)। ভাষায় অর্থ হইতেছে—আইস। যথা—

"আস্য আস্য বস্য বলি তিন ডাক দিল"

(ঐ ৬২ পৃষ্ঠা)

(১০) পাল্য।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—পালনের পাত্র বা যোগ্য (চৈঃ চঃ ২০৪ ২৮৯ পৃঃ বং সং)। বাঙ্‌লা ভাষায় অর্থ—পাইল। যথা—

"অস্ত্র দেখি পাল্য ভয় ধর্ম্মের কুমার"

(কাশীদাসী ম-ভা, ৯২৬ পৃঃ, বং সং)

"তাহার বিধান এই উপদেশ পাল্য"

"অনুমতি মাগিয়া উত্তর নাহি পাল্য" (ঐ ৯৭৩ পৃষ্ঠা)

(১১) পাঠান্তর।—সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ—ভিন্ন ভিন্ন পাঠ। কিন্তু ভাষায় ইহার অর্থ—দ্বিতীয়, জোড়া।

"ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর"

(কাশীদাসী মঃ-ভাঃ, ৮ পৃঃ, বং সং)

"ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর"

(ঐ ৮১ পৃষ্ঠা)

কাশীদাসী মহাভারত, বঙ্গবাসী সঃ—৯২, ১৯৯, ২০১, ৪২৮, ৮৫৬, ৬০, ১২৭৫ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় ইহার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

উৎকল ভাষায় 'পটান্তর' বলিয়া একটি শব্দ ঐরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১২) ইত্যাদি।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—প্রভৃতি। আর ভাষায় ইহার অর্থ—সাধারণ, প্রাকৃত। যথা—

"ইত্যাদি লোকেতে যেন শুনে অনায়াসে"

(কাশীদাসী মঃ-ভাঃ, ৭ পৃঃ, বং সং)

ঐ মহাভারতের—১০৯, ১৩৮, ২৫০, ৪২৩, ৫৮৯ পৃষ্ঠায় ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে।

কাশীদাসের ভ্রাতা গদাধর দাসের জগত-মঙ্গল গ্রন্থেও ঐ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি।

(১৩) অনুব্রত।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—অনুগত প্রভৃতি। কিন্তু ভাষায় ইহার অর্থ—অনবরত, অবিশ্রান্ত। যথা—

"গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত তথা গান"

(চৈতন্য-মঙ্গল, ৪৭ পৃষ্ঠা, বং সং)

"মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে"

(কাশীদাসী মহাভারত, ৬৬ পৃঃ, বং সং)

ঐ মহাভারতের—১, ১, ১৯৭, ২১৩, ১০৪৯, ১২১৩, ১২২২ পৃষ্ঠায় ইহার প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

(১৪) সন্যায়।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—ন্যায়ের সহিত বর্ত্তমান। আর ভাষায় ইহার অর্থ—সমন্বয়। যথা—

"শুনি ধর্ম্ম-পুত্র তবে সন্যায় করিল॥
এই মত সন্যায় করিয়া দুই দলে।"

(ঐ ৭৩৪ পৃষ্ঠা)

(১৫) অশ্রুত।—শব্দটীর সংস্কৃতের অর্থ—যাহা শুনা যায় নাই। আর ভাষায় অর্থ হইতেছে—অশ্রু-যুক্ত। যথা—

"আলিঙ্গন কৈল কৃষ্ণে অশ্রুত-লোচন"

(কাশীদাসী মহাভারত, ২৭৬ পৃঃ, বং সং)

ঐ মহাভারতের—৪৯৬, ৭১৫, ৭২৫, ৭৩১ পৃষ্ঠায় ইহার প্রয়োগ আছে।

আমার সম্পাদিত জয়দেব-চরিত গ্রন্থেও ইহার প্রয়োগ আছে।

(১৬) যতেন্দ্রিয়গণ।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—যাহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়াছে। আর বাঙ্‌লায় ইহার অর্থ হইতেছে যত+ইন্দ্রিয়গণ যথা—

"যতেন্দ্রিয়গণ, বলিয়ে আপন,"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ১৩১ পৃঃ, বং সং)

(১৭) আয়।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—ধনাদির উপার্জ্জন। আর বাঙ্‌লায় এটি ক্রিয়াপদ। অর্থ—আগমন কর, করিয়া বা করে। যথা—

"দেখি নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু আয়"

(চৈতন্য-মঙ্গল, ১৫৯ পৃঃ, বং সং)

"গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়"

(চৈঃ চঃ ২১১ পৃঃ বং সং)

"আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন"

(চৈঃ চঃ ২৯ পৃষ্ঠা)

"সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়"

(ঐ ২৮ পৃষ্ঠা)

এখানে "আয়" শব্দের অর্থ—আসিয়া।

"আয়ে"—আসে। (ঐ ২৪৩ পৃষ্ঠা)

(১৮) আলি।—সংস্কৃতে ইহার অর্থ—সখী। ভাষায় ইহার অর্থ—আইল (ক্ষেত্রাদির আল্)। যথা—

"মনঃ-কথায় বান্ধি আলি,
মুকুতা প্রবাল ঢালি"

(শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, ১৭৬ পৃঃ, বং সং)

(১৯) মিত।—সংস্কৃতে অর্থ হইতেছে—পরিমিত। আর ভাষায় হইতেছে—মিত্র। যথা—

"ক্ষণেকে আবেশে ডাকে
সুগ্রীব মোর মিত।"

(ঐ, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

(২০) মার।—সংস্কৃতে অর্থ—কন্দর্প। আর বাঙ্‌লায় হইতেছে—প্রহার কর।

(২১) হরি।—সংস্কৃতে শব্দটীর কত রকম অর্থই আছে, কিন্তু ভাষায় অর্থের সহিত একটিরও মিল নাই। ভাষায় অর্থ হইতেছে—হরণ করি। (১)

(১) এই শ্রেণীর আরও কতিপয় শব্দের একটী তালিকা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে।

খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে এমন শত শত শব্দ দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

উৎকল ভাষার ন্যায়, হিন্দী ভাষা শিক্ষা করাতেও আমি প্রাচীন বাঙ্‌লা আলোচনার পক্ষে অনেক আনুকূল্য লাভ করিয়াছি। হিন্দী জানা না থাকিলে কল্পনা-প্রসূত অর্থের খাতিরে আমরা যে কত শব্দকে বিকৃত করিয়া ফেলিতাম, বলিতে পারি না।

'সায়বান' একটি হিন্দী-শব্দ। শব্দটি শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্পাদনের সময় জানা ছিল না। আমারই মত অনভিজ্ঞ পাঠক বা লেখকের পাল্লায় পড়িয়া শব্দটির পাঠান্তরও ঘটিয়াছে অনেক। শব্দের অর্থবোধ না থাকিলে কল্পনার স্রোত যত-যত ছুটিতে থাকিবে, পাঠান্তরও তত-ততই তর-তর বেগে বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। ইহা হইতেছে সিদ্ধান্ত কথা। পাঠান্তরের মধ্য হইতে আমরা 'সায়বান' পাঠের পরিবর্ত্তে 'সাহেবান্' পাঠটি পছন্দ করিয়া লইলাম। কারণ, হিন্দী—সাহেব শব্দটির অর্থ আমাদের জানা ছিল। রাজব্যবহার কোষ গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছিলাম "প্রভুঃ সাহেব ঈরিতঃ"—তাই আমরা কল্পনা-সাহায্যে শব্দটির অর্থ গড়িয়াছিলাম—সাহেবান অর্থাৎ প্রভুত্বব্যঞ্জক। সাহেবান শব্দটি দোলার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সাহেবান দোলা, কি—না, যে দোলা দেখিলে মনে হইবে, ওঃ, এই দোলার অধিকারী খুব বড় লোক!'

ছত্রপতি শিবাজীর আদেশে এই রাজ-ব্যবহার কোষ রচিত হয়। ইহাতে অনেক যাবনিক-শব্দের সংস্কৃত অর্থ সংস্কৃত পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। এই কোষের সাহায্য না পাইলে আমরা 'দবীর খাস' প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ সাধারণে, প্রকাশ করিতে পারিতাম না। অস্মৎসম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্টে—প্রাচীন শব্দের অভিধান দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

কল্পনা আমাদিগকে ইহার অধিক অগ্রসর করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সে দিন (ইং ১৯০৭ সাল, ১১ই মার্চ্চ তারিখের) হিন্দী বঙ্গবাসী পড়িতে

পড়িতে মফঃস্বল স্তম্ভে দেখি—'লোগোঁনে' চীনকা 'সায়বান্' খড়া কিয়াথা ওর বহাঁ বজার লাগাতে থে। কমিশ্নর সাহেবনে উসে বারহ ঘণ্টাকে ভিতর উখাড় ডালনেকা হুকুম ফর্ম্মায়া'। ইত্যাদি। ঐ অংশ পাঠ করিবামাত্রই—কেহ বলিয়া না দিলেও শব্দটির অর্থবোধ হইয়া গেল। 'সায়বান' কি? হিন্দী বঙ্গবাসীতে 'সায়বান-শব্দের প্রয়োগ আরও দেখিয়াছি। এখানেও উক্ত 'ছত্রী' বা 'অবয়ন' অর্থ-আরও অধিক পরিস্ফুট-হইয়াছে। যথা,—গোলা বহক্‌গয়া। প্রথম শ্রেণীবালে অংশপর ন পড়কর দ্বিতীয় শ্রেণীবালে অংশকে সায়বান পর পড়া। সায়বানপর গোলেকা সফেদ দাগ কা গয়াহৈ। কুছ ওর নীচে পড়তা তো সায়বান্ তলসে নিকলকর খিড়কীকী রাহ দ্বিতীয় শ্রেণীকা ভীতর যা ফট্তা।" (ইং ৯৯১৮ সাল, ২৮শে ডিসেম্বর, 'ফির বম' শীর্ষক প্রবন্ধ)। সায়বান কি—না, ছত্রী। তখন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কথা মনে পড়িয়া গেল। বুঝিলাম—ছত্রীদার দোলাই 'সায়বান দোলা'। হিন্দীভাষার চর্চ্চা না থাকিলে শব্দটির যথার্থ অর্থ কখনও বুঝা যাইত কি?

আরও একটা কথা বলি। আমরা হাই তুলিয়া থাকি সকলেই, কিন্তু এই শব্দটি কোথা হইতে আসিল, কেহ বলিতে পারেন কি?

হাই-তোলার সংস্কৃত শব্দ হইতেছে—জৃম্ভণ। ঐ জৃম্ভণ-শব্দ হইতেই হাই শব্দটি আসিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে যে আসিয়াছে, তাহা হিন্দী জানা না থাকিলে কিছুতেই মাথায় আনা যাইতে পারিবে না। জৃম্ভণ শব্দের প্রাকৃত—জিমহণ। ঐ জিমহণ হইতে হইল হিন্দী—জিমুহাই বা জিমহাই। এখন বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, আমরা ঐ জিম্ বাঙ্‌লাভাষায় জিমুটুকু বাদসাদ দিয়া কেবল 'হাই' টুকুই লইয়াছি।

প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষার যথার্থ আলোচনা করিতে হইলে নানা ভাষার সহিত পরিচয় রাখা একান্ত আবশ্যক। কেবল সংস্কৃত-হিন্দী প্রভৃতি

লইয়া কথা নহে, নানাদেশে প্রচলিত ভাষার খোঁজ-খবর রাখাও যারপর-নাই দরকার।

এইখানে একটা রহস্য-জনক যথার্থ ঘটনার উল্লেখ করি। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-সম্পাদন-কালে আমরা একটি শব্দ লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়া-ছিলাম। মহাপ্রভুর ছেলেবেলার দুষ্টুমির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ পথিকগণের পশ্চাতে গিয়া বাওস্ বা বাওয়াস ভাঙ্গিয়া দিতেন। বাওস বা বাওয়াস শব্দটি আমাদের এদেশের নয়। তাই কল্পনা ছুটিয়াছে। পাঠান্তরও যথেষ্ট ঘটিয়া গেছে। অমৃতবাজারের সংস্করণে দেখা গেল—'বায়স' পাঠ ছাপা হইয়াছে। কালিদাস আর আমি অনেক মাথা কুটাকুটি করি, অর্থ আর লাগে না। শেষ সিদ্ধান্ত হইল—বায়স মানে কাক। লক্ষণা করিয়া অর্থ করা যাক্—কাকের ডিম্। যখন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এরূপ স্থলে লক্ষণা চালাইয়া 'গঙ্গায়াং' গঙ্গাতীরে অর্থ করা চলে, তখন 'বায়স' বলিতে 'কাকের ডিম' অর্থই বা না করা চলিবে কেন? এই অর্থ বলিয়া আমরা দুজনে মহাহাসি জুড়িয়া দিয়াছি, এমন সময় আমার সহাধ্যায়ী সুহৃদয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ (হিতবাদীর বর্ত্তমান সম্পাদক) তাঁহার দাদার সহিত আসিয়া উপস্থিত। আমাদের হাসি দেখিয়া চন্দ্রোদয়ও হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল এত হাসি কিসের? আসল কথা শুনিয়া তাঁহারা দু'ভায়ে আরও অধিক হাসি জুড়িয়া দিলেন—চন্দ্রোদয়ের দাদা বলিয়া উঠিলেন—'আরে, বাওয়াস জানেন না, শস্য-শূন্য শুক্না লাউ—শুক্না লাউ।'

চন্দ্রোদয়দের বাড়ী শ্রীহট্টপ্রদেশে। বাওয়াস শব্দটি ঐ-দেশী। তাই তাঁহারা শুনিবামাত্রই শব্দটির অর্থ বলিয়া ফেলিলেন। কল্পনার সাহায্য লইতে হইল না। শ্রীহট্টের ভাষা জানা থাকিলে আমাদেরও যে কল্পনা চালাইতে হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা এতক্ষণে বুঝিলাম যে, মহাপ্রভু আজকালকার দুষ্টছেলেদের মত পথিকদের পিঠে কাদের ডিম্ ভাঙ্গিতেন না, কিন্তু পথিকদের পিছন পিছন গিয়া তাহাদের জলপাত্ররূপে ব্যবহৃত ভিতর ভুয়া শুকনা লাউ গুলিই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক-সা করিয়া দিতেন।

পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, ঐ বাওয়াস শব্দই ঢাকা অঞ্চলে হইয়াছে 'বাওস' এবং নদিয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে হইয়াছে—লাউএর 'বস্'।

প্রাচীন বাঙ্‌লার আলোচনা বড় কঠিন। কেবল প্রাদেশিক ভাষা জানা থাকিলেও অব্যাহতি নাই। সম্প্রদায় বিশেষে ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থও সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক।

যেমন—আনন্দ একটি শব্দ। সংস্কৃত বা বাঙ্‌লা ভাষায় সকল দেশেই ইহার অর্থ একই কিন্তু তান্ত্রিকগণের কাছে গেলে এই আনন্দ শব্দের দেশ-প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়া অপর অর্থ তাঁহারা শুনাইয়া দিবেন। তাঁহাদের কাছে আনন্দশব্দের অর্থ হইতেছে—মদ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই 'আনন্দ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই। চৈতন্যভাগবতে আছে,—মহাপ্রভু যে সময় ৺কাশীধাম হইতে গমন করেন, তখন সন্ন্যাসি-মহলে তাঁহার একটা ভারি নিন্দা রটিল,—বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের মাত্র আর দুইটি দিন বাকি, চৈতন্য তাহাকে অতিক্রম করিয়া—আপন ধর্ম্ম খাইয়া চলিয়া গেলেন কেন?

আমরা ঐ অংশ পড়িলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, তাহা কিছুতেই মগজে যোগাইতে পারিলাম না।

এঁকে ওঁকে-তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, ভিতরে টিকিট দিয়া এঁকে ওঁকে তাঁকে পত্রও লিখি, কিন্তু সদুত্তর কাহারও কাছে কিছুই পাইয়া উঠিলাম না। এক শান্তিপুরধামা মদনগোপাল প্রভু ছাড়া পত্রের উত্তর বড়-একটা কাহারও কাছে

পাওয়াও যাইত না। আমরা বাতিকে পড়িয়া এঁকে-ওঁকে-তাঁকে পত্র লিখিয়া পয়সা খরচ ও সময় নষ্ট করিতাম মাত্র।

এদিকে বিশ্বরূপক্ষৌর জিনিষটা বা ব্যাপারটা যে কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের আগ্রহ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। যাহার জন্য অকলঙ্ক গৌরশশীতেও কলঙ্ক, না-জানি সে জিনিষটা কি? ইহা যতই ভাবি, ব্যাকুলতায় প্রাণ ততই তোলপাড় করিয়া তুলে।

'বিশ্বরূপক্ষৌর' সন্ন্যাসিদের ঘরোয়া শব্দ। অভিধানে তাহার অর্থ নাই। শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্যের পক্ষে ইহার অর্থ জানা অসম্ভব। তাই বা পাই কোথায়? ৺কাশীধামে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী সতত অবস্থান করেন। সেইখানেই যাই, একবার চেষ্টা চরিত্র করিয়া দেখা যাক্‌, কত দূর কি হয়?—এইরূপ ভাবা-চিন্তা করিতে করিতে ৺কাশীধামে গমনই স্থির করিয়া ফেলিলাম।

তথায় গিয়া ১৬ দিন ধরিয়া অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। আমি গৃহী বলিয়া কেহই কিন্তু অণুমাত্র আমল দিতে চাহিলেন না, আমার মাছ ধরা হইল না। কাদাঘাঁটাই সার হইল। সে যাত্রা শুষ্কমুখেই ৺কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ব্যয় হইল অনেকগুলি টাকা।

মাণিকতলা হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্তব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তারী ছাড়িয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। ভাল ভাল সাধু-সন্ন্যাসীর সমীপে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। অনেকে তাঁহাকে ভালও বাসেন। আসিবার সময় এই টুকুর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আসিয়াছিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া অস্থির করিয়া ফেলিলাম। তিনি যদি দয়া করিয়া কোন শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর সমীপে শব্দটীর অর্থ অবগত হইয়া আমাকে লেখেন। তিনিও যথেষ্ট চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। ভগবৎকৃপায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা সফল হইল। একবৎসর পরে তিনি আমাকে একখানি পত্রে 'বিশ্বরূপক্ষৌর' শব্দের বিশেষ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। আমি সেই পত্রখানি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টে যথাযথ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছি।

সন্ন্যাসিগণ প্রতি ঋতু-পূর্ণিমায় ক্ষৌর করিয়া থাকেন। ছয় ঋতুর ছয়টি ক্ষৌর, নামও ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন—ভাদ্র পূর্ণিমার ক্ষৌর—বিশ্বরূপ ক্ষৌর।

চাতুর্মাস্যের মধ্যে সন্ন্যাসিগণের কোথাও যাইবার নিয়ম নাই। দেশকাল বিরোধ উপস্থিত হইলে যদি নিতান্ত যাইতে হয়, তবে বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিন যাইতে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে কিছুতেই নয়।

মহাপ্রভু ঐ ক্ষৌর অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করাতেই সন্ন্যাসিগণের নিন্দা-ভাজন হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, এই বিশ্বরূপক্ষৌরের অর্থ আবিষ্কৃত হওয়াতে আমরা আর একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বও অবগত হইতে পারিলাম। সেটি এই যে,—মহাপ্রভু ভাদ্রমাসে ৺কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন।

হিন্দীপ্রভৃতির মত প্রাকৃতভাষার আলোচনা থাকায় আমি প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষার অর্থ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকি প্রাকৃত-প্রকাশ, হেমচন্দ্রের দেশী শব্দমালা প্রভৃতির পরামর্শ গ্রহণ করা ভাষা আলোচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

(বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশের ঠিকানা বা পৃষ্ঠাঙ্কগুলি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত কাশীদাসী মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের।)

—সঙ্গীত চর্চ্চা

প্রভুপাদ সঙ্গীত শাস্ত্রে কিরূপ উন্নত ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং সুধীগণের সমীপে তাঁহার কিরূপ আদর ছিল তাহা গন্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ের

বঙ্গীয় প্রান্তিক সঙ্গীত-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ হইতেই সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় হইবে। এই বিরাট্ অধিবেশন কলিকাতা এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য ভক্ত প্রবর বিষ্ণুদিগম্বরজী সদলবলে এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সঙ্গীতকলার চরমোৎকর্ষ ভজন-সঙ্গীত তাহাই তাঁহার সুললিত কণ্ঠের মাধুর্য্যে সকলকে বুঝাইয়া দেন। নাট্যরসিক অমৃতলাল বসু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতাদি দ্বারা এই সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। বিষ্ণুদিগম্বরজীর কণ্ঠের সঙ্গীত "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম" শ্রোতৃবৃন্দের কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া অভিনব আনন্দ সৃষ্টি করে আর সকলের উপরে সেইদিনের সভায় প্রভুপাদের উদাত্ত কণ্ঠের মধুবর্ষি অভিভাষণ সঙ্গীত শাস্ত্রের বিজয় ঘোষণা করে। আমরা অভিভাষণটি পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

সমবেত-সজ্জনগণ,

নাসিক গন্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয় সমগ্র ভারতবর্ষে সঙ্গীতবিদ্যার গৌরবপ্রচারে ব্রতী হইয়া আজ কয়েকবর্ষ ধরিয়া দিল্লী, অমৃতসর, সিন্ধু করাচী, অহমদাবাদ, গুজরাত, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, নাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে সঙ্গীত-বিদ্যার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। এই সঙ্গীত-মহাসভার অধিবেশন কখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। আজ বঙ্গের পরম সৌভাগ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞ কৃতী সন্তানগণ সঙ্গীত আলোচনা-ব্যপদেশে কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত হইয়াছেন। এতদিন এই মহাসভার নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞ মনীষিগণই করিয়া আসিয়াছেন; অদ্যকার এই প্রাদেশিক অধিবেশনে সভার উদ্যোক্তৃগণ আমার মত একজন অভাজনকে কেন যে সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ গৌরবময় পদে বরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি সন্দেহ নাই। একটা কথা কিন্তু আমার মনে হয়—কলিকাতার ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই,

কোন কোন বিজ্ঞাপনদাতা তাঁহার ঔষধসেবনের পূর্ব্বের এবং পরের চিত্র বিজ্ঞাপনে অঙ্কিত করিয়া দেন। সভার উদ্যোক্তৃবর্গও বোধ হয় সঙ্গীতের বর্ত্তমান দুরবস্থার চিত্র প্রদর্শনের জন্যই আমার মত একজন বেসুরা-বেতালা লোককে সভাপতিরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। আর তাঁহাদের ব্যবস্থাপিত মহৌষধ সেবনের পরে সঙ্গীতের যে সুস্থ অবস্থা আসিবে, তাহার চিত্র দেখিবার জন্য আপনাদিগকে অবশ্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যদি সে শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন আপনারা একজন প্রকৃত সঙ্গীতকলায় সুপণ্ডিত সাধকপ্রবরকেই সভাপতি-রূপে দেখিতে পাইবেন।

আপনারা আজ আমাকে যে গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার যোগ্য আমি নহি। কিন্তু আপনাদের ভালবাসার এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও আমার নাই। সকল সভার প্রথা অনুসারে, মুখবন্ধে সভাপতিকে দুইটা কথা বলিতেই হয়। সুতরাং আমি কোনরূপ মুখবন্ধ না করিয়াই একেবারে মুখ খুলিয়া দিলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি।

শাস্ত্র ধরিয়া পুরাপুরি সকল কথা বলিব না। যাহা কিছু বলিব দিগ্‌দর্শন হিসাবেই বলিব।

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উপস্থিত হয়,—এই মরণ-মাখা অশান্তিপূর্ণ সংসারে অমৃতভরা শান্তির পসরা সঙ্গীত আসিল কোথা হইতে? সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই জগতের সৃষ্টি। সঙ্গীতেই জগতের পুষ্টি—সঙ্গীতেই ইহার লয়। জগতের যে দিকে চাও সেই দিকেই সঙ্গীত। পক্ষিকূজনে সঙ্গীত, নদীর তরঙ্গভঙ্গে সঙ্গীত, বায়ুপ্রবাহে, নক্ষত্রকিরণে সঙ্গীত। যেখানে ভাব—প্রীতি সেইখানেই সঙ্গীত। সঙ্গীতে সভ্য অসভ্য বিচার নাই—ভাবের আধিক্য

হইলেই লোকে সঙ্গীত করিবে। সুপ্রাচীন বৈদিক প্রভাবকালে সামগান হইত। ভারত ঋষিদিগের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ও প্রচ্ছায়-সমীরিত সামঝঙ্কারে সরস্বতী নৃত্য করিত। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহা হইতে গীতের ছন্দোমঞ্জরী আবিষ্কার করিলেন—

"সামবেদাদিদং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ"

সঙ্গীতকলা খুব প্রাচীন। বৈদিক বর্ণনায় সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায়।

"ভূমিঃ শ্লোকং জগৌ"—শতপথ-ব্রাহ্মণ ১৩, ৭, ১, ১৫,"

"তদপ্যেতে শ্লোকাঃ অভিগীতাঃ"—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৮, ২২, এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন,—যাঁহারা যজ্ঞ কার্য্যে অধ্যক্ষতা করিতেন আর যাঁহারা যজ্ঞদর্শন করিতেন, তাঁহারা হোতাদিগের নীরস মন্ত্র, অধ্বর্য্যুদের সমস্বরবিশিষ্ট আবৃত্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের কল্পনাশক্তির উত্তেজনার কিছু দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের এই অভাব মোচন করিবার জন্য উদ্গাতা নামে একশ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইঁহাদের কাজ হইল যজ্ঞে সামগান করা। এই সাম ঋগ্বেদ হইতে লইয়া সঙ্গীতের সুরে বাঁধা হইত। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে সামবেদেই সঙ্গীতের আদি বিজ্ঞান ও কলার অস্তিত্ব। বোধ হয় তারপর হইতেই সঙ্গীতের ফোয়ারা ছুটিল। বৈদিক আচারে তখন সকলকেই যজ্ঞ করিতে হইত। কিন্তু সকল যজ্ঞেরই সঙ্গীত একটী বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইজন বীণাগাথী বীণা বাজাইত। একজন ব্রাহ্মণ, একজন রাজন্য। ব্রাহ্মণ দিনেরবেলা বাজাইত, রাজন্যের বাজাইবার পালা ছিল রাত্রিতে। পুরুষমেধ যজ্ঞে বীণা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিত। গায়কগণ গান করিত। নৃত্যও হইত। মহাব্রতে নাচ।গান বাজনার অবধি ছিল না। ঋগ্বেদে মন্দিরা বাজাইয়া নাচের কথা আছে। মন্দিরাকে তখন 'আঘাটি' বলিত।

ঢাক ছিল, নাম আড়ম্বর। পুরুষমেধ যজ্ঞে ঢাকওয়ালাদের ধরিয়া আনিবার কথা আছে। ঢাকওয়ালাদের 'আড়ম্বরাঘাত' বলিত। তখন অনেক রকমের বীণা ছিল। এক রকম বীণার নাম 'কর্করি'। নলখাগড়ার গাঁট হইতে এক রকম বীণা তৈরী হইত—তার নাম "কাণ্ডবীণা"। এগুলি মহাব্রতযজ্ঞে বাজান হইত। ফ্লুটের মত কাঠের এক রকম বীণা ছিল, তার নাম "তূণব"। নল দিয়া এক রকম ফ্লুট তৈরী হইত তার নাম ছিল 'নাড়ী।' মহাব্রতে শততন্তুর এক রকম বীণা বাজান হইত তাহার নাম 'বাণ'। সাত তারের বীণার নাম ছিল 'বাণী'। বীণা তো ছিলই—এ ছাড়া বীণার কয়েকটী অংশের নামও বেদে পাওয়া যায়, যেমন—শিরঃ, উদর, অম্ভন, তন্ত্র, বাদন। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ছিল। গর্গর, গোধা, তলব, দুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি, পিঙ্গা, বকুর, বাকুর, বেকুরা, বাদিত,—এগুলি খুব প্রসিদ্ধ বৈদিক বাজনা।

শার্ঙ্গধর 'নর্ত্তনাধ্যায়ে' বলিয়াছেন—

"নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ।"

কল্লিনাথ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"নাট্যবেদ এব গীতপ্রাধান্যবিবক্ষয়া গান্ধর্ববেদ উচ্যতে। অভিনয়প্রাধান্যবিবক্ষয়া তু নাট্যবেদ ইত্যুচ্যতে।"

ভরত স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রে (১ম অধ্যায়) উপদেশ করিয়াছেন।

"সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ববেদানমুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥১৬
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্বণাদপি ॥১৭

ভগবান্ ভরতমুনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুস্মরণ করিলেন। তারপর নাট্যবেদ রচনা করেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস

গ্রহণ করিলেন। কল্লিনাথও (সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় ২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ) এই কথাই বলিয়াছেন—"ঋগাদিমুখ্যবেদমূলত্বেন চ চতুর্মুখেন দত্তস্য বেদত্বে সিদ্ধে তদর্থভূতনাট্যপ্রতিপাদকভরতমুনিপ্রণীতস্য চতুর্বিধপুরুষার্থফলস্য শাস্ত্রস্য বেদমূলত্বেন বৈদিকত্বং বেদিতব্যম্।"

যেমন তিন বেদ আছে, তেমনই তিনটী উপবেদও আছে—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ। শাস্ত্র বলেন—"সামবেদস্যোপবেদো গান্ধর্ববেদঃ"। মহাভারত বলেন (৭।২০২।৭৫), নারদ গান্ধর্ববেদকর্ত্তা। গান্ধর্ববেদ বলিলে বুঝায়—"গীতং নৃত্যং চ সাম চ বাদিত্রঞ্চ" (৩।৯১।১৪)। মহাভারতে সঙ্গীত বলিলে এই চারিটীই বুঝাইত। মহাভারতে দেখা যায়, গান শিখিতে হইলে সপ্তবাণী সাধিতে হইত। "বাণী সপ্তবিধা" (২।১ ১।৩৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ও (২।২২।১৭) সপ্তবাণী স্বীকার করিয়াছেন – ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, নিষাদ। তখন তিন গ্রাম পরিজ্ঞাত ছিল। "ত্রিঃসামা হন্যতাং এষা দুন্দুভিঃ" (৩।২০।১০)। বীণা মধুরালাপা গান্ধর্বং সাধু মূর্চ্ছতি (৪।১৭।১৪)। গান্ধর্ব সপ্তগ্রামের তৃতীয় ছিল (১২।১৮৪।৩৯ = ১৪।৫।৫৩)। রামায়ণ মহাভারতে দেখা যায়, সে সময় একটা নিয়ম ছিল বংশনাম কীর্ত্তন করা।

বংশপরম্পরার গুণাবলী শ্লোকে লেখা হইত। তার নাম ছিল— "অনুবংশশ্লোক" বা "অনুবংশগাথা।" মহাভারতের বনপর্ব্বে (৮৮—৫) আছে—"মার্কণ্ডেয়ো জগৌ গাথাম্ (অনুবংশ্যাম্)"; আদিপর্ব্বে (১২১—১৩) আছে—"অপ্যত্র গাথাং গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।" গাথাতে রাজাদের শৌর্য বীর্য্যের উদাহরণ দিয়া জয় গান করা হইত। সেই গাথাগুলিকে 'নারাশংসী গাথা' বলিত। এই সমস্ত গাথা একজনেও গায়িত, অনেক লোকে একসঙ্গেও (Chorus) গায়িত। ইহাদের "গাথী" বলা হইত। ইহাদের সঙ্গে বীণা থাকিত, সাত তারের বীণা—নাম "সপ্ততন্ত্রী বীণা"

(৩।১৩৪।১৪)। এ ছাড়া বন্দীরা গান করিত, "গায়ক"রা "গায়ন"রা গান করিত। "জগুর্গীতানি গায়কাঃ কুরুবংশস্তবার্থানি" (৭।৮২।২-৩)। মহাভারতে পাওয়া যায়, সে সময়ে পেশাদার গায়ক ছিল—নান্দীবাদ্য, সৌখ্যশায়িক, বৈতালিক, কথক, গ্রন্থিক, কুশীলব ও পৌরাণিক সম্প্রদায়। এখন যেমন হিন্দুস্থানী গায়কদের বাঙ্গালায় খুব নাম, পৌরাণিক যুগে মাগধদেরও সেই রকম পসার ছিল। মাগধ বলিলে সঙ্গীত-বিশারদ মাগধই বুঝাইত। নট, সূত, বৈতালিকদের রাজারা মাহিনা দিয়া কাছে রাখিতেন (২।৪।৭)।

বাৎসায়নের কামসূত্রে অতি প্রাচীন সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে, সেকালে বৈহারিক শিল্পচর্চ্চা খুব ছিল। বৈহারিক শিল্পের মধ্যে বীণাবাদন একটী। স্ত্রীলোকেরাও বীণা বাজাইত। বীণার ব্যবহার এত সাধারণ হইয়া গিয়াছিল যে, নববধূকে উপহার পাঠাইবার পুতুলের বাক্স (পিণ্ডোলিকা), এবং পুতুলের সাজসজ্জার বাক্সের (পটোলিকা) সঙ্গে একটী ছোট বীণাও পাঠান হইত। ছোট বীণাকে বীণিকা বলিত। রাজাদের বাড়ী, বড় বড় লোকদের বাড়ী নাট্যশালা থাকিত, তাহাতে সঙ্গীত চর্চ্চা হইত।

প্রাচীনকালের সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকেই বই লিখিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিশারদ গ্রন্থকারদের সংখ্যাও বড় কম নয়। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইলে একটা প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিতে হয়। ভরতই সঙ্গীত-শাস্ত্রকারদের মধ্যে প্রাচীনতম। সঙ্গীত-রত্নাকরও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা শার্ঙ্গদেব। ইনি দেবগিরির (বর্ত্তমান দৌলতাবাদের) রাজা শিঙ্ঘনের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। শিঙ্ঘনের রাজ্যকাল ১১১০—১২৪৭ খৃষ্টাব্দ। শার্ঙ্গদেব ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাকারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পাঁচজন টীকাকারের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—লোল্লট,

উদ্ভট, শঙ্কুক, অভিনবগুপ্ত ও কীর্ত্তিধর। শার্ঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থে ভরত, কশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দ্দূল, কোহল, বিশখিল, দাঁত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, বায়ু, বিশ্বাবসু, অর্জ্জুন, নারদ, তুম্বুরু, আঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, স্বতি গুণ, বিন্দুরাজ, ক্ষেত্ররাজ, রাহুল, নান্যভূপাল, ভোজরাজ ও পরমর্দী সোমেশ মহীপতির সাম সঙ্গীত-শাস্ত্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকা লিখিয়াছেন "চতুর কল্লিনাথ।" ইনি ষোড়শ শতকের লোক। ইঁহার টীকায়ও বেণা, মাতঙ্গ, কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, হনুমান্ (আঞ্জনেয়), দাত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, রুদ্রট, কশ্যপ, উমাপতি, নেপালনায়ক প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্রকারের নাম আছে। "সঙ্গীত-মেরু" কোহলাচার্য্য, ভট্টতুণ্ডু, সুমন্ত, পুরারি, ক্ষেমরাজ ও লোহিত ভট্টের নাম করিয়াছেন। নারদ তাঁর "সঙ্গীত-মকরন্দে" অনেকগুলি সঙ্গীত-শাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন। নামগুলি এই—

সদাশিবো হরিব্র্হ্মা ভরতঃ কাশ্যপো মুনিঃ।
মতঙ্গোযশ্চ দুর্গা চ শক্তিশার্দূলকোহলাঃ।
হনুমাংস্তম্বুরুশ্চৈব অঙ্গদশ্চৈব নারদঃ।
এতে সাহিত্যসর্ব্বজ্ঞা বুধাস্তান্ সং প্রচক্রমুঃ॥

নৃত্যাধ্যায়—২য় পাদ পৃঃ ৩৩।

শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' (পৃঃ ৫—৬) ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের নাম আছে। সঙ্গীত-রত্নাকর ১২১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লেখা। শার্ঙ্গদেবের উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকারগণই শুধু মাঝে মাঝে এই সমস্ত গ্রন্থের কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব যতগুলি সঙ্গীত-শাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 'কোহল'ই ভরতের ঠিক পরবর্ত্তী।

ভারতবর্ষে সঙ্গীতের আলোচনা সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেবতাদের নিকট হইতে মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে, এইরূপও উক্তি আছে। ঋষিরা প্রধান বিদ্যারূপে ইহার অনুশীলন করিতেন। ঋষিরা রাগ-রাগিণীর সাহায্যে সাম ঋক্ পাঠ করিতেন। আমাদের সঙ্গীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। পূর্ব্বে তা ছিল না। ছিল ছয় রাগ ও ছয় রাগিণী। শিবশক্তি হইতে পাঁচ রাগের উৎপত্তি, এক রাগ পার্ব্বতীর মুখজাত। ছয় রাগের নাম নানারকমে দেওয়া হয়। আমরা বাঙ্গালীরা বলি—ভৈরব (শিব), শ্রী (লক্ষ্মী), মেঘ, পঞ্চম, বসন্ত, নটনারায়ণ (বিষ্ণু)। মধ্যভারতের লোকেরা শেষ তিনটীর পরিবর্ত্তে কৌশিক, হিন্দোল ও দীপক বলিয়া থাকেন। এক এক রাগ ভাঁজিবার স্বতন্ত্র সময় আছে। যখন তখন যে কোন রাগিণী আলাপ করা যায় না। লোক শিক্ষার জন্য কীর্ত্তন, কথা, ভজন ও পুরাণগান হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া এই গুলিতে অনেক কাজ হয়। বাঙ্গালার কীর্ত্তন বাঙ্গালার নিজস্ব। বোম্বাই প্রদেশে 'কীর্ত্তনে ও কথায়' বড় একটা পার্থক্য নাই। কথক ছোট ছোট দুইটী বংশখণ্ডে তাল দেন। আজকাল ইঁহারাও হারমোনিয়ম জুটাইয়াছেন। ইঁহারা রামায়ণ-মহাভারতের গান করেন। ভজন—কীর্ত্তনও কথা হইতে ভিন্ন। বাঙ্গালাদেশে গম্ভীরাগান, সারিগান, ঝুমুর, কামিনদের গান এক নূতন ধরণের গান। ছোট জাতেদের মধ্যে গাজন সঙ্গীতও হয়। ইহাও গম্ভীরার রকম ফের। বাঙ্গালায় নিজস্বসুরের এক রকম গান আছে তাকে বাউল-সঙ্গীত বলে। অষ্টাদশশতকে রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত এক অপূর্ব্ব সুরে রচনা করিয়াছিলেন। অপর সমস্ত সুর হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই সুরকে রামপ্রসাদীসুর বলে।

সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী-সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে। নাই কেবল অভাগা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বেশী দিনের কথা নয়, একজন বড়-দরের

সাহেব, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—সকল সভ্যদেশেই ইউনিভারসিটির সহিত দেশী সঙ্গীত-চর্চ্চার ব্যবস্থা আছে, আপনাদের কলিকাতার ইউনিভারসিটিতে কি প্রকার সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়েন। তার পর তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য এক পরামর্শ সভার অনুষ্ঠান করেন। তিনি জীবিত থাকিলে হয়তো এত দিনে সঙ্গীত-চর্চ্চার একটা ব্যবস্থা হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে ইহার পরীক্ষারও বন্দোবস্ত হইত। যাহা হউক, এসম্বন্ধে আপনাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। সঙ্গীতের রীতিমত অনুশীলনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে। শাস্ত্রসঙ্গত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কালমাহাত্ম্যে সঙ্গীতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিদেশের সম্পর্কে আসিয়া বিদেশী অনেক সুরকে দেশ নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। রঙ্গালয়ে, যাত্রায় যথেচ্ছাচার চলিতেছে। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর পরিবর্ত্তে এখন জঙ্গলা সুরই আসর জমকাইয়া বসিয়াছে। তালেও ঠুংরি, খ্যামটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নৃত্যেও ডনবৈঠকের পূর্ণ রাজত্ব প্রকটিত। সে যে কি অপূর্ব্ব তা কি বলিব। যাহা হউক সঙ্গীত-বিদ্যার সমুচিত আলোচনায় সুরের নানাবিধ ব্যভিচারকে দমন করিয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে হইবে।

সাধারণতঃ সঙ্গীত বলিতে কেবল গীত বা গানই বুঝায়। কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রে "সঙ্গীত" বলিতে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য,—এই তিনই বুঝাইয়া থাকে। যথা,—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"

(সঙ্গীত-রত্নাকর)।

তবে যে সময় সময় কেবলমাত্র গীতকেই 'সঙ্গীত' বলা হয়, তাহা ঠিক যেন বস্ত্রখণ্ডে 'বস্ত্র' শব্দের মত। বিশেষত গীত বাদ্য এবং নৃত্যের মধ্যে গীতেরই প্রাধান্য। গীত যেন প্রভু, বাদ্য তাহার ভৃত্য। আবার নৃত্য হইল সেই বাদ্যেরও অনুগত।

গীতের মহিমা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সঙ্গীতশাস্ত্রে দেখিতে পাই—

গীতেন প্রীয়তে দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পার্ব্বতীপতিঃ।
গোপীপতিরনন্তোঽপি বংশধ্বনিবশং গতঃ॥
সামগীতিরতো ব্রহ্মা বীণাসক্তা সরস্বতী।
কিমন্যে যক্ষগন্ধর্ব্ব-দেবদানবমানবাঃ॥
অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্কিকাগতঃ।
রুদন্ গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে॥
বনেচরস্তৃণাহারশ্চিত্রং মৃগশিশুঃ পশুঃ।
লুব্ধো লুব্ধকসঙ্গীতে গীতে ত্যজতি জীবিতম্॥

দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলেই গীতানুরক্ত। যে বিষয়ের আস্বাদ জানে না, সেই শয্যায় শয়ান রোদনপরায়ণ শিশুও গীতামৃত-পানে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠে। আশ্চর্য্যের কথা তৃণাহারী বনবিহারী পশু হরিণশিশুও ব্যাধের গানে বিমোহিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে, এই গান ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরই সাধন। শাস্ত্র বলেন,—

"তস্য গীতস্য মাহাত্ম্যং কে প্রশংসিতুমীশতে।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামিদমেবৈকসাধনম্॥"

গীতের প্রসাদে অর্থ উপার্জ্জন বা কাম-প্রপূরণ সংসারে সুপ্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মের সাধনেও গীতের প্রয়োগ শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত। বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকরণ আছে—

"ব্রাহ্মণৌ বীণাগায়িনৌ গায়তে ব্রাহ্মণোঽন্যো গায়েৎ।"

গীতের মোক্ষ-সাধনত্বও শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি॥"

(যাজ্ঞ্যবল্ক্যস্মৃতি)।

যে মোক্ষলাভের জন্য জন্মে জন্মে কত কঠোর তপস্যা করিতে হয়, সেই মোক্ষ সঙ্গীতের প্রভাবে বিনা আয়াসেই লভ্য হইয়া থাকে।

মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য ঐ মোক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে। সঙ্গীতের দুইটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একটীর নাম,—মার্গ এবং অপরটীর নাম,—দেশী। যাহা সকলের প্রার্থনার সামগ্রী বা প্রকৃত পথ,—তাহাই হইল—মার্গ। আর যাহা দেশে দেশে সর্ব্বসাধারণের রুচিজনক এবং মনোরঞ্জক,—তাহাই হইল—দেশী।

যথা সঙ্গীতশাস্ত্রে—

"মার্গো দেশীতি তদ্দ্বেধা তত্র মার্গঃ স উচ্যতে।
যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তাভ্যুদয়প্রদঃ॥
দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।
গানঞ্চ বাদনং নৃত্যং তদ্ দেশীত্যভিধীয়তে॥"

(সঙ্গীত-রত্নাকর)।

শুধু তাহাই নহে, শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসার সুকোমল শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিবার পক্ষে যাঁহার শক্তি অসাধারণ, সেই পঞ্চম পুরুষার্থভূতা প্রেমভক্তিও এই সঙ্গীতের প্রসাদে সুলভ হইয়া থাকে। এ

বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের আর ইয়ত্তা নাই। আমরা দুই একটী মাত্র বলি। ভগবান্ আপন মুখে বলিয়াছেন,—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

অন্যত্রও দেখা যায়,—

"হরিসংকীর্ত্তনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥"

এই শ্রীহরিসঙ্গীতই শ্রীহরিতে প্রেমভক্তি লাভের প্রধান সাধন,—এই শ্রীহরিসঙ্গীতই শ্রীহরিকে আপন সমক্ষে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিবার পক্ষে অসাধারণ সাধন।

সঙ্গীত-বিদ্যার অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং অধ্যাপক দেবর্ষি নারদের মুখে আমরা শুনিতে পাই,—

"প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥"

শ্রীভাগবত—১।৬।৩৪।

যদি কাহাকেও আহ্বান করা যায়, সে যেমন তৎক্ষণাৎ আসিয়া দেখা দেয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের লীলা গান করিলে, ডাকিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি অন্তরে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

এ সঙ্গীত অবশ্য মার্গ শ্রেণীর সঙ্গীত। ইহার অপ্রমিত শক্তি-প্রভাবে সঙ্গীতকারী তো কৃতার্থ হনই, সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণকারীও কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রীভাগবতে সূত গোস্বামীর উক্তিতেই দেখিতে পাই,—

"অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ॥"

শ্রীভাগবত—১।৬।৩৯।

এই পারমার্থিক মার্গসঙ্গীত-প্রভাবে কামনাকাতর জগতের জীব কৃতার্থ হয়। যে রাজ্যে ঐ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়, সে রাজ্যে সর্ব্ববিধ সম্পত্তি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা—

"গোবিন্দস্তুতিসঙ্গীতকীর্ত্তনোন্মুদিতস্থ যঃ।
উচ্চৈধ্বর্নিস্তদাহ্বানং তদ্‌রাষ্ট্রং প্রতি সম্পদঃ॥"

(হরিভক্তি-সুধোদয়)।

কেবল তাহাই নহে,—

"বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাদ্ধরিভক্তস্থ নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ॥"

(ঐ)

হরিভক্ত যখন—বাহু তুলিয়া হর্ষভরে নৃত্য করিতে থাকেন, তখন তাঁহার পদতালে পৃথিবীর, দৃষ্টিপাতে দিক্ সমূহের এবং বাহু উত্তোলনে স্বর্গলোকের অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া যায়।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়—দুঃখেরও বিষয়, কালপ্রভাবে এই শ্রেণীর মার্গ-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। দেশী সঙ্গীতও নানা কারণে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনবানেরা নিজে অল্পবিস্তর সঙ্গীতের অনুশীলন করিতেন, সঙ্গীতের অধ্যাপকগণকে প্রতিপালনও করিতেন। এক কথায় তাঁহারা গুণীও ছিলেন, গুণরাগীও ছিলেন। ফলে সঙ্গীতের চর্চ্চা চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দেশের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বড় লোকের ছেলেরা অধিকাংশই বিলাসী। পরিশ্রম করিতে তাঁহারা একান্ত কাতর। সুতরাং কষ্ট করিয়া সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কাজেকাজেই সঙ্গীতবিদ্যাবিদের আদর তাঁহাদের কাছে আদৌ নাই। এ অবস্থায় দরিদ্র কলাবিদের গ্রাসাচ্ছাদন

স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। তাই তাঁহারাও জীবিকার অন্য পথ ধরিতে বাধ্য হইতেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যাও ধীরে ধীরে দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে।

এখন যদি কোন বড় লোকের সঙ্গীতের সখ্ হইল তো তিনি বড় জোর একটী হারমোনিয়ম কিনিলেন, অথবা একটী গ্রামোফোন এবং কতকগুলি গানের 'রেকর্ড' কিনিয়া সখ মিটাইলেন। ইহার ফলে আরও অধিক সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। কারণ যাঁহারা সামান্য কিছু সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, হারমোনিয়মে সকল রাগের আলাপ হইতে পারে না,—শ্রুতির স্বরূপ তো দেখানই চলে না। আর নাকিসুরের গ্রামোফোনের নকল গানে আসল সঙ্গীতের শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ হইয়া যাইতেছে। যদি এদেশের ধনিক সম্প্রদায় এই ভাবে আর কিছু দিন সঙ্গীতের সখ মিটাইতে থাকেন, তাহা হইলে এদেশ হইতে—হরিদাস স্বামী, তানসেন, বৈজুবাওরার দেশ হইতে সঙ্গীতকে অচিরে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। একথা ভাবিলেও নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

এত দুঃখের ভিতরেও বাঙ্গালা দেশের আনন্দ প্রকাশ করিবার একটা কথা আছে। সেটা হইতেছে এদেশবাসীর সঙ্গীত শাস্ত্র প্রকাশের জন্য প্রয়াস। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয় 'সঙ্গীত-রত্নাকর' আংশিক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরলোকগত—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সঙ্গীত-পারিজাত' গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহোদয়দ্বয় বিবিধ তথ্যপূর্ণ বহু সঙ্গীত গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীত-শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বিরাট্ গ্রন্থ "সঙ্গীত রাগ-কল্পদ্রুম" ছাপাইয়া সুলভ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতেও রাধামোহন সেন মহাশয়ের প্রাচীন "সঙ্গীত-তরঙ্গ"

বাহির হইয়াছে। এ ছাড়া সঙ্গীত-বিষয়ক ছোট বড় বহু গ্রন্থ বঙ্গভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং বলিতে হয়, গ্রন্থ প্রকাশের দিক্ দিয়া বঙ্গদেশে কিছু কাজ হইয়াছে।

দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রতি—ধনিক সন্তানগণের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দেশের মৃতপ্রায় সঙ্গীতবিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য স্বতঃপরতঃ যত্নবান্ হউন। এখনও দেশ একেবারে সঙ্গীতের অধ্যাপক-শূন্য হয় নাই। তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে—স্বচ্ছন্দ জীবিকার পথে আনিতে পারিলে নিরাশ হইবার কারণ কিছুই নাই।

ভগবান্ করুন, দেশের লোকের সুমতি হউক। আবার মেঘমন্দ্রস্বরে মুরজের রবে চারিদিক্ মুখরিত হউক, রাগরাগিণীর আলাপচারিতে এবং ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গীতির আবৃত্তিতে প্রতি গৃহ স্বরব্রহ্ম-বিভূষিত হইয়া উঠুক। আবার হাফআখড়াই, পাঁচালী ও কবির সখ্যসংগ্রামে দেশের বিষাদ অবসাদ বিদূরিত হইতে থাকুক।

আর, এদেশ সেই বাঙ্গালা দেশ, যে দেশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তির বন্যা বহাইয়া গিয়াছেন,—প্রেমেমাখা হরিনাম গানে শান্তিপুর ডুবাইয়া নদীয়া ভাসাইয়া গিয়াছেন, এদেশ সেই বাঙ্গালা দেশ। যে দেশে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃনামের মোহন গানে মাতুয়ারা করিয়া গিয়াছেন, এদেশ সেই বাঙ্গালা দেশ। আবার এদেশে ভক্তিরসসিক্ত পারমার্থিক সঙ্গীতের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকুক,—দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাউক। এই শ্রেণীর সঙ্গীত-সভাও সাফল্যমণ্ডিত হউক।

তুণ্ডে তুণ্ডে হরের্নাম
স্বান্তে স্বান্তে হরেঃ পদম্।
গেহে গেহে হরের্গানং
বর্ত্ততাং শ্রেয়সেঽনিশম্॥

মুখে মুখে হরিনাম, স্ফূর্ত্তি পা'ক অবিরাম,
হৃদে হৃদে হরির চরণ।
গৃহে গৃহে হরি-গান, মঙ্গলের সুনিদান,
হউক হউক সর্ব্বক্ষণ।

—দর্শন শাস্ত্র

একদিন প্রভুকে মায়ার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করিতে বলিলে তিনি একটি প্রবন্ধ পড়িতে দিলেন—প্রবন্ধটি প্রভু অনেক দিন পূর্ব্বে এক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। প্রবন্ধের নাম "বিশ্ব প্রহেলিকা।" উহা বড় ভাল লাগিয়াছিল তাই হুবহু তুলিয়া দিতেছি।

সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটকে পড়িয়াছিলাম,—একজন সাপুড়ে এক রাজ সেবককে সাপের খেলা দেখিবার জন্য অনুরোধ করায় সে বলিল,—বাপুহে, আমি যখন রাজ-সেবক, তখন আমিত প্রতিনিয়তই সাপের সঙ্গে খেলা করিতেছি, আমি আর তোমার সাপের খেলা কি দেখিব বল? আজ আমাকে প্রহেলিকার কথা শুনাইতে প্রস্তুত দেখিয়া তোমরাও কেহ হয়তো বলিতে পার,—প্রহেলিকার কথা আর নূতন করিয়া শুনিব কি, চব্বিশ ঘণ্টাইতো আমরা আগা গোড়া হেঁয়ালির ভিতরই পড়িয়া আছি।

তাই যদি তোমরা কেহ এ কথা বল, অসঙ্গত হইবে না। কেননা বিচার করিয়া দেখিলে,—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা বলিয়াই বোধ হয় বটে। বিদগ্ধ মুখমণ্ডন বলেন—

ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ।
যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যতে সা প্রহেলিকা॥

অর্থাৎ বিচারের বা উপদেশের পূর্ব্বে যাহার অন্তরের প্রকৃত অর্থটুকু গুপ্ত এবং বাহিরে অন্যরূপ অর্থ প্রকাশিত থাকে; কিন্তু বিচারের বা উপদেশের, পর অন্তর বাহির—উভয়বিধ অর্থই যাহার প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহাই প্রহেলিকা।

এই লক্ষণ অনুসারে এই সারা সংসারটা একটা জমকালো হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হয় না কি? বাহিরের জগৎ আমাদিগের কাছে আপাততঃ কি এক অর্থ প্রকাশিত করিতেছে; কিন্তু অন্তরের অর্থটুকু তাহার গুপ্ত-ভাবেই সুরক্ষিত রহিয়াছে। সে অর্থ বুঝা সহজ ব্যাপার নয়। ভাইরে অন্তর্জগতের অনন্ত মহিমা। সে মহিমা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর,—অদ্ভুত এবং অলৌকিক ভাবে তাহা অনুপ্রাণিত।

বহির্জগতের দৃশ্যরাজি—বন, উপবন, নদ, নদী, অদ্রি সমুদ্র প্রভৃতিই কত অদ্ভুত ভাবে আমাদিগকে অভিভূত করে। অন্তর্জগতের তো করিবারই কথা।

যাহারা সাধনজ্ঞানের সাহায্যে বাহির ছাড়িয়া ভিতরে যাইতে পারে নাই—অন্তর্জগতের কোনো পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে নাই, তাহা-দিগকে ভিতরের কথায় প্রত্যয় করানো বিষম দায়। যতই বলি, তাহারা তাহা বুঝিবে না,—বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় যাঁহাদিগের অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহাদিগের আর অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি অন্তর বাহির উভয় দিকেই সমান। যাহারা কেবল বাহিরই দেখে তাহারা বাহির ছাড়া ভিতরের কিছুই দেখিতে পায় না। আর যাঁহারা ভিতরের সামগ্রী দেখিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা ভিতরও দেখেন, বাহিরেও দেখেন। উভয়ে এতটা পার্থক্য!

অন্তর্জ্জগতের কাণ্ডকারখানা দেখাটা একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার অর্থ আবিষ্কার। যাহা আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জগৎ বিজড়িতভাবে বর্ত্তমান, কিন্তু তথাপি তাহা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। হেঁয়ালির সাদাসিধে শব্দের ভিতর হইতে তাহার আন্তর অর্থ আবিষ্কার করাও বড় যার তার কার্য্য নয়। ভগবান নাই কোথায় ? আমার অন্তরে বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা সতত বর্ত্তমান। কিন্তু কয়জন তাঁহা উপলব্ধি করিতে পারে ? আবার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও তিনি লোচনের অগোচর হইয়া রহেন, ইহার অপেক্ষা জমকালো হেঁয়ালি আর কিছু হইতে পারে কি ? হেঁয়ালির বাহিরের কথার মানে বুঝা সহজ কিন্তু ভিতরের তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। যে বুঝে সে-ই বুঝে। তাহার আর তাৎপর্য্য অর্থে অবিশ্বাস থাকে না। কিন্তু যে বুঝে নাই, তাহার হয়তো অবিশ্বাস হইলেও হইতে পারে।

এ বিশ্ব প্রহেলিকার তাৎপর্য্য অর্থ আবিষ্কার করা, অর্থাৎ ইহার ভিতর হইতে, কেবল ভিতরই বা বলি কেন, ভিতর বাহির সকলটা হইতে সেই ভগবানকে আবিষ্কার করা অনেক সাধনা সাপেক্ষ। শ্রীগুরুদেব জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়া দিব্য নয়ন উন্মীলিত করিয়া না দিলে সে সাধনাও দেখিতে পাইবার নয়।

হেঁয়ালি ততক্ষণ হেঁয়ালি যতক্ষণ তাহার অর্থ কেহ বলিয়া না দেয়। বলিয়া দিলে হেঁয়ালির আর হেঁয়ালিত্ব থাকে না। তাহার বাহিরের অর্থের মত ভিতরের অর্থও সহজ হইয়া যায়। তখন কেবল মনে হয়, তাইতো এই সহজ কথাটা এতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই, কি আশ্চর্য্য।

এ বিশ্ব হেঁয়ালির অর্থও কেহ বলিয়া দিলে ঐরূপ সহজই হইয়া যায়, আর ঐরূপই মনে হয়, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য এতদিন আমরা এত সহজ জিনিষটা বুঝিতে পারি নাই।

ফলে, বুঝিতে পারিলে সকলই সহজ, না বুঝিলেই যত গোল,—যত অবিশ্বাস। ভাইরে, এই বিশ্বপ্রহেলিকার প্রকৃত অর্থ জানিবার যদি কাহারও সাধ থাকে শ্রীমদ্গুরুর চরণ আশ্রয় কর, তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

—অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ কাহাকে বলে?

প্রভু বলেন—পরমেশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য। শক্তিমান ও শক্তির ভেদাভেদ অচিন্ত্য ইহা সর্ব্ব সম্মত। পদার্থবিজ্ঞানও শক্তি শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া স্বীকার করে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের স্বরূপ অচিন্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে পৌরাণিকের উক্তিকেও শঙ্করাচার্য্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন—লৌকিকানামপি মণি মন্ত্রৌষধি প্রভৃতিনাং দেশ কাল নিমিত্ত বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেক কার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে। তা অপি তাবন্নো-পদেশ মন্তরেণ কেবলেন তর্কেনাবগন্তুং শক্যন্তে···কিমুতাঽচিন্ত্য প্রভবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যতে। তত্রাহু পৌরাণিকাঃ

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

প্রকৃতির পরবস্তু অচিন্ত্য। পরব্রহ্ম প্রকৃতির পরবস্তু অতএব সেই পরম তত্ত্বের শক্তির সহিত ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

বেদস্যতু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তি হেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থ বিষয়-ত্বোপপত্তেঃ তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্ত্বমতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্বৈরপি

তার্কিকৈরপহ্নোতু মশক্যম্। অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্-জ্ঞানত্বং অতোঽন্যত্র সম্যগ্ জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারবিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত।

শঙ্কর বলেন—বেদ নিত্য যথার্থ-জ্ঞান উৎপত্তির হেতু। ব্রহ্ম বিষয়ে বদেরই যোগ্যতা। বেদজনিত জ্ঞান সম্যগ্জ্ঞান। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোনো কালের তার্কিক উহা খণ্ডন করিতে অসমর্থ। অতএব এই ঔপনিষদ্ জ্ঞানের সম্যগ্জ্ঞানতা সিদ্ধ হইল। উহা ভিন্ন অপর অসম্যগ্ জ্ঞান। ঔপনিষদ্ জ্ঞানেই মোক্ষ। বুঝা গেল ব্রহ্মতত্ত্ব লৌকিক তর্ক অগোচর অর্থাৎ অচিন্ত্য। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অচিন্ত্য কথার অর্থ করেন "তর্কাসহম্।"

শঙ্কর বলেন—প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যস্য কপিলস্য হ্যন্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত, এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব। প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্ প্রভৃতিনাং পরস্পরং বিপ্রতিপত্তি দর্শনাৎ।

প্রসিদ্ধ-মহিম কপিল বা তাদৃশ অন্যান্য মতাবলম্বীর সম্মত তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এই কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না অতি পবিত্র ও পুণ্যবান কপিল, কণাদ প্রভৃতিরও পরস্পর এক জনে অপরের মত খণ্ডন করেন দেখা যায়।

এই জন্যই বলিতে হয়—তর্কের স্থিরতা নাই। নিখিল শক্তির পরমাশ্রয় পরমব্রহ্ম ও তাহার শক্তির ভেদাভেদ অচিন্ত্য। শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন—তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্ম সমাশ্রয়নীয়ঃ। শাক্যোলোক্যাক্ষ-পাদক্ষপণক কপিল পতঞ্জলি তর্কানামন্যোন্য ব্যাঘাতাৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে।

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া বেদমূলক ব্রহ্ম সম্যকরূপে আশ্রয় লইবার যোগ্য। শাক্য, ঔলক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতির তর্কে

পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। অতএব ব্রহ্ম-কারণবাদ তর্কমূলক হইতে পারে না ; উহা শ্রুতিপ্রমাণ মূলক। অতএব শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন—

অতীন্দ্রিয়ার্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্।

অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পদার্থে তর্কের স্থান নাই-উহা অচিন্ত্য।

শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্য বলেন—এবমেবতার্কিক বিপ্রতিপত্ত্যাঽনির্মোক্ষ প্রসঙ্গা দ্বেদোক্তস্যৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।

এই প্রকারে লৌকিক তার্কিকগণের বিরোধ উপস্থিতি হেতু বন্ধনমুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ হয় না ; অতএব বেদোক্ত বিষয়েরই উপাদেয়তা অর্থাৎ অচিন্ত্য বিষয়েরই উপাদেয়তা।

বেদান্ত কৌস্তভপ্রভা ব্যাখ্যায় কেশব কাশ্মীরী বলেন—তস্মাদচিন্ত্যানন্তা-ঘট ঘটনা পটীয়ঃ শক্তিমত্তয়া নিঃশেষ দোষ গন্ধাঘ্রাত মাহাত্ম্যং সার্বজ্ঞাদ্যনন্ত সদ্‌গুণাশ্রয়ং পরং ব্রহ্মৈব জগৎ কারণং ন প্রধানমিতি।

অতএব অচিন্ত্য অনন্ত অঘটন ঘটন সমর্থ শক্তিমান বলিয়া সর্ব্বপ্রকার দোষগন্ধ বিবর্জিত মহামহিম সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি অনন্ত সদ্‌গুণের পরমাশ্রয় পরমব্রহ্মই জগতের কারণ—প্রধান নয়।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্যে বলেন—যদ্যপ্যর্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ শ্রুতিবিরোধান্নেতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ।

যদিও অর্থবিশেষে তর্কের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে তর্কের অপেক্ষা দেখা যায় না। ব্রহ্ম অচিন্ত্য বস্তু সুতরাং তর্কের অগোচর—অচিন্ত্য। ব্রহ্মে তর্ক স্বীকার করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় এবং তোমার উক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

কঠ শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ—নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। প্রিয় নচিকেত, তোমার এই পরতত্ত্ব গ্রহণ সমর্থা

বুদ্ধিকে শুষ্ক তর্ক দ্বারা অপমার্গে লইয়া যাইও না। বেদজ্ঞ গুরুর উপদেশে তোমার বুদ্ধি সুফল প্রসব করিবে।

সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—

অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্মর্য্যাদ দোষ সন্ততি দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদং স্বীকুর্ব্বন্তি।

তত্র বাদর পৌরাণিক শৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ।
মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকোবা।
গৌতম কণাদ জৈমিনি কপিল পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব।
শ্রীরামানুজ মধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ।
স্বমতে ত্বচিন্ত্যাভেদাভেদাবেব অচিন্ত্য শক্তিময়ত্বাদিতি।

অপরে বলেন—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া ভেদ সাধনেও যেমন অনেক দোষের উল্লেখ করা যায় সেইরূপ অভেদ সাধনেও বহু দোষের উদ্ভাবন করা যায়। এই ভেদ-বাদই বল আর অভেদ-বাদই বল কোনোটাই নির্দ্দোষরূপে সাধন করা দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ সাধন করিতে যাইয়া তাহারা এ বিষয়ে চিন্তার অসমার্থ্য উপলব্ধি করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের ভেদাভেদ বাদ স্বীকৃত। মায়াবাদী ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র বলেন। গৌতম কণাদ জৈমিনি কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ স্বীকৃত। শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত ও শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পরম অচিন্ত্য শক্তিময় বস্তু বলিয়া আমাদের মতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

—ভূতের কথা

প্রভুকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—আপনি ভূত মানেন কি? তিনি উত্তরে বলিলেন—মানি বই কি? আমি ভূতের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছি। কাণপুরে আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সেটা ছিল একটা ভূতের বাড়ী। আমি তাহা জানিতাম না। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তদেহে আসিয়া শয়ন করিয়াছি। মশারী টাঙ্গাইয়া শুইয়াছি। আলোটি বুজাইয়াছি এমন সময় কে জানি মশারীর দড়িটি খুলিয়া দিল। আমি উঠিলাম আলো জ্বালিলাম আবার মশারী টাঙ্গাইলাম। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তখন আমার উহা ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বিবেচনা হইল। সাহসে ভর করিয়া শয্যার উপর বসিলাম। আমি মিনতির স্বরে চেঁচাইয়া বলিলাম ভাইরে তুমি যে হও সে হও আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করিব না। আমি বড় ক্লান্ত। এই রাত্রিটী আমাকে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে দাও। তাহার পর যাহা হয় দেখা যাইবে। মিনতির ফল ফলিল। সে রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ ভোগ করিলাম। পরদিন প্রতিবেশীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা বলিল ঐটি ভূতের বাড়ী। আপনি কেমন করিয়া একাকী উহাতে ছিলেন। এইরূপ আরো একবার আমার সিমলার বাড়ীতেই রাত্রি বেলা আমি ও আমার স্ত্রী গ্রীষ্মকালে ছাদের উপর শুইয়া আছি। নিদ্রার আবেশ হইয়াছে। হঠাৎ দুম্ দাম শব্দ শুনিয়া চোখ মেলিলাম। দেখি আমাদের চারিদিকে দীর্ঘাকৃতি কয়েকজন অদ্ভুত দর্শন লোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে—আমি উঠিয়া বসিলাম তাহারা আর গোলমাল করিল না একে একে চলিয়া গেল। ভূতের সঙ্গে আমার বহুবার ব্যবহার হইয়াছে। আমি ভৌতিক রাজ্য বিশ্বাস করি।

—প্রাণগোপাল প্রভু

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বুতনী গ্রামে প্রাণগোপাল প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা অলকামোহন গোস্বামী, মাতা সারদা গোস্বামিনী। শৈশবেই পিতৃহীন হওয়ার ফলে প্রথম জীবনে ইঁহাকে নানারূপ অভাবের মধ্য দিয়া দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। পৈতৃক শিষ্য যাহারা ছিলেন তাহাদের সহায়তায় কোনরূপে তিনি শোকসন্তপ্তা মাতার সঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাহার সৌজন্য গুণে ভক্ত-হৃদয় আকৃষ্ট হইল। প্রভু নিত্যানন্দের বংশধর প্রাণগোপালে প্রেমভক্তির উন্মেষ হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনায় তাঁহার গুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হইতেছিল। কলিকাতা কাশীনাথ মল্লিকের ভাগবত বিদ্যালয়ে তিনি গোকুলচাঁদ প্রভুর সমীপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের সমীপে ভাগবতের রহস্য বিদ্যা লাভ করিতেছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেন এবং ভাগবত-ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের বৈষ্ণব সম্মিলনী আরও একটি মহারত্ন লাভ করিল। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, কুমিল্লা, ঢাকা সর্বত্র শ্রীসম্মিলনীর প্রচারে তাঁহার মহিমা ছড়াইয়া পড়িল। প্রাণগোপাল প্রভু ভাগবত ব্যাখ্যায় এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগবত প্রচারকদের প্রায়শঃ কথক বলিয়াই অভিহিত করা হইত। সেই প্রাচীন কথকেরা দিনের পর দিন ভাগবতীয় প্রসঙ্গ লইয়া কথকতা করিতেন। এই কথকতার রীতি ব্যাখ্যারীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। কথকেরা গান গাহিতেন, অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেন, অযথা প্রায়শঃ রসিকতার অবতারণা করিতেন, পুরাণ

কথা অবলম্বন করিয়া বিচিত্র উপন্যাস সৃষ্টি করিতেন, শুধু তাহাই নয় এক পুরাণ কথায় বহু পুরাণের কথা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া কখনও বা ভাষার ছটায় যমক অনুপ্রাসাদির গৌরবে কখনও গুরু গৌরব কণ্ঠের গাম্ভীর্যে পুরাণ কথাকে একটি অভিনয়ের পর্যায়ে নিয়া ফেলিতেন। গীতি নাট্যের মত এই কথকতা আগাগোড়া একটি ধারাবাহিক সঙ্গীতের মতই মনে হইত। কথকগণের কথকতায় নানা রাগরাগিনীর আলাপ হইত—কখনও সুরে কথা—কখনও প্রাণ গলানো কীর্ত্তন আবার কখনও বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত শ্রোতৃবৃন্দের মহলে। প্রাণগোপাল প্রভু পাঠ আরম্ভ করিলেন পূর্বাচার্যগণের ব্যাখ্যা টীকার মাধুর্য পরিবেশন রীতিকে অবলম্বন করিয়া। শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যায় যে সিদ্ধান্ত সম্পুটিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ যে রস-বিন্যাস পরিপাটী দেখাইয়াছেন, সেই সকল বিষয় হইল প্রাণগোপালের পাঠের মূল উপাদান। এই অভিনব রীতি প্রদর্শনে শ্রোতার চমক লাগিল ভাবুকের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ভক্তের প্রাণ গলিয়া গেল আর সর্বসাধারণের মনে ভাগবতের মহিমা প্রসার লাভ করিল অতি দ্রুতগতিতে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই ছুটিল প্রাণগোপাল প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে—শুধু শুনিতে নয়, তাহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করিতে। তাঁহার ভজন নিষ্ঠা, সদাচার, কীর্ত্তন-প্রীতি এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা মুগ্ধ করিল বাঙ্গালীকে। দলে দলে লোক তাহার অনুগামী হইল। ঢাকা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কলিকাতায় তাঁহার কথামৃত ধারায় সহস্র সহস্র আত্মার ভক্তি-অভিষেক হইল। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের স্নেহ বাৎসল্যে পরিপুষ্ট অভিরক্ষিত প্রাণগোপাল প্রতিবাদী ও প্রতিপক্ষের সর্বপ্রকার বিরোধিতা এবং প্রতিকূলাচরণকে উপেক্ষা করিয়া গৌরবের উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভু প্রাণগোপাল তাঁহার কৃষ্ণসন্দর্ভের উৎসর্গ পত্রে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অল্পাক্ষরে

যে কথা বলিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অন্তরের ভাব অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইনি মাতৃদেবীর সমীপেই দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন তাঁহার প্রবর্ত্তিত মাতৃনির্যাণ বা গুরুনির্যাণ মহোৎসব শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রতি বর্ষে শ্রীরাসযাত্রার সময় অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপ বৃন্দাবন এবং বাঙ্গলার সর্বত্র তিনি নৈষ্টিক ভজন সম্পন্ন একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদিত ব্রজরস পরিবেশন দক্ষতায় তাহার তুলনা আর কাহারও সঙ্গে দেওয়া অসম্ভব। বিগত ১৩৪৮ সনে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র নিষ্ণাত শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম প্রচারক—শ্রেষ্ঠ প্রাণগোপাল শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

—প্রভুপাদ ও রাধাবিনোদ প্রভু

প্রভুপাদ চিরকাল গুণীর আদর করিতেন। তাহার সহৃদয়তায় সহায়তায় এবং অযাচিত অনুগ্রহে কত পণ্ডিতের—অধ্যাপকের এবং ধর্ম্ম প্রচারকের যে সর্বপ্রকার সুযোগ সুখ্যাতি লাভের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। পাবনা নিবাসী পূজ্যপাদ মুরলী মোহন গোস্বামী এবং ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সমীপে বিদ্যাভ্যাস করিয়া প্রভুপাদ রাধাবিনোদ যখন বৈষ্ণব ধর্মালোচনা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার গুণমুগ্ধ প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বান্ধব। কলিকাতা আসিয়া প্রথমতঃ তিনি প্রভুপাদের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন এবং নানাস্থানে সভা সমিতি ও হরিসভায় পাঠ ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। প্রভুপাদের নির্দ্দেশ ক্রমেই তিনি ঢাকা হরিসভায় বক্তৃতা করিতে যাইয়া তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মীতার শক্তিতে ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চমকিত করিয়া দেন। আমাদের মনে আছে, তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর

আবির্ভাবের দিন এক সভায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করায় বলিয়াছিলেন—আমিতো কখনো বেদীতে বসিয়া পাঠ ব্যাখ্যা করিতে অভ্যস্ত নই। ভক্তবৃন্দের আকুল আগ্রহে যখন তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন তখন কিন্তু তাঁহার বাণীতে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়ে ডুবিয়া রহিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে বাংলা দেশে যে ভাবের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা সমুচিত এখনো তাহা হয় নাই মনে ভাবিয়া দুঃখ হয়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী গৌরাঙ্গ মিলন-মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখিতে পাই—১২৮৯ সালে ৭ই শ্রাবণ বুধবার শুভ শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীধাম শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুবংশে তাঁহার আবির্ভাব হয়। পিতা রামগোবিন্দ, মাতা কুমুদিনী দেবী। নবদ্বীপ চৈতন্য চতুষ্পাঠীতে ব্রজরাজ গোস্বামীর সমীপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তিনি পাবনা দর্শন চতুষ্পাঠীতে মহামহোপাধ্যায় ফণীভুষণ তর্কবাগীশের সমীপে কাব্য ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ করেন এবং উপাধি লাভ করেন। তিনি কখনও উপাধি ব্যবহার করেন নাই। তাড়াশের রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাবিনোদের মন্দিরে বাসস্থান, বহুমূল্য গ্রন্থাদি ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা ইঁহার শাস্ত্রালোচনার সহায়তা করেন। পাবনা ও নবদ্বীপ চতুষ্পাঠীতে তিনি কিছুদিন অধ্যাপকতা করিয়া ১৯১৮ খৃঃ হইতে পাঠ ব্যাখ্যা করেন। এই সময় হইতেই তাহার যোগ্যতার পরিচয় সমগ্র দেশবাসী পাইতে আরম্ভ করে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশমত অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে ও ঠাকুর বাড়ীতে পাঠ করিয়া তিনি জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। তাঁহার গুরু গম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তি, সরল সরস বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, অফুরন্ত দৃষ্টান্ত কুশলতা, রসিকতা ও দার্শনিকতার পরিচয় যাহারা একবার পাইয়াছেন, তাঁহারা চিরদিনের জন্য তাঁহার কথা শ্রবণের নিমিত্ত

উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। বাংলা দেশে ভিন্ন ভিন্ন হরিসভায় এবং বাংলার বাহিরেও তাঁহার গুণের কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কখন কখন বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে, নববিধান মন্দিরে, বিবেকানন্দ সোসাইটী হলেও বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা অতুলনীয় ছিল। একদিকে প্রভুপাদ প্রাণগোপালের রসশাস্ত্র ব্যাখ্যা বৈচিত্রী আর একদিকে দার্শনিকতা পরিপূর্ণ প্রভুপাদ রাধাবিনোদের বক্তৃতার মাধুর্য্য বৈষ্ণব সমাজকে কিছুদিনের জন্য এক অপূর্ব আনন্দ রাজ্যের সন্ধান দিয়াছিল প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের মাধ্যমে। যাঁহারা কোনো সভায় প্রাণগোপাল রাধাবিনোদ অতুলকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ দর্শন করিয়াছেন—কথা রসাস্বাদন করিয়াছেন—পাদস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, আমার মনে হয় একালেও তাহারা ধন্য হইয়াছেন।

আমাদের মনে পড়ে ঢাকায় একটি বিচার সভায় প্রতি পক্ষকে রাধাবিনোদ প্রভু এমন একটি ভঙ্গী করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, উত্তর দিতে যাইয়া যে দিকেই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন, রাধাবিনোদের মতেই মত দিতে হয়। ইহা দেখিয়া সভায় এক হট্ট গোলের সৃষ্টি হয়। তখন রাধাবিনোদ সেই প্রশ্নের অতি সহজ সরল ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমাধান করেন, অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল ইহার পরিচয় সেদিনই আমরা পাইয়াছিলাম। আমি তখন এম্, এ, পড়ি আর রাধাবিনোদ প্রভুর নিকট শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভ পাঠ গ্রহণ করি। তিনি একটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্দর্ভের সূক্ষ্ম দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি এরূপ সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, তখন মনে হইত এগুলি তাঁহার মর্মে মর্মে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ধন্য তাঁহার প্রতিভা। ২৬শে আশ্বিন ১৩৪৮ সাল সোমবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীরাসলীলা দর্শন করিতেছি এই ভাবনায় গৌরহরি বোল বলিতে বলিতে প্রভু রাধাবিনোদ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহাদেরই সমীপে ইঁহার বিদ্যাচর্চ্চা। ইনি গৌর শিরোমণি এবং নিত্যানন্দ দাসের অনুগ্রহে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করিলেন। গোবর্দ্ধনে তখন সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বর্ত্তমান। ইঁহারই স্মরণগ্রন্থ সিদ্ধ গুটিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ দাস এই গুটিকানুসারে ভজন করিতেন বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনি কিছুদিন গোবর্দ্ধনে থাকিয়া কৃষ্ণদাস মহারাজের সেবা করিয়াছেন। নন্দগ্রামে উদ্ধব কেয়ারীতে সতেরো বৎসর নির্জনে মন্ত্রজপ ও সাধনার ফল স্বরূপ বাবাজী মহারাজ শ্রীরাধাগোবিন্দের পূর্ণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের গোঁফায় ইঁনি ছয় বৎসর নির্জনে সাধনা করেন। ইহার পর কুসুম সরোবর, চন্দ্র সরোবর, গোয়াল পুকুর, নারদকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, গাঁঠুলী ও অন্যান্য লীলাস্থলীতে গমনাগমন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা মাধুরী আস্বাদন রসে তিনি ডুবিয়াছিলেন। ছত্রপুরের মহারাজ, তারাশের রাজর্ষি বনমালী, মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী আরো কত ভক্তের সমাগম হইত। এখনো যাঁহারা ব্রজে বাস করিয়া ভজনানন্দে আছেন তাঁহাদের অনেকেই এই মহাপুরুষের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য বলিয়া মনে করেন।

—সভাসমিতি

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ অর্দ্ধ শতাব্দিরও অধিককাল ধর্ম্ম প্রচারকের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পরম্পরা সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এই সকল সভা বা সমিতির সম্যক বিবরণ দেওয়া একান্তই অসম্ভব, তবে তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ পূর্বক যেটুকু বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারিব। কলিকাতা, হাওড়া, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর একমাত্র প্রাণকেন্দ্র, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন প্রভুপাদ স্বয়ং। তাঁহারই নির্দ্দেশ এবং ইচ্ছানুসারে কৃষ্ণনগর নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সাবজজ) এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গে নানা স্থানে গমন

করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর শাখা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত বিভাগ ফলে পূর্ব্ববঙ্গের সেই সকল কেন্দ্র অধুনা লুপ্তপ্রায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৫০ সালের ৬ই আশ্বিনের পত্রানুসারে দেখা যায় প্রভুপাদ বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই এই সর্বজন বিদিত পরিষদের সহায়ক সদস্যরূপে নির্বাচিত ও পুনর্নিবাচিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিরোধ নিরসনী সভা বালিঘাই বাজার সন ১৩১৮ সাল ১৩ই শ্রাবণ বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, এই সভায় বৈষ্ণব ধর্ম বক্তা শ্রেষ্ঠরূপে জগদ্‌গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবতংশ পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দেব গোস্বামী প্রভু ভাগবতাচার্য্য এই নামটি শিরোদেশে রহিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় সেই কালে প্রভুর কি প্রকার মহিমা প্রচারিত! এই সঙ্গে আরও যে দুইজনের নাম আছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য একজন শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সেবাপ্রাপ্ত পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম শ্রীধাম বৃন্দাবন অপর পরম ভাগবত সুপণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বিমলা-প্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর। এই সভায় অসুস্থতা নিবন্ধন প্রভুপাদ উপস্থিত হইতে পারেন না, কিন্তু সুজানগর সভায় উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। সন ১৩১৭ সাল ৮ই চৈত্র নবদ্বীপ হইতে লেখা এক পত্রের বিবরণ দেখুন। পত্র লেখক গৌরচন্দ্র গোস্বামী।

"গতকল্য আপনার আশীর্ব্বাদে প্রায় ৭০০ শত লোক সুচারুরূপে খাওয়ান কার্য হইয়া গিয়াছে আর গত কল্য রাত্রে ১৯ দল কীর্ত্তন বাহির হইয়া রাত্র ১২টা পর্যন্ত ভয়ানক লোক ছাদে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল এবং সকলেই বলিতেছে এরূপ নবদ্বীপে কখনও হয় নাই। আপনার শুভাগমনের ফলে এতদূর হইয়াছে। কীর্ত্তন ৺শ্রীশ্রীশ্রীবাস অঙ্গন ঠাকুর বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল।"

কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ড ও ঢাকা সারস্বত সমাজের সঙ্গে প্রভুপাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি প্রতিবর্ষে নিয়মিতভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষক নিযুক্ত থাকিতেন। সংস্কৃত কলেজের সতীশ বিদ্যাভূষণ এবং সারস্বতের প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ ইঁহাকে গুরুদেবের ন্যায় সম্মান করিতেন। মানকর হইতে লিখিত ২৪।১।১৩ ইং তারিখের পত্রে ডাক্তার কৃষ্ণহরি গোস্বামী এল, এম, এস একটি ধর্মসভার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "যখন আপনার ন্যায় চিহ্নিত ভক্তের কৃপা পাইলাম তখন আর আমার উদ্ধারের কোনো চিন্তা নাই।" মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বাটীতে ২২শে পৌষ ১৩১৮ সালে যে শ্রীআচার্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে প্রভুপাদ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় সত্যানন্দ গোস্বামী, বৃন্দাবনের মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম প্রভৃতি বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

কুঞ্জঘাটা হইতে কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধ ভক্ত কর্মচারী বামাচরণ বসু মহাশয় একখানা পত্রে লিখিতেছেন—নিতাইএর করুণার কথা ভাষায় আর কি বলিব? যিনি না চাহিতে প্রেম দেন, যিনি জীবের ঘরে ঘরে অমূল্য প্রেমধন বিনামূল্যে বিলাইয়াছেন, তাঁহার কৃপা এ অধম কি বুঝিবে? আর কি বলিবে? তবে কৃতার্থোস্মি কৃতার্থোস্মি। মানসে যাঁহাকে এতদিন আরাধনা করিয়া আসিয়াছিলাম সেই পরমদেবতা নিজগুণে কৃপা করিয়া উদয় হইয়া কৃতার্থ করিলেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই অযোগ্য অধমকে যখন অযাচিত কৃপা করিয়াছেন তখন অনুক্ষণ শ্রীচরণে বাঁধিয়া রাখিতে আজ্ঞা হয়। মহাপ্রভুর কৃপায় এখানকার ক্ষেত্রটি বেশ সুন্দররূপে কর্ষিত হইয়াছে এবার সহস্রাধিক বৈষ্ণবের পদরজঃ ইহাকে আরও ধন্য করিয়াছেন এক্ষণে বীজ বপনের উপযুক্ত হইয়াছে। এখন প্রভুদের কাজ প্রভুরা করুন ইহাই কাতর প্রার্থনা। যেরূপ আনন্দের বন্যা বহাইয়াছেন তাহা খেতুরাদি মহামহোৎসবের পরে আর সংঘটিত হইয়াছিল কিনা জানি না। মহারাজের

(মণীন্দ্র নন্দী) বিশেষ শ্রদ্ধা প্রভুপাদের উপর আছে এমতাবস্থায় প্রভুকেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গুছাইয়া লইতে হইবে। (১০ই চৈত্র ১৩১৭ সাল) এই পত্রে যে উৎসবের কথা সূচিত হইয়াছে বৈষ্ণব সম্মিলনী সংঘটনার এখানেই মূল সূত্র। বৈষ্ণব সম্মিলনীর মধ্য দিয়া মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী যে প্রভুপাদের সঙ্গসুখটিকেই বিশেষ করিয়া পাইতে অভিলাষী ছিলেন তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই কাশীমবাজার রাজবাড়ী হইতে নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের ১৩১৮ সালে ৫ই চৈত্র তারিখের পত্র হইতে। উহাতে আছে মহারাজ বাহাদুর বলিলেন, তাঁহাদের জন্য আমার বৈষ্ণব সম্মিলনী। তাঁহারা (প্রভু অতুলকৃষ্ণ) না আসিলে আমি মহাদুঃখিত হইব। এসব কথা পূর্বে জানিলে, আমার সম্মিলনী বা উৎসব হইতে নিরস্ত হইতে হইত। তিনি ভালই থাকুন আর যেরূপই থাকুন আমার বাড়ীতে তাঁহার পায়ের ধূলা না দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাকিবে না? চুঁচুড়া নিত্যানন্দ নিকেতন বার্ষিক অধিবেশন ১৩১৮ সাল ৫ই চৈত্র প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ প্রধানবক্তা, শ্রীরামদাস বাবাজি মহারাজ প্রধান কীর্ত্তনীয়া।

Dr. U. N. Mukherji প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত The Bengal Hindu Educational Conference & Commission এর কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে প্রভুপাদ ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে সহ সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের ১৩১৮ সাল ২৩শে ফাল্গুনের পত্রে তিনি লিখিয়াছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি এবং প্রাচীন কবি ৺মনমোহন বসু মহাশয়ের এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার সাহিত্যসেবী অভিনেতা ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ এবং স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। এক্ষণে

আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে ঐ দিনকার সভায় আপনাকে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। যদিও সময় অল্প কিন্তু আপনার ন্যায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, উপযুক্ত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আর কেহ নাই। আপনি ভার গ্রহণ না করিলে আর কাহার কাছেই বা যাইব?...

প্রভুপাদ খিদিরপুর হরিসভায় প্রায় পাঠব্যাখ্যা করিতে যাইতেন। সেই অঞ্চলে উপদেশের ফলে অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন। একখানা পত্র এইরূপ—পূজনীয় গোস্বামী মহাশয়! গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খিদিরপুরে সভায় জন্মাষ্টমীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া উপস্থিত সভ্যগণের তদ্বিষয়ে অস্ফুট জ্ঞান কতকটা পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক দিবস পরে পুনরায় একটি সভ্যের অনুরোধে জন্মমৃত্যু সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত পাঠের সময়েও প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিষয় শিক্ষা দেন।...১৩১৮ সাল ৫ই আশ্বিন। বিনীত সেবক শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দাস বসু ২২নং ষষ্টীতলা রোড্।

ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের রাউৎ রায় সাহেব লিখিয়াছিলেন—
সবিনয় প্রণতি নিবেদন,

আপনার স্নেহপ্রদত্ত ভক্তের জয় দ্বিতীয় উল্লাস পুস্তকখানি কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইল। পুস্তকখানি যেখানে পাঠ করা যায় সেইখানেই নামের সার্থকতা প্রকাশ পায়, এরূপ স্থান অতি বিরল যাহা পাঠ করিলে পরমেশ প্রেমে হৃদয় বিগলিত না হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ১১ই সেপ্টেম্বর।

প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসভা যাহা কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রভুপাদের কোনো না কোন সম্বন্ধ ছিল এবং এখনও আছে।

প্রভুপাদ রামকৃষ্ণ মিশনের আহ্বানে বহুবার বেলুড় মঠে, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম পিপাসুগণের তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন।

তাঁহার বক্তৃতায় কখনও সঙ্কীর্ণমত প্রকাশ হয় নাই। সর্ব্বত্র উদার প্রেমধর্মের মহাবাণী শ্রবণে বা।লকবৃদ্ধ সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বাড়ীতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আশুতোষ চৌধুরী উভয়েই পাঠ ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

৺পুরীধামে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু সরকার কর্ত্তৃক বানর ধরার প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং আন্দোলন করিবার জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন উহাতে তিনি 'প্রভুপাদকে নমো নিত্যানন্দ চরণকমলেভ্যোঃ' বলিয়া লিখিয়াছিলেন। বাঘনাপাড়ার নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—তুমি বলদেবের বংশ সম্ভূত অতএব নমস্য তবে বয়সে ছোট বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি ইত্যাদি। যাহারা আধুনিকের ধুয়া ধরিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ্যগণের প্রতি কটাক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হন তাহারা এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় এক পত্রে প্রভুপাদকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—

'শ্রীশ্রীমৎ প্রভু নিত্যানন্দ বংশোজ্জ্বল পণ্ডিতরত্ন'। ইঁহারা বংশমর্য্যাদা ও সদ্‌গুণে প্রভুর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার প্রসঙ্গ বলিতে গেলেই প্রথমত মনে পড়ে মহাত্মা শিশির কুমারের অগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা। ইঁহারই আন্তরিক প্রেরণা ও আদর্শ লাভ করিয়া শিশির কুমারের পারমার্থিক জীবনারম্ভ। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও সেকালে যে একটা দৃঢ়তার ভাব গ্রহণ করিয়া ধর্মপ্রচারে এবং অনাচার ধ্বংস করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন সে কথা আমরা ভুলিতে পারি না। কেদারনাথ ও শিশিরকুমার মাত্র এক বৎসরের ছোট বড় ছিলেন। কেদারনাথের জন্ম ১২৪৫ সালে আর শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন ১২৪৬ সালে। ইঁহারা প্রথমতঃ স্বতন্ত্রভাবেই

ধর্মানুশীলন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হন। উভয়েই ব্যবহারিক জীবনে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আবার অধ্যাত্ম জগতেও তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভায় সেকালে যে সকল সাধু সমাগম হইত তাঁহাদের মধ্যে যে সদালোচনা ও প্রসঙ্গ হইত সে সকল কথা এখন ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। সজ্জন তোষণী (১২৮৮ সাল) বিষ্ণুপ্রিয়া (১২৯৮ সাল) প্রভৃতি পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য, সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা প্রকাশিত হইত। রসময় মিত্র, ডাক্তার পি এন্ নন্দী প্রভৃতি চৈতন্য তত্ত্ব প্রচারিণী সভার স্থাপন করেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ এই সকল সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ও বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ একটি বিশিষ্ট সঙ্ঘের মুখপাত্র ছিলেন অপরদিকে কেদারনাথ, বিমলাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি আর একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন অতি যত্ন সহকারে। ডাক্তার পি নন্দী প্রভৃতিও বসিয়া ছিলেন না। প্রভুপাদ কিন্তু এই সকল সভা সমিতির মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ করিয়াই আবার মহারাজ মণীন্দ্রনন্দীর সহায়তায় আরো সকল পণ্ডিত ও আচার্য সন্তানগণের সহযোগিতায় সর্বজন সমাদরণীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী গঠন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আদর্শ ছিল—যাহারা বৈষ্ণব তাহাদের রসাস্বাদন দান করা, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাদিগকেও ভগবদ্উন্মুখ করিয়া সম্মিলন ক্ষেত্রে এক পরম উদার প্রেমধর্মের সূত্রে মিলিত করা। এইজন্য সর্বত্রই তিনি সম্মিলনীর মন্দিরকে মিলন-মন্দির আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই সার্বজনীন উদার ভাবে মুগ্ধ হইয়া সর্বসম্প্রদায়ের সাধু ও পণ্ডিতগণ শ্রীশ্রীসম্মিলনীর মিলন-মন্দিরে সমবেত হইতেন।

—৺কাশীধামে

বারাণসী শ্রীশ্রীহরিনাম প্রদায়িনী সভার ইতিবৃত্ত ও কার্য্যবিবরণ পুস্তকে দেখা যায় ১২৩০ সালে প্রভুপাদকে কাশীধামের পণ্ডিতগণ সর্ব্বজনবিদিত

ধর্ম্মবক্তার সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিরাট সভায় অভিনন্দনপত্র দান করেন। কাশীধামে প্রভুপাদ মাঝে মাঝে যাইয়া অবস্থান করিতেন। সেখানে অবস্থান কালে শ্রীফণীভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রতি তিনি যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ও প্রভুপাদ

"কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারকল্পে কলিকাতা মহানগরীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্মেলন স্থান বা প্রচার কেন্দ্র সংস্থাপনের কল্পনা আমাদের পূজনীয় সভাপতি নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের মানসে উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ প্রভুপাদের আহ্বানে ও আমন্ত্রণে তাঁহার ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের প্রসাদ পাইবার জন্য হাওড়া পঞ্চাননতলা রোড নিবাসী বিখ্যাত উকিল শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল এবং কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ষ্টেট পরিদর্শক শ্রীযুত বামাচরণ বসু, বি-এ, মহাশয় সমাগত হন এবং সেই শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে কলিকাতায় একটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী সংস্থাপন প্রসঙ্গে প্রভুপাদের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরেশ বাবু ও বামাচরণ বাবু বৈষ্ণব ধর্ম্মোৎসাহী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে গমন করিয়া উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা প্রাপ্ত হন। পরদিন প্রভুপাদ স্বয়ং ও বামাচরণ বাবু উক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে বরাহনগর নিবাসী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ ও বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট উক্ত সাধু সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত ও পরামর্শ করেন—সকলেই

প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। অতঃপর কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বৈষ্ণব ধর্ম্মোৎসাহী অন্যান্য মহাত্মগণের সহিত আলোচনা করিলে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হওয়ায় ১৪ই বৈশাখ ১৩১৮ শনিবার ৩০২ নং অপার সারকুলার রোডস্থিত কাশিমবাজার রাজভবনে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রথম শুভাধিবেশন হয়। প্রকাশ থাকে যে এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার নিজ প্রাসাদে ও নানাস্থানে অনিয়মিতভাবে বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন করাইতেছিলেন এবং ঐ সকল সভায় বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রদ্ধেয় শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করিয়া জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতেন। শ্রীসম্মিলনীর সভাধিবেশন নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য সম্পাদক নির্ব্বাচনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।"

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর এবং ভক্তগণের অর্থ সাহায্যে সম্মিলনীর মিলন মন্দিরের জন্য চাল্‌তাবাগানে জমি সংগ্রহ হইল। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হরিদাস নন্দী, পুলিনবিহারী দে, কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, নিতাইচরণ লাহা, মণিমোহন মল্লিক, বামাচরণ বসু, এবং অন্যান্য বহু ভক্তের অক্লান্ত চেষ্টায় শ্রীসম্মিলনীর গৃহ-নির্ম্মাণ হইল। মন্দির, পাঠাগার ও গৌর নিত্যানন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। হরিদাস নন্দী মহাশয় প্রভুপাদের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় এই সম্মিলনীর অকপট সেবা করিয়া ১৩৫৫ সালে দেহত্যাগ করিলেন। প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান ধর্মসম্বন্ধে বহু জটিল সমস্যা সমাধান এবং ধর্মসঙ্কট সময়ে উপদেশ দিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের আশার আলোক স্তম্ভরূপে বিরাজমান।

নোয়াখালী প্রভৃতি উপদ্রুত অঞ্চল হইতে সমাগত শত শত নরনারী এই সম্মিলনীর নাটমন্দিরে আশ্রয় লাভ করিয়া ৫।৬ মাস বসবাস এবং প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এদিক দিয়া সমাজ সেবায়ও এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

—হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ও প্রভুপাদ

শিবপুর শ্রীহরি ন-পাড়া হরিসাধন সমাজে প্রভুপাদ পাঠ ব্যাখ্যা করিতে আসিতেন। এই সভা ভক্তপ্রবর অবিনাশ দাস মহাশয়ের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। পাল্কী করিয়া যাইবার সময় একদিন কয়েকটি মাতাল তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়, প্রভুপাদ কোনোমতে মধুর বাক্যে তাহাদের বুঝাইয়া সে যাত্রা—বাড়ী পৌছিলেন। তখন হইতে এখানে একটি ধর্মপ্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিবার কল্পনা হয়। ক্রমে শিবপুর ও কাসুন্দিয়া অঞ্চলে প্রভুপাদের কয়েকটি অনুরক্ত ভক্ত জুটিল। ইঁহাদের তিনি ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্‌যোগী হইতে আদেশ করিলেন। প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে চেষ্টা চলিল—প্রভূত ফলও ফলিল। চক্রবেড় নিবাসি বদান্য দাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীসম্মিলনীর জন্য একখণ্ড জমি দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার ৭৫৪ নং সারকুলার রোডস্থ বাড়ীতে. এক সভায় প্রভুপাদ উপস্থিত হইলেন এবং হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী স্থাপনের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠান হইয়া গেল। প্রভুপাদের ভক্ত শিষ্যগণ নানাস্থানে চেষ্টা করিয়া অর্থ ও গৃহ নির্মাণ দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। সভামণ্ডপ নির্মাণ হইয়া গেল। সন ১৩৩৪ সাল ২৭শে ফাল্গুন রবিবার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই সম্মিলনীর উদ্বোধন করিলেন। চেয়ারম্যান চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ধর্মসভায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ সভাপতি

থাকিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া দেন। ভক্ত প্রবর পরেশচন্দ্র দত্ত (হাওড়ার উকীল) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক) এবং বহু বিশিষ্ট ভক্তের সমাগমে সেদিনকার অনুষ্ঠান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ৩ নং নবীন বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থিত মিলন-মন্দিরে। এই সম্মিলনী গৃহে নিয়মিত উৎসব, পাঠ, কীর্ত্তন ও ধর্ম্ম সমালোচনা হইয়া থাকে।

প্রভুপাদ হাওড়া সম্মিলনীকে কত ভালবাসিতেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ হাওড়ায় অবস্থিত প্রভুপত্নী অম্বুজা বালা দেবীর নামে সম্পত্তি এই সম্মিলনীকে দান করাইয়াছেন।

—প্রথম দর্শন

জন্মাষ্টমীর মিছিল। ঢাকা সহরে এ সময় বহু দেশদেশান্তর হইতে মিছিল দর্শকের সমাগম হইয়াছে। পথে লোকের অত্যন্ত ভিড়। অদ্য ইস্‌লামপুরের মিছিল। আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া জনতা ঠেলিয়া পথে চলিয়াছি। কত বিচিত্র বর্ণের কাপড় জামা পরিয়া সুন্দরীগণ রাস্তার দুই পার্শ্বে ছাদে বারান্দায় এবং জানালার ধারে অবস্থান করিতেছে। পথে যাইতে প্রায়শঃ উপরের দিকে এই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই যুবকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। এই ধরণের বাহার দেখিয়া দুর্লভ আশা করিয়াই তখনকার মত তৃপ্তি। দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। কোনটাই পাওয়া হইতেছে না, অথচ চাওয়া হইতেছে যেন সবটাই। এই বিশ্বগ্রাসী লোলুপতার শেষ নাই। পথে চলিতে চলিতে কি জানি কি একটা অপূর্ব্ব জ্যোতির দীপ্তি যেন চক্ষু দুটিকে টানিয়া ধরিল। চাহিলাম দেখিবার জন্য আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া গেল। এ কি এতো কোন রমণীর মূর্ত্তি নয় এযে প্রদীপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃসম্পন্ন এক দিব্যকান্তি পুরুষ মূর্ত্তি। এ কে? এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি

সঞ্চালিত। প্রত্যেকটি দৃশ্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার মত আগ্রহ লইয়া ইনি দর্শকরূপে রাস্তার ধারে এক ভক্তের দোকানে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঢাকা সহরে কখনো দেখি নাই। নিশ্চয় তিনি এ দেশের লোক নন অপর কোন দেশের হইবেন, শুধু মিছিল দেখার জন্যই তাঁহার ঢাকা সহরে আগমন নয়; বুঝি এই দেশবাসীর অন্তর জগতে দৃষ্টিপাত করিবার জন্যই তাঁহার আগমন।

দোকানের মালিককে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার দোকানে ঐ দিব্যদর্শন ব্যক্তিটি কে?" তিনি বলিলেন "ইঁহাকে জান না ইনি যে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ।" নামটি পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম, এখন দেখিয়া কর্ণ ও চক্ষুর বিবাদ ভঞ্জন হইল। মনে মনে প্রণাম করিলাম। অতি নিকটেই একটী বন্ধুর দোকানের এক পাশে দাঁড়াইয়া মিছিল দেখিলাম। কি দেখিলাম মনে নাই কিন্তু সেদিন যে প্রভুটিকে প্রথম দেখিলাম তিনি চির জীবনের জন্য অন্তরে অঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। খুল্লতাত পূজনীয় ৺বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী ভাগবতরত্ন একদিন সকাল বেলা আসিয়া বলিলেন "তুমি কি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখিয়াছ? বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। অল্পদিন হইল তিনি ঢাকা আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি। তুমি যাইবে কি?" আমি বলিলাম "তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি। তিনি এখানে আসিয়াছেন? চলুন আমিও যাইব।" ভাগবতরত্নের সঙ্গে আমিও চলিলাম। নিকটেই একটি বাড়ীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। আমরা সেই বেষ্টনী ভেদ করিয়া দোতালায় গিয়া দেখিলাম প্রভু বসিয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার খুব নিকটেই বসিলাম। ভাগবতরত্ন আমাদের পরিচয় দিলেন। প্রভুপাদ আমাদের পরিচয় পাইয়া তাঁহার

স্বভাব সুলভ হাসিভরা মুখে আমাদের অত্যন্ত প্রাণ খোলা ভাবে পরম আত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন। বংশ পরিচয় এবং কি ভাবে আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামসুন্দর গোস্বামি প্রভু আহিরীটোলা হইতে ঢাকায় আগমন করিয়া বাস করেন সে সব কথা হইল। আহিরী-টোলায় আমাদের জ্ঞাতিগণ কাহারা এখনও আছেন তাঁহাদের কথা এবং পারিবারিক বহু কথাই তাঁহার কাছে শুনিলাম। সে দিন বুঝিলাম প্রভুপাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিরূপ। আরও জানিলাম আমার যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সময় যাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া আমি স্বেচ্ছায় যাঁহাকে আমার সাবিত্রী দীক্ষার আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম তিনি এই প্রভুপাদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গোকুলচাঁদ প্রভু। সে দিন প্রভু আমাকে কি যেন কি এক অপূর্ব্ব প্রীতি জালে ফেলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিও।" আমিও স্কুলের পড়াশুনা হইতে ফাঁক পাইলেই প্রভুর কাছে যাই। তাঁহাকে দেখি আর মিষ্টি কথা শুনি।

অল্প কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই শুনিলাম তাঁহার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে। কোনো লোকের সঙ্গে দেখা শুনা বন্ধ। ডাক্তারের নির্দ্দেশ। আমার কিন্তু উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। অসুখের অবস্থায় অবশ্যই তাঁহার কাছে যাওয়া চাই। আমরা যে তাঁহার জ্ঞাতি। অবশ্যই যাইব এবং সুযোগ মত যত্ন করিব। উৎসাহ বুকে লইয়া দেখা করিতে গেলাম। পথে বাধা। দ্বাররক্ষক ভক্ত বলিলেন—দেখা হইবে না। ডাক্তারের নিষেধ। আমি হটিবার পাত্র নই। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম আমি কথা কহিব না। শুধু দেখিয়া আসিব। তবুও নিষেধ। যাইতে না পারিয়া ব্যথা বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম কিন্তু প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। দ্বার রক্ষকের প্রতি ক্রোধও হইল।

আমি তাঁহার জ্ঞাতি। আমার চাইতেও ইঁহারা কি তাহার অধিকতর আপনার জন। ঘরে বসিয়া পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইলাম। প্রভুর হাতে পত্রখানা পৌঁছামাত্র তিনি দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া আমাকে বাড়ী হইতে লইয়া যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। প্রভুর সাক্ষাতে গিয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম। বুঝিলাম সত্যই আমাকে তিনি আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

শিষ্যদের আগ্রহে প্রভুপাদ বহুবার ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন। সেবার (১৩২৪ সাল) সরস্বতী পূজা সমাগত। প্রভুপাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঢাকাবাসীর উৎকণ্ঠার সীমা নাই। আমিও প্রতিদিন পাঠ শুনিতে যাই। ঢাকা বার লাইব্রেরীতে "বৈষ্ণবদর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। সভার সকলেই বক্তৃতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। একটু দূরে বসিয়া আমিও বক্তৃতা শুনিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ প্রেমের বর্ণনা হইতেছিল। একটী উদাহরণ দিয়া উহা বুঝানো হইল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রশ্নটি এই—হরিণী হরিণকে বেশী ভালবাসে অথবা হরিণ হরিণীকে বেশী ভালবাসে ইহারই মীমাংসা করিতে হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—এক বনে এক হরিণ দম্পতি বাস করিত। হঠাৎ বনে আগুন লাগিল। অন্যান্য পশুপাখীর সঙ্গে হরিণ দম্পতিও ছুটিয়া বনের বাহিরে চলিল। অগ্নিতাপ-দগ্ধ পথক্লান্ত হরিণ দম্পতি আর পথ চলিতে পারে না। হরিণী গর্ভবতী, পিপাসায় কাতর। সে হরিণকে বলে, নাথ আমি আর চলিতে পারি না, প্রাণ যায় একটু জল। হরিণ তাহাকে বৃক্ষতলায় বসাইয়া শ্রান্ত হইলেও ছুটিয়া চলিল জলের সন্ধানে। অনতিবিলম্বে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্তে জলের সন্ধান পাইয়া হরিণীকে আসিয়া সেই সংবাদ দিল। অতিকষ্টে হরিণী দেহভার বহন করিয়া লইয়া চলিল সেই জলের ধারে। দুজনেই আসিয়া জলের সম্মুখে

দাঁড়াইল। তৃষ্ণাতুরা হরিণী জলপান করিতে যাইতেছে। এমন সময় হরিণের দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কাতর নয়নে হরিণের দিকে চাহিয়া হরিণী বলিল, নাথ, তুমিও পথশ্রান্ত-তাপদগ্ধ। ঐ জলটুকুতে দুজনার পিপাসা মিটিবে না। তুমি উহা খাইয়া বাঁচ। আমার প্রাণ যায় যাউক। হরিণ বলে, তাহা কি হয়? তুমি বাঁচিলে দুটি প্রাণ বাঁচিবে—তুমি ঐ জল খাও। হরিণী উত্তর দেয়, তাহা কি হইতে পারে, তুমি পুরুষ জাতি, তোমার জীবনের মূল্য অধিক। আমি মরিলে ক্ষতি নাই। তুমি ঐ জল খাও। কথায় কথায় দুজনেরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। জল যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল। ইহাদেরই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, হরিণ হরিণীকে ভালবাসে অথবা হরিণী হরিণকে অধিক ভালবাসে।

কোন পণ্ডিত বলিলেন, পশুজাতি হইয়াও হরিণের হরিণীর প্রতি প্রীতি মনুষ্যজাতির প্রীতিকেও হার মানাইয়াছে। আবার কেহ বলিলেন, হরিণী পাতিব্রত্যের চরম আদর্শ দেখাইয়াছে। অতএব তাহার প্রীতি অধিকতর প্রশংসনীয়। অপর পণ্ডিতগণ বলিলেন, ইহাদের মধ্যে প্রীতির তারতম্য করা বৃথা। উভয়েরই উভয়ের নিমিত্ত প্রচুর প্রীতি স্বীকার করিতেই হইবে। প্রশ্নের সমাধানে মহারাজ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে পণ্ডিত, তোমার সিদ্ধান্ত কি? তিনি বলিলেন মহারাজ, আমার মতে হরিণ বা হরিণী কেহই কাহাকেও সত্য করিয়া ভালবাসিত না। উত্তর শুনিয়া সকলেই বিস্মিত। কালিদাস আরও বলিলেন, সত্যপ্রেম অমৃত। উহাতে মৃত্যু হয় না। যদি তাহাদের প্রকৃত ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে একজন জলপান করিলে দুজনেরই তৃপ্তি হইত। প্রিয়জনের তৃপ্তি হইলে যে প্রীতি করে তাহারও তৃপ্তি হয়। সন্তানকে ভোজন করাইয়া মাতার তৃপ্তি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রণয়ীর প্রাণ কাতর হয় না। যদি সে প্রিয়কে

পরিতৃপ্ত করিতে পারে। বৃন্দাবনে গোপীগণ নন্দনন্দন সুখে আছেন ভাবিয়াই সুখী হইতেন। প্রিয় কৃষ্ণের পরিতৃপ্তিতে প্রিয়া গোপীর ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া যাইত। এইজন্যই সাধকগণ অনশনেও ভগবানের পরিতৃপ্তি হয় ভাবিয়া কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করেন না বরং সুখী হইয়া থাকেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে উপবাস দুঃখের নয় সুখের। ভগবানের প্রীতিতেই ভক্তের প্রীতি। ভালবাসার এই জাতীয় উদাহরণ লৌকিক জগতে বিরল হইলেও একেবারে নাই বলা চলে না। ইহাকেই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ বলিয়াছেন।

গল্পটি শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। বাড়ী ফিরিবার মুখে প্রভুপাদ আমাকে লইয়া এক গাড়ীতেই ফিরিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আপনার সঙ্গে আমার একটি সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে। তিনি সহাস্যবদনে একটিবার আমার দিকে তাঁহার স্বভাবসুলভ অন্তরভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, আমার মনে পড়ে যেন সেই দৃষ্টির দ্বারাই তিনি আমাকে তাঁহার করিয়া লইলেন। সরস্বতী পূজার দিনে আমার দীক্ষা হইল।

নবাবপুর বড় গোঁসাই বাড়ীতে প্রতি বৎসর শ্রীনিত্যানন্দ উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবোপলক্ষে আমি আমার গুরুভাইদের সহায়তায় প্রতি বর্ষেই একবার প্রভুপাদকে ঢাকা লইয়া আসি। প্রভুপাদ আমাকে বলিয়াছেন—তোমাদের উৎসবের জন্য আমার বাড়ীর মহোৎসব বন্ধ হইল। ইহা তাঁহার ঢাকাবাসীর প্রতি বিশেষ প্রীতির পরিচয়। সেইবার মাঘোৎসবের সময় প্রভুপাদের ব্যাখ্যা ফরাসগঞ্জ ৺বিহারীলালজীর আখড়ায় হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের যত ভক্ত সমাজে না গিয়া এখানেই আসিতেছেন। তাঁহার প্রেম উদাত্তকণ্ঠে দার্শনিক তত্ত্ব—হরিলীলা কথা অফুরন্ত মাধুর্য্যসৃষ্টি করিয়া সেবারকার মত অপর সকল উৎসবকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

তাঁহাদেরই সমীপে ইঁহার বিদ্যাচর্চ্চা। ইনি গৌর শিরোমণি এবং নিত্যানন্দ দাসের অনুগ্রহে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করিলেন। গোবর্দ্ধনে তখন সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বর্ত্তমান। ইঁহারই স্মরণগ্রন্থ সিদ্ধ গুটিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ দাস এই গুটিকানুসারে ভজন করিতেন বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনি কিছুদিন গোবর্দ্ধনে থাকিয়া কৃষ্ণদাস মহারাজের সেবা করিয়াছেন। নন্দগ্রামে উদ্ধব কেয়ারীতে সতেরো বৎসর নির্জনে মন্ত্রজপ ও সাধনার ফল স্বরূপ বাবাজী মহারাজ শ্রীরাধাগোবিন্দের পূর্ণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের গোঁফায় ইঁনি ছয় বৎসর নির্জনে সাধনা করেন। ইহার পর কুসুম সরোবর, চন্দ্র সরোবর, গোয়াল পুকুর, নারদকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, গাঁঠুলী ও অন্যান্য লীলাস্থলীতে গমনাগমন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা মাধুরী আস্বাদন রসে তিনি ডুবিয়াছিলেন। ছত্রপুরের মহারাজ, তারাশের রাজর্ষি বনমালী, মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী আরো কত ভক্তের সমাগম হইত। এখনো যাঁহারা ব্রজে বাস করিয়া ভজনানন্দে আছেন তাঁহাদের অনেকেই এই মহাপুরুষের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য বলিয়া মনে করেন।

—সভাসমিতি

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ অর্দ্ধ শতাব্দিরও অধিককাল ধর্ম্ম প্রচারকের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পরম্পরা সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এই সকল সভা বা সমিতির সম্যক বিবরণ দেওয়া একান্তই অসম্ভব, তবে তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ পূর্বক যেটুকু বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারিব। কলিকাতা, হাওড়া, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর একমাত্র প্রাণকেন্দ্র, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন প্রভুপাদ স্বয়ং। তাঁহারই নির্দ্দেশ এবং ইচ্ছানুসারে কৃষ্ণনগর নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সাবজজ) এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গে নানা স্থানে গমন

করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর শাখা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত বিভাগ ফলে পূর্ব্ববঙ্গের সেই সকল কেন্দ্র অধুনা লুপ্তপ্রায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৫০ সালের ৬ই আশ্বিনের পত্রানুসারে দেখা যায় প্রভুপাদ বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই এই সর্বজন বিদিত পরিষদের সহায়ক সদস্যরূপে নির্বাচিত ও পুনর্নিবাচিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিরোধ নিরসনী সভা বালিঘাই বাজার সন ১৩১৮ সাল ১৩ই শ্রাবণ বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, এই সভায় বৈষ্ণব ধর্ম বক্তা শ্রেষ্ঠরূপে জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবতংশ পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দেব গোস্বামী প্রভু ভাগবতাচার্য এই নামটি শিরোদেশে রহিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় সেই কালে প্রভুর কি প্রকার মহিমা প্রচারিত! এই সঙ্গে আরও যে দুইজনের নাম আছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য একজন শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সেবাপ্রাপ্ত পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম শ্রীধাম বৃন্দাবন অপর পরম ভাগবত সুপণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বিমলা-প্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর। এই সভায় অসুস্থতা নিবন্ধন প্রভুপাদ উপস্থিত হইতে পারেন না, কিন্তু সুজানগর সভায় উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। সন ১৩১৭ সাল ৮ই চৈত্র নবদ্বীপ হইতে লেখা এক পত্রের বিবরণ দেখুন। পত্র লেখক গৌরচন্দ্র গোস্বামী।

"গতকল্য আপনার আশীর্ব্বাদে প্রায় ৭০০ শত লোক সুচারুরূপে খাওয়ান কার্য হইয়া গিয়াছে আর গত কল্য রাত্রে ১৯ দল কীর্ত্তন বাহির হইয়া রাত্র ১২টা পর্যন্ত ভয়ানক লোক ছাদে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল এবং সকলেই বলিতেছে এরূপ নবদ্বীপে কখনও হয় নাই। আপনার শুভাগমনের ফলে এতদূর হইয়াছে। কীর্ত্তন ৺শ্রীশ্রীশ্রীবাস অঙ্গন ঠাকুর বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল।"

কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ড ও ঢাকা সারস্বত সমাজের সঙ্গে প্রভুপাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি প্রতিবর্ষে নিয়মিতভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষক নিযুক্ত থাকিতেন। সংস্কৃত কলেজের সতীশ বিদ্যাভূষণ এবং সারস্বতের প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ ইঁহাকে গুরুদেবের ন্যায় সম্মান করিতেন। মানকর হইতে লিখিত ২৪।১।১৩ ইং তারিখের পত্রে ডাক্তার কৃষ্ণহরি গোস্বামী এল, এম, এস একটি ধর্মসভার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "যখন আপনার ন্যায় চিহ্নিত ভক্তের কৃপা পাইলাম তখন আর আমার উদ্ধারের কোনো চিন্তা নাই।" মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বাটীতে ২২শে পৌষ ১৩১৮ সালে যে শ্রীআচার্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে প্রভুপাদ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় সত্যানন্দ গোস্বামী, বৃন্দাবনের মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম প্রভৃতি বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

কুঞ্জঘাটা হইতে কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধ ভক্ত কর্মচারী বামাচরণ বসু মহাশয় একখানা পত্রে লিখিতেছেন—নিতাইএর করুণার কথা ভাষায় আর কি বলিব? যিনি না চাহিতে প্রেম দেন, যিনি জীবের ঘরে ঘরে অমূল্য প্রেমধন বিনামূল্যে বিলাইয়াছেন, তাঁহার কৃপা এ অধম কি বুঝিবে? আর কি বলিবে? তবে কৃতার্থোস্মি কৃতার্থোস্মি। মানসে যাঁহাকে এতদিন আরাধনা করিয়া আসিয়াছিলাম সেই পরমদেবতা নিজগুণে কৃপা করিয়া উদয় হইয়া কৃতার্থ করিলেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই অযোগ্য অধমকে যখন অযাচিত কৃপা করিয়াছেন তখন অনুক্ষণ শ্রীচরণে বাঁধিয়া রাখিতে আজ্ঞা হয়। মহাপ্রভুর কৃপায় এখানকার ক্ষেত্রটি বেশ সুন্দররূপে কর্ষিত হইয়াছে এবার সহস্রাধিক বৈষ্ণবের পদরজঃ ইহাকে আরও ধন্য করিয়াছেন এক্ষণে বীজ বপনের উপযুক্ত হইয়াছে। এখন প্রভুদের কাজ প্রভুরা করুন ইহাই কাতর প্রার্থনা। যেরূপ আনন্দের বন্যা বহাইয়াছেন তাহা খেতুরাদি মহামহোৎসবের পরে আর সংঘটিত হইয়াছিল কিনা জানি না। মহারাজের

(মণীন্দ্র নন্দী) বিশেষ শ্রদ্ধা প্রভুপাদের উপর আছে এমতাবস্থায় প্রভুকেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গুছাইয়া লইতে হইবে। (১০ই চৈত্র ১৩১৭ সাল) এই পত্রে যে উৎসবের কথা স্থচিত হইয়াছে বৈষ্ণব সম্মিলনী সংঘটনার এখানেই মূল সূত্র। বৈষ্ণব সম্মিলনীর মধ্য দিয়া মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী যে প্রভুপাদের সঙ্গসুখটিকেই বিশেষ করিয়া পাইতে অভিলাষী ছিলেন তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই কাশীমবাজার রাজবাড়ী হইতে নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের ১৩১৮ সালে ৫ই চৈত্র তারিখের পত্র হইতে। উহাতে আছে মহারাজ বাহাদুর বলিলেন, তাঁহাদের জন্য আমার বৈষ্ণব সম্মিলনী। তাঁহারা (প্রভু অতুলকৃষ্ণ) না আসিলে আমি মহাদুঃখিত হইব। এসব কথা পূর্বে জানিলে, আমার সম্মিলনী বা উৎসব হইতে নিরস্ত হইতে হইত। তিনি ভালই থাকুন আর যেরূপই থাকুন আমার বাড়ীতে তাঁহার পায়ের ধূলা না দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাকিবে না? চুঁচুড়া নিত্যানন্দ নিকেতন বার্ষিক অধিবেশন ১৩১৮ সাল ৫ই চৈত্র প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ প্রধানবক্তা, শ্রীরামদাস বাবাজি মহারাজ প্রধান কীর্ত্তনীয়া।

Dr. U. N. Mukherji প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত The Bengal Hindu Educational Conference & Commission এর কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে প্রভুপাদ ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে সহ সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের ১৩১৮ সাল ২৩শে ফাল্গুনের পত্রে তিনি লিখিয়াছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি এবং প্রাচীন কবি ৺মনমোহন বসু মহাশয়ের এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার সাহিত্যসেবী অভিনেতা ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ এবং স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। এক্ষণে

আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে ঐ দিনকার সভায় আপনাকে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। যদিও সময় অল্প কিন্তু আপনার ন্যায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, উপযুক্ত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আর কেহ নাই। আপনি ভার গ্রহণ না করিলে আর কাহার কাছেই বা যাইব ?…

প্রভুপাদ খিদিরপুর হরিসভায় প্রায় পাঠব্যাখ্যা করিতে যাইতেন। সেই অঞ্চলে উপদেশের ফলে অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন। একখানা পত্র এইরূপ—পূজনীয় গোস্বামী মহাশয় ! গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খিদিরপুরে সভায় জন্মাষ্টমীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া উপস্থিত সভ্যগণের তদ্বিষয়ে অস্ফুট জ্ঞান কতকটা পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক দিবস পরে পুনরায় একটি সভ্যের অনুরোধে জন্মমৃত্যু সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত পাঠের সময়েও প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিষয় শিক্ষা দেন।…১৩১৮ সাল ৫ই আশ্বিন। বিনীত সেবক শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দাস বসু ২২নং ষষ্টীতলা রোড্।

ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের রাউৎ রায় সাহেব লিখিয়াছিলেন—

সবিনয় প্রণতি নিবেদন,

আপনার স্নেহপ্রদত্ত ভক্তের জয় দ্বিতীয় উল্লাস পুস্তকখানি কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইল। পুস্তকখানি যেখানে পাঠ করা যায় সেইখানেই নামের সার্থকতা প্রকাশ পায়, এরূপ স্থান অতি বিরল যাহা পাঠ করিলে পরমেশ প্রেমে হৃদয় বিগলিত না হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ১১ই সেপ্টেম্বর।

প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসভা যাহা কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রভুপাদের কোনো না কোন সম্বন্ধ ছিল এবং এখনও আছে।

প্রভুপাদ রামকৃষ্ণ মিশনের আহ্বানে বহুবার বেলুড় মঠে, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম পিপাসুগণের তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন।

তাঁহার বক্তৃতায় কখনও সঙ্কীর্ণমত প্রকাশ হয় নাই। সর্ব্বত্র উদার প্রেমধর্মের মহাবাণী শ্রবণে বালকবৃদ্ধ সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বাড়ীতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আশুতোষ চৌধুরী উভয়েই পাঠ ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

৺পুরীধামে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু সরকার কর্ত্তৃক বানর ধরার প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং আন্দোলন করিবার জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন উহাতে তিনি 'প্রভুপাদকে নমো নিত্যানন্দ চরণকমলেভ্যোঃ' বলিয়া লিখিয়া-ছিলেন। বাঘনাপাড়ার নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—তুমি বলদেবের বংশ সম্ভূত অতএব নমস্য তবে বয়সে ছোট বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি ইত্যাদি। যাহারা আধুনিকের ধুয়া ধরিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ্যগণের প্রতি কটাক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হন তাহারা এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় এক পত্রে প্রভুপাদকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—

'শ্রীশ্রীমৎ প্রভু নিত্যানন্দ বংশোজ্জ্বল পণ্ডিতরত্ন'। ইঁহারা বংশমর্য্যাদা ও সদ্‌গুণে প্রভুর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার প্রসঙ্গ বলিতে গেলেই প্রথমত মনে পড়ে মহাত্মা শিশির কুমারের অগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা। ইঁহারই আন্তরিক প্রেরণা ও আদর্শ লাভ করিয়া শিশির কুমারের পারমার্থিক জীবনারম্ভ। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও সেকালে যে একটা দৃঢ়তার ভাব গ্রহণ করিয়া ধর্মপ্রচারে এবং অনাচার ধ্বংস করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন সে কথা আমরা ভুলিতে পারি না। কেদারনাথ ও শিশিরকুমার মাত্র এক বৎসরের ছোট বড় ছিলেন। কেদারনাথের জন্ম ১২৪৫ সালে আর শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন ১২৪৬ সালে। ইঁহারা প্রথমতঃ স্বতন্ত্রভাবেই

ধর্মানুশীলন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হন। উভয়েই ব্যবহারিক জীবনে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আবার অধ্যাত্ম জগতেও তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববৈষ্ণব রাঁজসভায় সেকালে যে সকল সাধু সমাগম হইত তাঁহাদের মধ্যে যে সদালোচনা ও প্রসঙ্গ হইত সে সকল কথা এখন ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। সজ্জন তোষণী (১২৮৮ সাল) বিষ্ণুপ্রিয়া (১২৯৮ সাল) প্রভৃতি পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য, সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা প্রকাশিত হইত। রসময় মিত্র, ডাক্তার পি এন্ নন্দী প্রভৃতি চৈতন্য তত্ত্ব প্রচারিণী সভার স্থাপন করেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ এই সকল সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ও বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ একটি বিশিষ্ট সঙ্ঘের মুখপাত্র ছিলেন অপরদিকে কেদারনাথ, বিমলাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি আর একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন অতি যত্ন সহকারে। ডাক্তার পি নন্দী প্রভৃতিও বসিয়া ছিলেন না। প্রভুপাদ কিন্তু এই সকল সভা সমিতির মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ করিয়াই আবার মহারাজ মণীন্দ্রনন্দীর সহায়তায় আরো সকল পণ্ডিত ও আচার্য সন্তানগণের সহযোগিতায় সর্বজন সমাদরণীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী গঠন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আদর্শ ছিল—যাহারা বৈষ্ণব তাহাদের রসাস্বাদন দান করা, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাদিগকেও ভগবদ্উন্মুখ করিয়া সম্মিলন ক্ষেত্রে এক পরম উদার প্রেমধর্মের সূত্রে মিলিত করা। এইজন্য সর্বত্রই তিনি সম্মিলনীর মন্দিরকে মিলন-মন্দির আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই সার্বজনীন উদার ভাবে মুগ্ধ হইয়া সর্বসম্প্রদায়ের সাধু ও পণ্ডিতগণ শ্রীশ্রীসম্মিলনীর মিলন-মন্দিরে সমবেত হইতেন।

—৺কাশীধামে

বারাণসী শ্রীশ্রীহরিনাম প্রদায়িনী সভার ইতিবৃত্ত ও কার্য্যবিবরণ পুস্তকে দেখা যায় ১২৩০ সালে প্রভুপাদকে কাশীধামের পণ্ডিতগণ সর্ব্বজনবিদিত

ধর্ম্মবক্তার সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিরাট সভায় অভিনন্দনপত্র দান করেন। কাশীধামে প্রভুপাদ মাঝে মাঝে যাইয়া অবস্থান করিতেন। সেখানে অবস্থান কালে শ্রীফণীভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রতি তিনি যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ও প্রভুপাদ

"কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারকল্পে কলিকাতা মহানগরীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্মেলন স্থান বা প্রচার কেন্দ্র সংস্থাপনের কল্পনা আমাদের পূজনীয় সভাপতি নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের মানসে উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ প্রভুপাদের আহ্বানে ও আমন্ত্রণে তাঁহার ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের প্রসাদ পাইবার জন্য হাওড়া পঞ্চাননতলা রোড নিবাসী বিখ্যাত উকিল শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল এবং কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ষ্টেট পরিদর্শক শ্রীযুত বামাচরণ বসু, বি-এ, মহাশয় সমাগত হন এবং সেই শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে কলিকাতায় একটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী সংস্থাপন প্রসঙ্গে প্রভুপাদের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরেশ বাবু ও বামাচরণ বাবু বৈষ্ণব ধর্ম্মোৎসাহী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে গমন করিয়া উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা প্রাপ্ত হন। পরদিন প্রভুপাদ স্বয়ং ও বামাচরণ বাবু উক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে বরাহনগর নিবাসী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ ও বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট উক্ত সাধু সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত ও পরামর্শ করেন—সকলেই

প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। অতঃপর কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বৈষ্ণব ধর্ম্মোৎসাহী অন্যান্য মহাত্মগণের সহিত আলোচনা করিলে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হওয়ায় ১৪ই বৈশাখ ১৩১৮ শনিবার ৩০২ নং অপার সারকুলার রোডস্থিত কাশিমবাজার রাজভবনে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রথম শুভাধিবেশন হয়। প্রকাশ থাকে যে এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার নিজ প্রাসাদে ও নানাস্থানে অনিয়মিতভাবে বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন করাইতেছিলেন এবং ঐ সকল সভায় বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রদ্ধেয় শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করিয়া জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতেন। শ্রীসম্মিলনীর সভাধিবেশন নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য সম্পাদক নির্ব্বাচনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।"

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর এবং ভক্তগণের অর্থ সাহায্যে সম্মিলনীর মিলন মন্দিরের জন্য চালতাবাগানে জমি সংগ্রহ হইল। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হরিদাস নন্দী, পুলিনবিহারী দে, কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, নিতাইচরণ লাহা, মণিমোহন মল্লিক, বামাচরণ বসু, এবং অন্যান্য বহু ভক্তের অক্লান্ত চেষ্টায় শ্রীসম্মিলনীর গৃহ-নির্ম্মাণ হইল। মন্দির, পাঠাগার ও গৌর নিত্যানন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। হরিদাস নন্দী মহাশয় প্রভুপাদের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় এই সম্মিলনীর অকপট সেবা করিয়া ১৩৫৫ সালে দেহত্যাগ করিলেন। প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান ধর্মসম্বন্ধে বহু জটিল সমস্যা সমাধান এবং ধর্মসঙ্কট সময়ে উপদেশ দিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের আশার আলোক স্তম্ভরূপে বিরাজমান।

নোয়াখালী প্রভৃতি উপদ্রুত অঞ্চল হইতে সমাগত শত শত নরনারী এই সম্মিলনীর নাটমন্দিরে আশ্রয় লাভ করিয়া ৫।৬ মাস বসবাস এবং প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এদিক দিয়া সমাজ সেবায়ও এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

—হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ও প্রভুপাদ

শিবপুর শ্রীহরি ন-পাড়া হরিসাধন সমাজে প্রভুপাদ পাঠ ব্যাখ্যা করিতে আসিতেন। এই সভা ভক্তপ্রবর অবিনাশ দাস মহাশয়ের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। পাল্কী করিয়া যাইবার সময় একদিন কয়েকটি মাতাল তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়, প্রভুপাদ কোনোমতে মধুর বাক্যে তাহাদের বুঝাইয়া সে যাত্রা—বাড়ী পৌছিলেন। তখন হইতে এখানে একটি ধর্মপ্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিবার কল্পনা হয়। ক্রমে শিবপুর ও কাসুন্দিয়া অঞ্চলে প্রভুপাদের কয়েকটি অনুরক্ত ভক্ত জুটিল। ইঁহাদের তিনি ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্‌যোগী হইতে আদেশ করিলেন। প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে চেষ্টা চলিল—প্রভূত ফলও ফলিল। চক্রবেড় নিবাসি বদান্য দাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীসম্মিলনীর জন্য একখণ্ড জমি দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার ৭৫৪ নং সারকুলার রোডস্থ বাড়ীতে এক সভায় প্রভুপাদ উপস্থিত হইলেন এবং হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী স্থাপনের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠান হইয়া গেল। প্রভুপাদের ভক্ত শিষ্যগণ নানাস্থানে চেষ্টা করিয়া অর্থ ও গৃহ নির্মাণ দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। সভামণ্ডপ নির্মাণ হইয়া গেল। সন ১৩৩৪ সাল ২৭শে ফাল্গুন রবিবার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই সম্মিলনীর উদ্বোধন করিলেন। চেয়ারম্যান চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ধর্মসভায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ সভাপতি

থাকিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া দেন। ভক্ত প্রবর পরেশচন্দ্র দত্ত (হাওড়ার উকীল) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক) এবং বহু বিশিষ্ট ভক্তের সমাগমে সেদিনকার অনুষ্ঠান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ৩ নং নবীন বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থিত মিলন-মন্দিরে। এই সম্মিলনী গৃহে নিয়মিত উৎসব, পাঠ, কীর্ত্তন ও ধর্ম্ম সমালোচনা হইয়া থাকে।

প্রভুপাদ হাওড়া সম্মিলনীকে কত ভালবাসিতেন তাঁহার নিদর্শন স্বরূপ হাওড়ায় অবস্থিত প্রভুপত্নী অম্বুজা বালা দেবীর নামে সম্পত্তি এই সম্মিলনীকে দান করাইয়াছেন।

—প্রথম দর্শন

জন্মাষ্টমীর মিছিল। ঢাকা সহরে এ সময় বহু দেশদেশান্তর হইতে মিছিল দর্শকের সমাগম হইয়াছে। পথে লোকের অত্যন্ত ভিড়। অদ্য ইস্‌লামপুরের মিছিল। আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া জনতা ঠেলিয়া পথে চলিয়াছি। কত বিচিত্র বর্ণের কাপড় জামা পরিয়া সুন্দরীগণ রাস্তার দুই পার্শ্বে ছাদে বারান্দায় এবং জানালার ধারে অবস্থান করিতেছে। পথে যাইতে প্রায়শঃ উপরের দিকে এই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই যুবকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। এই ধরণের বাহার দেখিয়া দুর্লভ আশা করিয়াই তখনকার মত তৃপ্তি। দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। কোনটাই পাওয়া হইতেছে না, অথচ চাওয়া হইতেছে যেন সবটাই। এই বিশ্বগ্রাসী লোলুপতার শেষ নাই। পথে চলিতে চলিতে কি জানি কি একটা অপূর্ব্ব জ্যোতির দীপ্তি যেন চক্ষু দুটিকে টানিয়া ধরিল। চাহিলাম দেখিবার জন্য আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া গেল। এ কি এতো কোন রমণীর মূর্ত্তি নয় এযে প্রদীপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃসম্পন্ন এক দিব্যকান্তি পুরুষ মূর্ত্তি। এ কে? এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি

সঞ্চালিত। প্রত্যেকটি দৃশ্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার মত আগ্রহ লইয়া ইনি দর্শকরূপে রাস্তার ধারে এক ভক্তের দোকানে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঢাকা সহরে কখনো দেখি নাই। নিশ্চয় তিনি এ দেশের লোক নন অপর কোন দেশের হইবেন, শুধু মিছিল দেখার জন্যই তাঁহার ঢাকা সহরে আগমন নয় ; বুঝি এই দেশবাসীর অন্তর জগতে দৃষ্টিপাত করিবার জন্যই তাঁহার আগমন।

দোকানের মালিককে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার দোকানে ঐ দিব্যদর্শন ব্যক্তিটি কে?" তিনি বলিলেন "ইঁহাকে জান না ইনি যে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ।" নামটি পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম, এখন দেখিয়া কর্ণ ও চক্ষুর বিবাদ ভঞ্জন হইল। মনে মনে প্রণাম করিলাম। অতি নিকটেই একটী বন্ধুর দোকানের এক পাশে দাঁড়াইয়া মিছিল দেখিলাম। কি দেখিলাম মনে নাই কিন্তু সেদিন যে প্রভুটিকে প্রথম দেখিলাম তিনি চির জীবনের জন্য অন্তরে অঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। খুল্লতাত পূজনীয় ৺বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী ভাগবতরত্ন একদিন সকাল বেলা আসিয়া বলিলেন "তুমি কি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখিয়াছ? বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। অল্পদিন হইল তিনি ঢাকা আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি। তুমি যাইবে কি?" আমি বলিলাম "তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি। তিনি এখানে আসিয়াছেন? চলুন আমিও যাইব।" ভাগবতরত্নের সঙ্গে আমিও চলিলাম। নিকটেই একটি বাড়ীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। আমরা সেই বেষ্টনী ভেদ করিয়া দোতালায় গিয়া দেখিলাম প্রভু বসিয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার খুব নিকটেই বসিলাম। ভাগবতরত্ন আমাদের পরিচয় দিলেন। প্রভুপাদ আমাদের পরিচয় পাইয়া তাঁহার

স্বভাব সুলভ হাসিভরা মুখে আমাদের অত্যন্ত প্রাণ খোলা ভাবে পরম আত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন। বংশ পরিচয় এবং কি ভাবে আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামসুন্দর গোস্বামি প্রভু আহিরীটোলা হইতে ঢাকায় আগমন করিয়া বাস করেন সে সব কথা হইল। আহিরী-টোলায় আমাদের জ্ঞাতিগণ কাহারা এখনও আছেন তাঁহাদের কথা এবং পারিবারিক বহু কথাই তাঁহার কাছে শুনিলাম। সে দিন বুঝিলাম প্রভুপাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিরূপ। আরও জানিলাম আমার যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সময় যাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া আমি স্বেচ্ছায় যাঁহাকে আমার সাবিত্রী দীক্ষার আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম তিনি এই প্রভুপাদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গোকুলচাঁদ প্রভু। সে দিন প্রভু আমাকে কি যেন কি এক অপূর্ব্ব প্রীতি জালে ফেলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিও।" আমিও স্কুলের পড়াশুনা হইতে ফাঁক পাইলেই প্রভুর কাছে যাই। তাঁহাকে দেখি আর মিষ্টি কথা শুনি।

অল্প কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই শুনিলাম তাঁহার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে। কোনো লোকের সঙ্গে দেখা শুনা বন্ধ। ডাক্তারের নির্দ্দেশ। আমার কিন্তু উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। অসুখের অবস্থায় অবশ্যই তাঁহার কাছে যাওয়া চাই। আমরা যে তাঁহার জ্ঞাতি। অবশ্যই যাইব এবং সুযোগ মত যত্ন করিব। উৎসাহ বুকে লইয়া দেখা করিতে গেলাম। পথে বাধা। দ্বাররক্ষক ভক্ত বলিলেন—দেখা হইবে না। ডাক্তারের নিষেধ। আমি হটিবার পাত্র নই। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম আমি কথা কহিব না। শুধু দেখিয়া আসিব। তবুও নিষেধ। যাইতে না পারিয়া ব্যথা বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম কিন্তু প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। দ্বার রক্ষকের প্রতি ক্রোধও হইল।

আমি তাঁহার জ্ঞাতি। আমার চাইতেও ইহারা কি তাহার অধিকতর আপনার জন। ঘরে বসিয়া পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইলাম। প্রভুর হাতে পত্রখানা পৌছামাত্র তিনি দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া আমাকে বাড়ী হইতে লইয়া যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। প্রভুর সাক্ষাতে গিয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম। বুঝিলাম সত্যই আমাকে তিনি আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

শিষ্যদের আগ্রহে প্রভুপাদ বহুবার ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন। সেবার (১৩২৪ সাল) সরস্বতী পূজা সমাগত। প্রভুপাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঢাকাবাসীর উৎকণ্ঠার সীমা নাই। আমিও প্রতিদিন পাঠ শুনিতে যাই। ঢাকা বার লাইব্রেরীতে "বৈষ্ণবদর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। সভার সকলেই বক্তৃতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। একটু দূরে বসিয়া আমিও বক্তৃতা শুনিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ প্রেমের বর্ণনা হইতেছিল। একটী উদাহরণ দিয়া উহা বুঝানো হইল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রশ্নটি এই— হরিণী হরিণকে বেশী ভালবাসে অথবা হরিণ হরিণীকে বেশী ভালবাসে ইহারই মীমাংসা করিতে হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—এক বনে এক হরিণ দম্পতি বাস করিত। হঠাৎ বনে আগুন লাগিল। অন্যান্য পশুপাখীর সঙ্গে হরিণ দম্পতিও ছুটিয়া বনের বাহিরে চলিল। অগ্নিতাপ-দগ্ধ পথক্লান্ত হরিণ দম্পতি আর পথ চলিতে পারে না। হরিণী গর্ভবতী, পিপাসায় কাতর। সে হরিণকে বলে, নাথ আমি আর চলিতে পারি না, প্রাণ যায় একটু জল। হরিণ তাহাকে বৃক্ষতলায় বসাইয়া শ্রান্ত হইলেও ছুটিয়া চলিল জলের সন্ধানে। অনতিবিলম্বে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্তে জলের সন্ধান পাইয়া হরিণীকে আসিয়া সেই সংবাদ দিল। অতিকষ্টে হরিণী দেহভার বহন করিয়া লইয়া চলিল সেই জলের ধারে। দুজনেই আসিয়া জলের সম্মুখে

দাঁড়াইল। তৃষ্ণাতুরা হরিণী জলপান করিতে যাইতেছে। এমন সময় হরিণের দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কাতর নয়নে হরিণের দিকে চাহিয়া হরিণী বলিল, নাথ, তুমিও পথশ্রান্ত-তাপদগ্ধ। ঐ জলটুকুতে দুজনার পিপাসা মিটিবে না। তুমি উহা খাইয়া বাঁচ। আমার প্রাণ যায় যাউক। হরিণ বলে, তাহা কি হয়? তুমি বাঁচিলে দুটি প্রাণ বাঁচিবে—তুমি ঐ জল খাও। হরিণী উত্তর দেয়, তাহা কি হইতে পারে, তুমি পুরুষ জাতি, তোমার জীবনের মূল্য অধিক। আমি মরিলে ক্ষতি নাই। তুমি ঐ জল খাও। কথায় কথায় দুজনেরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। জল যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল। ইহাদেরই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, হরিণ হরিণীকে ভালবাসে অথবা হরিণী হরিণকে অধিক ভালবাসে।

কোন পণ্ডিত বলিলেন, পশুজাতি হইয়াও হরিণের হরিণীর প্রতি প্রীতি মনুষ্যজাতির প্রীতিকেও হার মানাইয়াছে। আবার কেহ বলিলেন, হরিণী পাতিব্রত্যের চরম আদর্শ দেখাইয়াছে। অতএব তাহার প্রীতি অধিকতর প্রশংসনীয়। অপর পণ্ডিতগণ বলিলেন, ইহাদের মধ্যে প্রীতির তারতম্য করা বৃথা। উভয়েরই উভয়ের নিমিত্ত প্রচুর প্রীতি স্বীকার করিতেই হইবে। প্রশ্নের সমাধানে মহারাজ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে পণ্ডিত, তোমার সিদ্ধান্ত কি? তিনি বলিলেন মহারাজ, আমার মতে হরিণ বা হরিণী কেহই কাহাকেও সত্য করিয়া ভালবাসিত না। উত্তর শুনিয়া সকলেই বিস্মিত। কালিদাস আরও বলিলেন, সত্যপ্রেম অমৃত। উহাতে মৃত্যু হয় না। যদি তাহাদের প্রকৃত ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে একজন জলপান করিলে দুজনেরই তৃপ্তি হইত। প্রিয়জনের তৃপ্তি হইলে যে প্রীতি করে তাহারও তৃপ্তি হয়। সন্তানকে ভোজন করাইয়া মাতার তৃপ্তি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রণয়ীর প্রাণ কাতর হয় না। যদি সে প্রিয়কে

পরিতৃপ্ত করিতে পারে। বৃন্দাবনে গোপীগণ নন্দনন্দন সুখে আছেন ভাবিয়াই সুখী হইতেন। প্রিয় কৃষ্ণের পরিতৃপ্তিতে প্রিয়া গোপীর ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া যাইত। এইজন্যই সাধকগণ অনশনেও ভগবানের পরিতৃপ্তি হয় ভাবিয়া কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করেন না বরং সুখী হইয়া থাকেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে উপবাস দুঃখের নয় সুখের। ভগবানের প্রীতিতেই ভক্তের প্রীতি। ভালবাসার এই জাতীয় উদাহরণ লৌকিক জগতে বিরল হইলেও একেবারে নাই বলা চলে না। ইহাকেই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ বলিয়াছেন।

গল্পটি শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। বাড়ী ফিরিবার মুখে প্রভুপাদ আমাকে লইয়া এক গাড়ীতেই ফিরিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আপনার সঙ্গে আমার একটি সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে। তিনি সহাস্যবদনে একটিবার আমার দিকে তাঁহার স্বভাবসুলভ অন্তরভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, আমার মনে পড়ে যেন সেই দৃষ্টির দ্বারাই তিনি আমাকে তাঁহার করিয়া লইলেন। সরস্বতী পূজার দিনে আমার দীক্ষা হইল।

নবাবপুর বড় গোঁসাই বাড়ীতে প্রতি বৎসর শ্রীনিত্যানন্দ উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবোপলক্ষে আমি আমার গুরুভাইদের সহায়তায় প্রতি বর্ষেই একবার প্রভুপাদকে ঢাকা লইয়া আসি। প্রভুপাদ আমাকে বলিয়াছেন—তোমাদের উৎসবের জন্য আমার বাড়ীর মহোৎসব বন্ধ হইল। ইহা তাঁহার ঢাকাবাসীর প্রতি বিশেষ প্রীতির পরিচয়। সেইবার মাঘোৎসবের সময় প্রভুপাদের ব্যাখ্যা ফরাসগঞ্জ ৺বিহারীলালজীর আখড়ায় হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের যত ভক্ত সমাজে না গিয়া এখানেই আসিতেছেন। তাঁহার প্রেম উদাত্তকণ্ঠে দার্শনিক তত্ত্ব—হরিলীলা কথা অফুরন্ত মাধুর্য্যসৃষ্টি করিয়া সেবারকার মত অপর সকল উৎসবকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

ঢাকার নিয়মসেবা প্রসিদ্ধ ছিল। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল, রাধাবিনোদ প্রভু, সীতানাথ প্রভু, গোপীকৃষ্ণ প্রভু, কৃষ্ণচন্দ্র ভাগবতভূষণ, রাধাশ্যাম গোস্বামী, আরও কত গোস্বামী সন্তান এই সময় প্রতিবর্ষে ঢাকার বসাক, পাল ও সাহাবাবুদের মন্দিরে ও গৃহে হরিকথা আলোচনার নিমিত্ত আগমন করিতেন। নিয়ম ছিল, যে গৃহে যিনি পাঠ করিবেন যতদিন পাঠ চলিবে আজীবন সেই একই বক্তা প্রতি বর্ষে পাঠ করিবেন। এই পাঠ ব্যাখ্যায় হরিকুথা-যজ্ঞ, নিয়মসেবার নিয়মপালন পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে গোস্বামিপাদগণও বিশিষ্ট ধনিক্ বণিক্ গৃহে, মন্দিরে ও আশ্রমে এই যজ্ঞের হোতারূপে প্রতিবর্ষে যোগদান করিতেন। অতি প্রত্যুষে মঙ্গল আরতির মুখর ঘণ্টারোলে সমগ্র ঢাকা সহর জাগিয়া উঠিত—সন্ধ্যায় দলে দলে স্ত্রীপুরুষ মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া আরত্রিকাদি দর্শন করিতেন। প্রভুদের মুখে পাঠ শুনিবার—মালা গাঁথিবার তাহাদের নিয়মরক্ষা করিবার সে কি আকুলতা—সে কি নিষ্ঠা! এই একটি মাসে নানাস্থানে পাঠ কীর্ত্তন ভক্তি অনুষ্ঠান যাহা হইত তাহা শুধু বাংলায় কেন ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে কি নবদ্বীপ, কি বৃন্দাবনে কোথাও হইত কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ এইজন্য ঢাকাকে "দ্বিতীয় বৃন্দাবন" আখ্যা দিয়াছেন। মন্দির, আখড়া, আশ্রম-বহুল ঢাকা সহর নিয়মসেবার সময়ে অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়া উঠিত। কোন কোন বৎসর প্রভুপাদ এই নিয়ম সেবার রঙ্গ দেখিবার জন্য ঢাকায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে পাঠের সময় উপস্থিত হইয়া কোন্ পাঠক ব্যাখ্যাতা কিরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এবং বলিতেন—আমি তোমাদের পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। কে কি ভাবে ব্যাখ্যা কর দেখিব। এই পরিদর্শনের ব্যাপারে তাঁহার কৃপা প্রেরণাই অনুভব করিতাম।

দেশ বিভাগের ফলে ঢাকা গিয়াছে। ঢাকাবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে —তাহাদের গৃহ নাই—মন্দির নাই—পাঠ নাই—কীর্ত্তন নাই। তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। ঢাকাবাসী বসাকগণ প্রায়শঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশীয়গণেরই শিষ্য। প্রভুপাদ ছিলেন তাহাদের জীবন দেবতা। এই দুর্দ্দিনে সেই দেবতারও অদর্শন হইয়াছে। শূন্য মন্দিরের বিগ্রহগুলি লইয়া সেবকগণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধারমণ, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরেবতীরমণ, শ্রীমদনমোহন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধাবল্লভ প্রভৃতি কত কত বিগ্রহ দেশ বিভাগের ফলে কলিকাতায় আনীত হইয়াছেন। এই সকল বিগ্রহ এখন ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের তত্ত্বাবধানে সেবিত হইতেছেন। (১৯৫০ মার্চ্চ)

—ঢাকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ও প্রভুপাদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার মত কোনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এতদিন গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া নানারূপ উপধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। এই সকল উপধর্ম্ম যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, যাহাতে সৎ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচারিত হয় এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই কাহারও কাহারও অন্তরে এইরূপ একটি চিন্তার ধারা জাগিয়াছিল যে, সার্ব্বজনীন ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মালোচনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলে বেশ ভাল হয়। ১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক ব্রতের সময় পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী দেব ঢাকায় আগমন করেন। তখন তাঁহারই অনুপ্রেরণায় প্রেরিত হইয়া ১৭ই পৌষ মঙ্গলবার দিবস নবাবপুর শ্রীচৈতন্য আশ্রমে এই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইলে, কথা ও গানে শ্রীভগবানের

সেবাই এই সম্মিলনীর অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যেখানে ভুবন পাবন বৈষ্ণব-সমাজ সম্মিলিত হইবেন সেখানে তাঁহাদের পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের কথা ও গান দ্বারাই তাঁহার সেবা করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উৎসাহী সেবকবৃন্দ বহু স্থানে সভা করিয়া ভগবৎকথা, গান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে জনসাধারণের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। প্রভুপাদ কয়েকবার ঢাকায় আগমন করিয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সর্ব্বদা সম্মিলনীতে উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা ইহার আকর্ষণী শক্তিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীলা করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, রাধাবিনোদ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ দর্শনবিদ্ ডাঃ হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানীজন এই সম্মিলনীর সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। ১৩৩৬ সনের সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে একটি বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ প্রদর্শনী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। পাণিহাটী গৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির হইতে অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি, চিত্রপট সমূহ (এখন বরাহনগরে রক্ষিত) সংগ্রহ করা হইয়াছিল। শ্রীসম্মিলনী বৈষ্ণব গ্রন্থ মুদ্রণ, শাস্ত্রচর্চ্চা ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারাকে প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছিল। প্রভুপাদ ঢাকা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীকে 'তুলসী মঞ্জরী' গ্রন্থের স্বত্ব দান করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে কিশোরগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী পাক্ষিক সভা দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিল। নোয়াখালি

দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকদের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঢাকা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে চারিজন সেবকসহ ক্ষুদ্র গ্রন্থকার উপদ্রুত অঞ্চলে গমন করেন। কম্বল, অর্থ ও নানাপ্রকার সাহায্য দান করিয়া হাইমচর প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের উদারতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বৈষ্ণবদের গলায় তুলসীর মালা পরান হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের আদর্শ প্রচার করা ও নানাস্থানে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর শাখা স্থাপন করাই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রধান কার্য্য।" এই সম্মিলনী প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান।

ঢাকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর উন্নতি ও প্রসারকল্পে যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম নরেশচন্দ্র বসাক, হরিলাল বসাক, গোপীনাথ বসাক ইহারা সকলেই প্রভুপাদের অনুগৃহীত ও চিহ্নিত ভক্ত।

নবাবপুর বড় গোঁসাই বাড়ী বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরাসযাত্রা, ঝুলন, উৎসব প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের যাত্রাপার্বণ উপলক্ষে নাচ, গান, গীতাভিনয়, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি হইত। সেকালে হরিকিশোর, শ্রীনাথ প্রভুরা ছিলেন খুব বিলাসী এবং শ্রীরাধাবল্লভের একান্ত ভক্ত। একালেও হরিকিশোর গোস্বামীর দুই পুত্র যমজ ভ্রাতা,—গৌর, নিতাই রূপেগুণে বিলাসে কৌতুকে ছিলেন সর্বজনের প্রিয়। ঢাকার ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিপুষ্ট এই প্রভুযুগল প্রতি নিয়তই উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতেন। প্রভুপাদের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ প্রীতি ছিল। জন্মাষ্টমীর মিছিলে দুই যমজ ভ্রাতা যখন সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া ঘোড়ার পিঠে চাপিতেন তখন আশ্চর্য দর্শন একইরূপে দুই মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইতেন। রূপের এতাদৃশ সাদৃশ্য খুব কমই দেখা যায়। এই গোঁসাই বাড়ীতে সরোদ সম্রাট্ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, পরমভক্ত আপ্তাউদ্দীন আহম্মদ, সঙ্গীত-শিল্পী চারু দত্ত, দীনু ঘোষ, মহেন্দ্র ওস্তাদ, উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি একনিষ্ঠ সঙ্গীত সেবকগণ শ্রীরাধাবল্লভের রাস ও

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে জল্‌সা করিয়াছেন। তখন সমাজে বিদ্বেষ ছিল না—তাই হিন্দু মুসলমান এমন কি ঢাকার নবাব বাহাদুর পর্য্যন্ত এই সকল উৎসবে যোগ দিয়াছেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বড় গোঁসাই বাড়ী ছিল ঢাকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রচার কেন্দ্র। গ্রন্থকারের দীক্ষার পর যতবার প্রভুপাদ ঢাকা গিয়াছেন সর্বপ্রথমে এই বাড়ীতেই উঠিয়া সেবাদি সমাপনান্তে অন্যত্র যাইতেন।

—বরাহনগর পাঠবাড়ী ও প্রভুপাদ

১৩৩৪ সালে শ্রীভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীর সেবাভার শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহারাজের হস্তে অর্পণ করিবার কথা উঠিলে বাবাজী মহোদয় নিজে এই সংবাদ প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে জানাইবার জন্য যাইলেন। প্রভুপাদও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তিনিও নিজে এ বিষয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি এই বিষয় বড় বাবাজী মহাশয়ের সময় একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তখন কৃতকার্য্য হয়েন নাই, কিন্তু এখন তাহারা নিজেরা এই সেবা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলেন এবং সেই দিনই বৈকালে বরাহনগর আসিয়া বিজয় ও ধীরেনের স্ত্রীকে এই বিষয় বলিয়া যাইলেন। এইরূপে অতি অল্প দিনের ভিতরেই দুই পক্ষে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু শুভ কার্য্যে অনেক বিঘ্ন আছে, এই কথা সত্য করিবার জন্য, পাঁচজনের পরামর্শে Registary হইবার ৪ দিন পূর্ব্বে ধীরেনের স্ত্রী Registary করিতে অস্বীকৃত হইল, পুলিন বাবু এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বাবাজী মহাশয়কে জানাইল, এবং বাবাজী মহাশয় পুলিন বাবুকে তৎক্ষণাৎ প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট যাইতে আদেশ করিলেন—পুলিন বাবু তৎক্ষণাৎ প্রভুপাদের নিকট যাইয়া দেখেন, প্রভুপাদ স্নান করিবার জন্য তৈল মাখিতেছেন, তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলে প্রভুপাদ আর মুহূর্ত্তমাত্র কাল

বিলম্ব না করিয়া. সেই তৈলমর্দ্দন অবস্থাতেই—পুলিন বাবুর সহিত মটরে বরাহনগরে আসিলেন এবং দেবেন বাবুকে সঙ্গে লইয়া ধীরেনের স্ত্রীর নিকট আসিয়া, অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে স্বীকৃত করিলেন। পরে প্রভুপাদ এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া পুলিনদার সহিত কলিকাতায় যাইলেন। এখানে বলিয়া রাখি, যে প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর চেষ্টাতেই পাঠবাড়ী বাবাজী মহাশয়ের নামে রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছাতেই শ্রীবরাহনগরের পাঠবাড়ী আজ বৈষ্ণব জগতে অদ্বিতীয় স্থান বলিয়া প্রকাশ হইতেছে। শ্রীগ্রন্থমন্দির ও শ্রীবৈষ্ণব প্রদর্শনী তাহার নিদর্শন। (নিতাই সুন্দর ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

—বৈষ্ণব সাধনার প্রাণশক্তি

সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীর উদ্‌যোগী কর্ম্মী শ্রীরাধারমণ দাসকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রভু অনেকবার বলিয়াছেন, রাধারমণ, তুমি নানাস্থানে ঘুরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচারের জন্য যে অনুষ্ঠান করিতেছ উহাতে সমগ্র সমাজের অত্যন্ত মঙ্গল হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী প্রতিষ্ঠারও ইহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। নব নব গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করুক ইহা আমার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—যে একবার শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ শুনিবে. বৈষ্ণবসাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করিবে, অবশ্যই সে ভক্তিলাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে।

পুরীধামে অনুষ্ঠিত চরণদাস বাবাজীর প্রথম জন্মোৎসব দিনে প্রভুপাদ স্বয়ং তাঁহার অনুমোদন লইয়া ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মাতা গোস্বামিনী প্রভুপত্নী অম্বুজাবালা দেবী সেদিন নিজে হাতে বড়বাবাজীর ললাটে তৈলহরিদ্রা স্পর্শ করাইয়াছিলেন। সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীর রাধারমণও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুপাদের জন্মোৎসব তিথি উদ্‌যাপনের জন্য তাঁহার অনুমতি লইয়াছিল। এই জন্মোৎসব পর পর

৩ বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪৪ খৃঃ অষ্টসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী প্রভুপাদকে "গৌরপ্রেম রসার্ণব" উপাধিতে ভূষিত করিয়া এক মানপত্র প্রদান করেন। এই মানপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি। প্রভুপাদের অন্তর্ধানে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী তথা সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে প্রভুপাদের স্মৃতিসভায় উক্ত সম্মিলনীর পক্ষ হইতে "দেশ" সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রাণশক্তির দিকটাই বিশেষভাবে মনে পড়ে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্ম নির্জীবের ধর্ম নয়. দুর্বলের ধর্মও নয়। স্বার্থকেন্দ্রিক নিষ্ক্রিয়তা, প্রমাদ, আলস্য, বৈষ্ণবের জীবনে কোনদিন প্রশ্রয় পেতে পারে না, সে জীবনধারা এমনই স্বচ্ছ এবং সবল। মহাপ্রভুর পার্ষদদের জীবনী আলোচনা করলেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম মৃতের ধর্ম নয়, প্রাণের প্রগাঢ় সংবেদনে বৈষ্ণব সকলকে আপন করতেই চেয়েছে। অস্পষ্ট বা আঁধার পথে নিরুদ্দিষ্টের অভিযানে বৈষ্ণব চলে নাই, ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে প্রাণের বিলাসে মেতে উদার এক আনন্দময় নিত্য প্রকাশের রাজ্যে অভিসারে তার যাত্রা। নামকে ধরে ধামের পথে এই যে গতি, প্রবল এর বেগ, সব বাধাকে তুচ্ছ করে, অভীষ্টের সাধনায় এ নিজকে উৎসর্গ করতে চায়। অনুমানের রাজ্যে মনের এই গতিবেগ লাভ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তকে ধরে অব্যক্তের দিকে, শান্তকে ধরেই অনন্তের অভিমুখে বিকারকে ছেড়ে সঞ্চারের মধ্যে এই শক্তি উৎসারিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণবের ভগবান সর্বত্র। তিনি জলে, তিনি স্থলে, ধূলিবিন্দু-লিপ্ত বালুকণাতেও বৈষ্ণব বিশ্বদেবতার সংবেদনাই লাভ করে থাকেন। প্রত্যক্ষ চেতনাময়, এই সুমহান্ সত্যের সঙ্গে যিনি মনকে যুক্ত করতে না পেরেছেন তাঁর বৈষ্ণব সাধনার বিশেষ

কোন মূল্যই নেই। বৈষ্ণব সকলকে আপন করতে চান। তিনি কাহাকেও তুচ্ছ করেন না। দোষ বা ত্রুটিই যার সব সময় দৃষ্টিতে পড়ে, বৈষ্ণব-সাধনা তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা হয়েই দাঁড়ায় এজন্যই মহাজনের বাণী রয়েছে—"অনিন্দক হইয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে, সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।"

* * * *

আমাদের প্রাণেরই রয়েছে প্রেমের অভাব। দেশের আর্ত্ত, তাপিত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের বুকে এদের জন্য বেদনা জেগেছিল। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের বংশাবতংস ছিলেন। জীবনে প্রকৃত প্রেমের সারাও তিনি পেয়েছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলতেন, প্রেম ছেড়ে বৈষ্ণব ধর্ম শুধু আড়ম্বর সর্বস্ব হয়ে উঠলো। ধনীদের নিয়ে শুধু মাতামাতি, গরীব দুঃখীর জন্য কারো বেদনা নাই। আর্ত্ত, পীড়িত এবং অত্যাচারিতের অশ্রু মুছাবার জন্যে কারো তাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী দরিদ্রের ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর নাম প্রচার করাতে তিনি আনন্দ বোধ করতেন। কার্শিয়াংয়ের যক্ষ্মা নিবাসের জন্য প্রভুপাদ তাঁহার জীবনে সঞ্চিত সব অর্থই দান করে গেছেন বলা যায়। এতে তাঁর প্রকৃত বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করতে পারি। অতুলকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবেত্তা পরম পণ্ডিত ছিলেন; তিনি ভাগবতের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন; তিনি বাংলার বৈষ্ণব যুগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনি প্রাণবান্ ছিলেন। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে মহা দুর্দৈব দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপূর্ণ সংস্কৃতির ধারাকে উজ্জীবিত রাখতে তাঁর মত জীবনের সাধনশক্তি আমাদের সম্বলস্বরূপ ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব যিনি, তিনি মৃত্যুর অতীত। তাঁর মৃত্যু নাই—তাঁর বিজয়। বাংলার এই পরম বৈষ্ণবের জীবনের সাধনা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক, আজ শুধু এই প্রার্থনাই করছি।"

—প্রভুপাদ ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের ভক্ত শিষ্য ছিলেন। ইনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম উদয়চাঁদ মজুমদার। অশেষ বিদ্যার খনি হইলেও পরম প্রেমধনে ধনী প্রভুপাদ তাহাকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ ছাব্বিশটি ভাষা জানিতেন। তিনিই সর্বপ্রথম কলিকাতায় বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা দানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ইনিই। জৈন জাতক, কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, সরস্বতী প্রভৃতি বহু গ্রন্থে তাহার গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য ও ধর্মসভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়া বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। যে কোনো বিষয়ে গভীর আলোচনার প্রয়োজন হইলে তিনি একান্তে প্রভু-পাদের সমীপে আসিয়া বসিতেন এবং সেই সকল সন্দেহ নিরসন করিয়া লইতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সেবায় তিনি উদারমনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মভোলা জ্ঞানের সাধক। সংসার জীবনে ছিলেন একান্ত উদাসীন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করিলে প্রভুপাদ অত্যন্ত অভাব বোধ করেন। প্রভুপাদ বিদ্যাভূষণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র ও গোস্বামিপ্রবর অতুলকৃষ্ণ।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।

যাঁহার নিকট হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না, লোক হইতেও যাঁহার উদ্বেগ হয় না, যিনি হর্ষ, ঈর্ষা, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি হইতে মুক্ত তিনি ভগবানের প্রিয় হয়েন। এরূপ চরিত্র ছিল একদিন সমস্ত সাধনার আদর্শ। ভয় ত্রাস উদ্বেগে যখন বিশ্বে সকল নরনারী সন্ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত, তখন এই আদর্শেরই অনুধ্যান করা প্রয়োজন নয় কি? যদি তাহা হয়, তবে ইহার জন্য সাধনা করিতে হয়। বিনা সাধনায় কিছু হয় না; যাঁহারা মনে করেন যে, জীবনে সমস্ত সুখ লুটিয়া, সমস্ত সুবিধা উপভোগ করিয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটিয়া যাইবে। তাঁহারা হয় অদৃষ্টবাদী, না হয় অত্যন্ত প্রতারিত। পৃথিবীর সভ্যজাতিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকে তাহার সাধনার দ্বারা জীবনের সফলতা লাভ করিবার আয়োজন করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, কেহ সাহিত্যে বা শিল্পে, কেহ ব্যবসাবাণিজ্যে, কেহ বা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মুক্তিপথের সন্ধান খুঁজিয়া লইয়াছে। যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী, যাঁহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসী, যাঁহারা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সেতু নির্মাণ করিয়া উভয়ত্র, মানবজীবনকে জয়যুক্ত করিতে অভিলাষী তাঁহারা গীতার ঐ আদর্শকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

পরলোকগত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন এইরূপ আদর্শবাদী। প্রভু নিত্যানন্দবংশ সম্ভূত গোস্বামিপ্রবর সেই 'অক্রোধ পরমানন্দ' এবং অদোষদরশী প্রভুর আদর্শই জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ॥

এমন করিয়া গৌরসুন্দরকে আর কেহ ভালবাসেন নাই। অতুলকৃষ্ণও সেই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি গৌরগত প্রাণ ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের সম্বন্ধে যাঁহাদের ধারণা নাই, তাঁহারা প্রভুপাদের চরিত্র সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। গঙ্গার সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে যেমন গঙ্গোত্রীর সন্ধান করিতে হয়। শিবের জটার ন্যায়, গিরিচূড়া হইতে গিরিচূড়ায় ভ্রমণ করিয়া, কেমন করিয়া এই বেগবতী পুণ্যসলিলা ভাগীরথী আর্যাবর্ত্তকে ধনধান্য পরিপূর্ণা সাধুসঙ্গের পুণ্যভূমিতে পরিণত করিলেন, তাহা আগে জানিতে হয়। যমুনোত্রীর পর্বত গৃহ হইতে কেমন করিয়া ধীর তরঙ্গে বহির্গত হইয়া শান্ত সুশীতল বারি বহনে জীবের হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিলেন, তাহা না জানিলে যমুনার স্থির পবিত্র প্রবাহ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত মাহাত্ম্য অবগত না হইলে, প্রভুপাদের ন্যায় ভাগবতের চরিত্র বুঝিতে পারা কঠিন হইবে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ ধীরস্থির গম্ভীর অথচ চিরপ্রফুল্ল শান্তিময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা তিনি শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারই ফলে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অমন সুন্দর পরিপাটী সংস্করণ আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। যতদিন শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত মানব সমাজে আদৃত হইবে, ততদিন প্রভু গোস্বামিপ্রবরের নাম কেহ ভুলিবে না। চৈতন্য ভাগবতও যেমন অতুলনীয় গ্রন্থ, সম্পাদক অতুলকৃষ্ণেরও তেমনি তুলনা নাই।

মহাপ্রভুর লীলায় যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদিগকে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কাহাকে বলে? ধার্মিক মাত্রই একশ্রেণীর লোকের নিকট সাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিগণিত হন, সে সকল লোকের মনস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা ধর্মের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও সামান্য স্বার্থ তাঁহাদের হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ভগবানকে নির্বাসন করিয়া তাঁহার স্থলে যদি অন্য ভাল কিছু সেখানে বসানো হইত, তাহা হইলেও কথা ছিল

না। কিন্তু ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, তুচ্ছ সীমাবদ্ধ স্বার্থকে দেবতা করিয়া মানবজীবনকে তাহারই যন্ত্রমাত্রে পরিণত করার চেষ্টা কখনও সাধু হইতে পারে না। মহাপ্রভুর ধর্মে কি বলে? ভগবানই একমাত্র আরাধ্য। সুখে দুঃখে ইহকাল পরকাল হাসিতে অশ্রুতে সেই হৃদয়দেবতাই একমাত্র শরণ্য। এই কথা মহাপ্রভুর কথা :—

নয়ন পুতলী করি লইয়াছি মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুনি জ্বালি সকলই পোড়ায়েছি
কুলশীল মান অভিমান!

আমি তাঁহাকে আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় সকল সময়ে প্রাণের সেবায় নিয়োজিত থাকে। আমি সেই প্রাণের প্রাণ পরম শ্রেষ্ঠকে হৃদয়সিংহাসনে প্রাণরূপে স্থাপন করিয়াছি। আমি যাহা বলিব, তাহা যেন তাঁহারই গুণগাথা ব্যতীত আর কিছু না হয়, আমি যাহা অনুষ্ঠান করিব, তাহা যেন তাঁহারই সেবা হয়।

আমার করের ভূষণ শ্রীপাদ সেবন
বদন ভূষণ শ্যামনাম।

এই ত বৈষ্ণবের সাধনা। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা কোথায় হইল? যদি কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার থাকে, যাহা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিসম্ভূত, তবে তাহা বাদ দিয়া যাহা সার্বজনীন অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম তাহা ত গ্রহণ করিতে পার? প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের জীবনে এই ভগবৎপ্রেমেরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছি। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ছিল নিরহঙ্কার সরলতায়। তাঁহার হাসিতে সমস্ত সংশয় দূর হইয়া যাইত এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতার পবিত্র বায়ু বহিত। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর বংশাবতংস ছিলেন, কিন্তু আভিজাত্যের

অভিমান তাঁহার চরিত্রে একটুও ছিল না। এমন নির্মল নিষ্কলুষ অভিমানলেশশূন্য চরিত্র তিনি কোথায় পাইলেন? এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁহার ভজনসাধনশীল জীবনের দিকেই দৃষ্টি পড়ে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার দেহ কিছু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কর্মে তাঁহার উৎসাহ ছিল অবাধ। অর্থাৎ ভক্তিধর্মের প্রচার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতে কখনও বিরত ছিলেন না। অবশিষ্ট সময় তিনি সাধনভজনেই অতিবাহিত করিতেন। আমরা অনেক সময়ে তাঁহার এই আধ্যাত্মিক নির্জনতার বাধা জন্মাইতে সংকুচিত হইতাম।

অতুল গোস্বামিপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমিলন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, ইহার উন্নতিকল্পে তিনি আজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই মিলনমন্দির সংলগ্ন পাঠাগারে তাঁহার প্রায় সমস্ত পুস্তক দান করিয়া গিয়াছেন। অনেকে জানেন যে অতুল প্রভুর সাহিত্য সৃষ্টিও অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক ছিল। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি তাঁহার সাধনার আলোকেই ভাস্বর তাঁহার অমরগ্রন্থ চৈতন্যভাগবতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার 'ভক্তের জয়' সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অতি মূল্যবান অবদান। সাধকভক্ত চরিত্রের মালা গাঁথিয়া তিনি এই অপূর্ব গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন বাংলা সাহিত্যে। তাঁহার লঘুভাগবতামৃত বৃহৎভাগবতামৃত, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ভক্তিবিগলিত লেখনীর প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপ একজন প্রতিভাবান্ সাহিত্য রসিক, ভক্ত ও ভাবুক আমাদের মধ্য হইতে অপ্রকট হইলেন। এজন্য বঙ্গের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। আমাদের শোকাশ্রুপূত শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা ব্যতীত অন্য কোনও সান্ত্বনাই মনে আসিতেছে না।

জয় গৌরহরি !

জয় গৌর ভক্তবৃন্দ !!

—ভাব সমাধি

প্রভুপাদ অনেকদিন ধরিয়াই দেহ সম্বন্ধে আবেশ ত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে শুদ্ধ ভাগবতী তনুতে তীর্থপর্য্যটন করিতেছিলেন। মাতা গোস্বামিনী ১৩৫০ সালে ২৯শে বৈশাখ পাতিব্রতার পরম আদর্শ রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইহার পর হইতে প্রভুপাদ সর্বদাই অন্তরে অন্তরে কাশীধাম, পুরীধাম এবং বৃন্দাবনে গমনাগমন করিতেন। প্রভুকে দেখিতে আসিয়া প্রভুর মুখে এই ভ্রমণ কথা শুনিয়া শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া থাকিতেন। অবিশ্বাসী সাধারণ লোক এই বাক্যাবলীকে বায়ুর প্রলাপ বলিয়া মনে করিত। যাহারা তাঁহার এই ভাগবতী স্থিতির সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন তাহারা প্রতিপদে প্রভুপাদের এই সময়কার কথাগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেন। একদিন বলিতেছেন—শোন শোন সে দেশের কথা শোন। সত্য বলিল প্রভু, সে দেশ কোন্ দেশ? প্রভু বলেন—কেন সে দেশ সেই বৃন্দাবন। ঢাকা হইতে এক মহিলা পরম গুরুদেবের দর্শনে আসিয়াছিল, প্রভুপাদ তাহাকে বলিলেন এই যে আমি কাশীধামে গিয়াছিলাম এইমাত্র ফিরিয়া আসিলাম। আরো একদিন চিকিৎসকের পরামর্শে ডুস্ দেওয়া হইবে বলিয়া আয়োজন করা হইতেছিল আবিষ্টভাবে প্রভু বলিয়া উঠিলেন এখানে ওসব চলিবে না। তিনি তখন পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন—দেখনা এযে মন্দির এখানে চলিবে না। সত্যসত্যই এ ভাবের আবেশ তাঁহার বহুদিন দেখা গিয়াছে। বেগ হইলেও বাহিরে না লইয়া গেলে তিনি বাহ্যকৃত্য করেন নাই। একদিন কোনো ভক্তকে বলিলেন আজ আর খাইব না। লালাবাবুর কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া আসিলাম। সেখানেই প্রসাদ পাইয়াছি।

তাঁহার স্মৃতি ও ধৃতির কথা বিবেচনা করিলে অলৌকিকভাবে অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে। যে কোনো প্রকার দুঃসংবাদ তিনি অম্লান বদনে সহ্য

করিতেন। ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার গভীর ভাব বাক্য বা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। কি মাতা গোস্বামীর পরলোক গমনে—কি তাঁহার একমাত্র কন্যা থাকরাণীর বৈধব্য বিধুরতায় তাঁহাকে কোনোমতে ব্যকুলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ছিলেন হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের ন্যায় ভগবদ্‌ভাব শুদ্ধ অচল অটল।

প্রভুপাদ দূরদৃষ্টি প্রভাবে কে কোথায় কি করিতেছে কে আসিতেছে কে যাইতেছে তাহা বেশ টের পাইতেন। একদিন তিনি হঠাৎ বলিতেছেন—ছাদের উপর ছেলে মেয়েরা গেছে তাহাদের নামিয়া যাইতে বল। দেখা গেল যদিও আর কেহ লক্ষ্য করে নাই ছাদে ছেলে মেয়েরা ছিল, তাহারা নিজেরাই নামিয়া আসিল।

শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বসিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন—তিলক করিতে হয়। কথাগুলি তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াই বলিতে-ছেন—আর কাহাকে বলিব? স্নানের পর তিলক করা চাইই। আর একদিন দুইটি ছেলেকে দেখিয়া তিনি বলিলেন এঁরা এদেশেরই ছেলে কিন্তু চেনা যায় না। তিনি এদেশ বলিতে ভক্তির দেশ বৃন্দাবনের কথাই বলিতেছেন।

জানুয়ারী বেলা ৭॥৹টায় ঢাকা হইতে আসিয়া প্রভুর নিকটে পৌছিলাম। তখন তিনি নিদ্রাভিভূতের ন্যায় ছিলেন। আর সকলে বলিল—ঘুমাইতে-ছেন—ঘুম ভাঙ্গাইবেন না। আমি কাছে বসিয়া বুঝিলাম তিনি আবিষ্ট ভাবে ভগবানের চিন্তায় রহিয়াছেন। একটু পরেই তিনি আমার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিলেন। সে এক অদ্ভুত করুণা প্রীতিমাখা দৃষ্টি। এমন ভাবে তিনি চাহিলেন যেন আর কনো দিন আমাকে দেখেন নাই। আমি বলিলাম, আমি আসিয়াছি—ঢাকা হইতে এইমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছি। প্রভু যেন তখন চোখ বুজিয়া দেখা এবং চোখ চাহিয়া দেখা দুই দেখায়

সীমারেখা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আপনি ঠিক দেখিয়াছেন—সত্যই ঢাকা হইতে প্রাণকিশোর আসিয়াছে, জীবন আসিয়াছে—নরেশ আসিয়াছে। বলুন আমি কি করিব? আপনিতো ভাগবত খুব ভালবাসেন ভাগবত পড়িব? রাস পঞ্চাধ্যায়? তিনি বলিলেন—"পড়।" ভাষা তখন জড়াইয়া আসিতেছিল তবু তিনি বলিলেন—পড়। আমার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল আমি ভাগবত চাহিলাম। প্রভুর প্রিয় নিত্য পাঠ্য ভাগবত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রভু বলিলেন আমার সব গেছে। আমি বলিলাম—না প্রভু আপনার সব কিছুই মজুত রহিয়াছে। ভাগবত পাওয়া গেল না বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—নাই? ভাগবত নাই! সেই সময় কণ্ঠস্বরে যে আকুলতার সুর উহা পার্থিব কোনো ক্ষতি সম্বন্ধে তুলিত হইতে পারে না। এই ভাগবতখানা দীর্ঘকাল তাহার সঙ্গী এবং নিত্যপাঠ্য। থাকরাণীদিদি একখানা 'সাধন সংগ্রহ' আনিয়া দিলেন। আমি উহা হইতে রাস পঞ্চাধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় তখনও উচ্চারণ শিখাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ আবৃত্তির পর আমি বলি—প্রভু আপনিতো ত্রৈলিঙ্গস্বামীকে দেখিয়াছেন তিনি বলেন কাশীতে যাইয়া শুনিলাম তিনি সেবারই দেহরক্ষা করিলেন। ভাস্করানন্দ, রামকৃষ্ণপরমহংস, খাণ্ডারীবাবা, বিজয়কৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাসুদেব মহারাজ, তারা ক্ষ্যাপা প্রভৃতির কথা বলিলে তাঁহার প্রাণ যেন সজীবতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সকল সাধুদের সঙ্গ কি ভাবে তাঁহার জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা কিছু কিছু তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার কোনো কোনো ভক্তকে তিনি কলিকাতা অবস্থান কালে সূক্ষ্ম শরীরে অন্যত্র যাইয়াও দীক্ষাদান করিয়াছেন। এক দিক দিয়া অন্তর্যামিত্ব অপর দিকে সূক্ষ্ম শরীরে দূর দূরান্তরে ভ্রমণ উভয় প্রকার

ভাবই প্রভুর জীবনে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অগণিত শিষ্য, এক এক জনের বিচিত্র অনুভব, সেগুলি সংগ্রহ করিলে বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে।

জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা অটুট ছিল। তিনি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা খুবই পছন্দ করিতেন। তাঁহার প্রীতির জন্য আমি সেই প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা হাতে লইলাম। একটু একটু পড়িতে ছিলাম। যখন আমি বলি—কনক কেতকী রাই শ্যাম মরকত কাই, তখনই তিনি বলেন—কাই মানে বুঝিলে তো কান্তি—কান্তি—যাঁর আভায় নিকুঞ্জবন শ্যামল জ্যোৎস্নায় পূর্ণ হইয়া উঠে। দরপ দরপ করু চুর। সেই সুন্দর—নটবর শিরোমণি নটিনীর শিখরিণী দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর। প্রভু নিমীলিত নয়নে যেন কোন্ প্রেমরাজ্যের আবেশে শুনিতেছেন। আমি বলি—শ্রীরূপমঞ্জরী সার শ্রীরতিমঞ্জরী আর—লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী। শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে কস্তুরিকা আদি রঙ্গে প্রেম-সেবা করে কুতূহলী॥ প্রভু, আপনার সেবাটি যেন কি? প্রভু বলেন—তোমাকে তো অনেক দিন আগেই বলিয়াছি—স্মরণ কর—আগে পাছে সখীগণ করে পুষ্প বরিষণ। আমি আবার বলি—বচনের অগোচর, বৃন্দাবন লীলাস্থল, স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ মন। যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ, কৃষ্ণলীলা রস অনুক্ষণ॥ রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষবান যেন হেম, যাহার হিল্লোলে রসসিন্ধু। প্রভু বলেন—লক্ষবান জান সোণা লক্ষবার দগ্ধ করিয়া পবিত্র করা হয়েছে। সেই রকম কামগন্ধ শূন্য বিশুদ্ধ প্রেম।

আমি বলি—অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলা কথা, আর যত হৃদয়ের শূল। প্রভু বলেন—রাধিকা চরণ রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী। আমি বলি—ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং। প্রভু বলেন—বিরক্তি র্মানশূন্যতা। আমি বলি—প্রভু, আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা এই আশাবন্ধ

মানেটা কি? প্রভু বলেন—আরে এর মানে '**পাবই**' এই দৃঢ় ভাব আর তার সঙ্গে পরম উৎকণ্ঠা। আমি বলি—নামগানে সদা রুচি। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌ বসতিস্থলে। প্রভু বলেন—শ্রীসম্মিলনীর (অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর) সেবা কর তবেই সব হবে। একথা একবার নয়—শুধু আমাকে নয়—অনেককেই তিনি বলেছেন। শেষ দিনটি পর্য্যন্ত শ্রীসম্মিলনীর প্রতি এই ভাবটি তাঁহার লক্ষ্য করিয়াছি।

সন্ধ্যার সময় শ্রীমান সত্যরঞ্জনকে বলিলাম একছড়া মালা আনিতে। মালা আনা হইল—মহাপ্রভুকে প্রসাদি করাইয়া সেই মালা গলায় পরাইয়া প্রণাম করিলাম। তখন শ্রীমুখে যে অপূর্ব্ব ভাবজ্যোতি ফুটিয়াছিল পরদিন সকালবেলা সেই শান্ত স্নিগ্ধ মধুর প্রেম সমাধিমগ্ন রূপ উচ্ছ্বলিত হইয়া সমগ্র ভক্ত সমাজের অন্তরে চিরন্তন হইয়া রহিল।

—বিরহ-বেদনা

প্রভুপাদ ৮ই মাঘ ১৩৫৩ সাল সকাল ৮টা ১৫ মিঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই দিনই এই সংবাদ টেলিফোনযোগে সর্বত্র ভক্ত ও শিষ্যগণ প্রাপ্ত হন। ৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার ঢাকা হরিসভার ভক্তবৃন্দ সমবেতভাবে প্রভুপাদের তিরো-ভাবে শোক প্রকাশ করেন। কলিকাতা, হাওড়া ও সহরতলীতে নানাস্থানে বিশিষ্ট ভক্তগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মহিমা আলোচিত হয়। ভক্তবৃন্দ গুরু-বন্দনা ও মহিমাকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে করুণরসের প্রস্রবণ বহাইয়া দেন।

১২ই মাঘ রবিবার দিবস ঢাকা বড় গোসাইবাড়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশন হয়। পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ পৌরোহিত্য করেন। প্রভাতী কীর্ত্তন, নামসংকীর্ত্তন এবং অপরাহ্ণে বিরহ সভার অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রভুপাদ গোকুল কিশোর গোস্বামী, শ্রীযুত গোপীনাথ বসাক সাহিত্য-রত্ন প্রভৃতি বক্তৃগণ ভারতীয় গুরুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গুরুদেব নিত্যানন্দ

ভগবানেরই আবির্ভাব বিশেষ। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা। অতএব তাঁহার তিরোধানে শিষ্যগণের শোকসন্তপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়; বরং তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিয়া তোলাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। প্রভুপাদ ছিলেন উদারনৈতিক বৈষ্ণব সমাজ সংস্কারক। মাণিকতলার দীননাথ দাসের অর্থে দেবতা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা ব্যাপার অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া এককালে প্রভুপাদকে সমাজের বিশিষ্ট এক শ্রেণীর কটাক্ষ ভাজন হইতে হইয়াছিল। যাঁহারা কটাক্ষ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী-কালে তাঁহারাই প্রভুপাদের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সভায় প্রভুপাদের গুণাবলী আলোচনায় সকলেই মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভুপাদের চিত্রপটে মাল্যপ্রদান ও আরাত্রিক করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয় এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

—গ্রন্থালোক

নানান নিধি—(দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৫ সাল) এই গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবাসী ও পল্লীবাসীতে প্রকাশিত নানা বিষয়ে ৩৪টি প্রবন্ধ আছে। আকারে ছোট হইলেও লেখাগুলির মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অতি চাতুর্য্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় এক অভিনব ভাবের মুখবন্ধ করিয়াছেন—"কাণা গুতের নাম পদ্মলোচন! ভারিতো লেখক অতুল গোঁসাই তার আবার প্রবন্ধ, তার নাম আবার নানান্ নিধি। ওমা, যাব কোথায়?" গ্রন্থ পরিচয়ে তিনি বলেন—খাদ্য দ্রব্যের ভিতর ভাল মন্দ কটু তিক্ত অম্ল মধুর সব রকমই তো থাকে, তবু লোকে যেমন বলে—নানান নিধি দিয়ে খাইয়েছে, আমার এ নানান নিধি তেমনই। ইহাতেও কটু তিক্ত অম্ল মধুর প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃত রসের সমাবেশ আছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপ্রাকৃত রসেরও ছিটা ফোঁটা আছে।

নূতন বৎসর—এই প্রবন্ধ ১৩১৭ সালকে বিদায় দিয়া ১৩১৮ সালের সমাগমে লিখিত। ইহাতে ভারতীয় রীতি অবলম্বনে অখণ্ড চিরন্তন কালকে কি ভাবে কল্পিত অংশে বিভক্ত করিয়া দিন, মাস, বৎসর গণনা—তাহার একটি সুন্দর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কালরূপী প্রভাকর উদয় ও অস্তে কি ভাবে জীবগণের আয়ু হরণ করিতেছেন এবং কর্ম প্রবৃত্তি দান করিয়া বিরাট সংসার চক্র চালাইতেছেন তাহার মর্মস্পর্শী বর্ণনার পর লেখক অজ্ঞতার শতসহস্র বৎসর হইতেও জ্ঞানে ও ভজনে যে অল্প সময়টুকু অতিবাহিত হয় তাহার দুর্লভতা নিরূপণ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলেন—তাই বলি ভাই, এই নূতন বৎসরের নূতন দিনে তোমরা নূতন উৎসাহে সেই নিত্যনূতন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহারই কৃপায় কালের করাল কবল অতিক্রম করিয়া মানব জন্ম সার্থক কর। ভাইরে, আজ তোমরা নূতন খাতার উৎসবে খুবই মাতিয়া গিয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু আপন পরমায়ুর জমাখরচের হিসাব নিকাশটাও একবার দেখিলে ভাল হইত না কি? দেখ দেখি ভাই, হু হু করিয়া তোমাদের খরচের দিকটাই চাপ হইয়া পড়িতেছে কি না? অনিয়মিত নিদ্রা, অনিয়মিত স্ত্রীসঙ্গ, আর অবিশ্রান্ত অর্থ চিন্তা এবং কুটুম্বভরণ চিন্তায় তোমাদের সমস্ত পরমায়ুটুকুই ফুরাইয়া আসিতেছে কি না?

দশহরা—শ্রীরামচন্দ্র এই পুণ্যতিথিতে সেতুবন্ধে শ্রীরামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। কায়িক বাচিক ও মানস দশ প্রকার পাপ (অদত্ত গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার সেবা, পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য, অসম্বদ্ধ প্রলাপ; পরদ্রব্যে লোভ, অন্যের অনিষ্ট চিন্তা ও অসত্যবস্তুর চিন্তা) পাপ-হারিণী ভাগীরথী এই তিথিতে হরণ করেন। তিনি বলেন—সাবধান—খুবই সাবধান, দেখো যেন তোমার মনের কোণেও এরূপ ভাব না আসে যে—যখন দশহরা তিথি আছেন—পাপহারিণী গঙ্গা আছেন, তখন আর

আমার ভাবনা কিসের, এক বৎসরতো আমি যত পারি পাপাচরণ করি॥ তারপর দশহরার দিন একবার গঙ্গাস্নান করিলেই চলিবে, সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে। এরূপ ভাব বড়ই বিষম ভাবি। এ ভাবে পাপের প্রসার আরও বাড়িয়া যায়।

শ্রীশ্রীহিন্দোল লীলা—বর্ণনায় প্রভুর সরস প্রাণের স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষার বেগ দর্শনীয়। ঝুলনে শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর আনন্দলীলা দর্শনের লোলুপতা প্রবন্ধের শেষে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মরমী সাধকের প্রাণের ব্যাকুলতায় তিনি বলেন—আমরাও আজ মানস নয়নে ঝুলনার উপর ঐ যুগলমিলন দর্শনে নয়ন জনম সার্থক করিয়া লই।

সেকালের নন্দোৎসব—প্রবন্ধে কলিকাতা সহরে যখন পাকা ড্রেণ হয় নাই, রাস্তার ধারে ধারে নর্দ্দমা, বাটীর পাশেই গোহাল, তখনকার দিনে গ্রন্থকারের পিতৃদেবের সেই প্রেমগদ্‌গদ পুরাণ পাঠ, মৃদঙ্গ-মন্দিরা মুখরিত সঙ্কীর্ত্তনের সুশ্রাব্য স্বরলহরীর স্মৃতি। বাল্যকালের—নন্দোৎসব। ঢুলিদের নূপুর পরিয়া নাচ, কাঁসারি পাড়ার—নানেদের বাড়ীর—দত্ত বাটীর—দাসেদের বাটীর ছেলেবুড়োর সরল প্রাণের মেলামেশা দাঁড়া কবির গান প্রভৃতি অনেক বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। আক্ষেপ করিয়া লেখক বলেন—বিলাতী বাবু তুমি, এ উৎসবের মর্ম তুমি বুঝিবে না। তোমার উৎসব বাগানের গুপ্তগৃহে কিংবা ক্লাবঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। হলুদ-কাদামাখা অসভ্য আনন্দ তোমার ভাল লাগিবে কেন? তা ভাই তোমার ভাল না লাগে না লাগুক, কিন্তু আমার যেন মনে হয় এই অসভ্যতা মাখানো উৎসব যদি কখনও পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া আসে তবেই তুমি জাতীয় উৎসবের প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারিবে, তবেই আবার নিরানন্দ হিন্দুর মন্দিরে মন্দিরে আনন্দে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে।

মায়ের বোধন—বৈষ্ণবাচার্য্যের লেখনীতে মহামায়া বিশ্ব জননীর নিদ্রা ভঙ্গের রহস্য বড় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে ; শুধু ভাষায় নয় প্রাণের রসে। ভক্তির প্রাণ কেমন করিয়া ভগবতীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া মর্ত্যলোকে চির চৈতন্যময়ীর প্রবোধন করে তাহার চমৎকার চিত্র এই লেখাটি। মায়ের ঘুম ভাঙ্গিবার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে উহার মধ্যে লেখকের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন—ওকি—ওকি,—তোমার অতনু-নিন্দন কুন্দন-তনু কাঁপিয়া উঠিল কেন মা? ওকি—ওকি, তোমার বিদ্রুম-রঙ্গিম অধরোষ্ঠখানি কাঁপিয়া উঠিল কেন মা? ওকি—ওকি, তুমিও অস্ফুট স্বরে মা মা বলিয়া উঠিলে? মা নাম কি এতই মিষ্ট—এতই মধুর, তোমারও বলিতে সাধ হয় মা? তাই বুঝি চুপি চুপি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মা মা—নাম আবৃত্তি করিতেছ মা? না না,—আরতো চুপে চুপে নয়, এ যে সকল শরীর সকল ইন্দ্রিয় সকল মন সকল প্রাণ দিয়া তুমি মা—মা ডাকিতে আরম্ভ করিলে?—ওকি—ওকি, তোমার বিশ্ব-পাগল করা মা মা মন্ত্রে তুমিও পাগল হইয়া গেলে নাকি? হায় হায়! শঙ্করের সোহাগ আদরের কর-বন্ধন অনাদরে ছিনাইয়া ফেলিয়া তুমি যে পাগলিনীর মত আলু থালু-বেশে চঞ্চল-চরণে গৃহের বাহিরেই চলিয়া গেলে?

মা এলো ও মাতৃদর্শন—প্রবন্ধ দুটিও পূজা উপলক্ষেই ১৩১৭ ও ১৩১৮ সালে লেখা। উচ্ছ্বাস ও কাব্যরসে পূর্ণ আবেগময়ী রচনা। প্রকৃতির শোভায় মায়ের আগমন দর্শন। বনের পাখী, গাছের ফুল, নদীর জল, নির্মল আকাশ, শরতের চাঁদ সকলই মায়ের প্রকাশ। সকল সৌন্দর্য্য-সকল স্নেহ, রাজ্যের মাধুর্য্য, রাজ্যের কোমলতা, রাজ্যের সহিষ্ণুতা, একত্র করিয়া মায়ের প্রতিমা।

ব্রহ্মবিদ্যা কাব্যে রূপায়িত। ভক্তের প্রীতি কেমন করিয়া অদর্শনীয়কেও দর্শনের বিষয় করিয়া লইতে পারে উহা বেগময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে

মাতৃদর্শনে। লেখক প্রশ্ন করিতেছেন—"আচ্ছা মা, তুই কি কেবল ভক্তেরই নিকটে অভক্তের নয়? তা তো নয় মা,—ভক্ত অভক্ত সকলেরই তুই নিকটে, তা না হ'লে তুই ব্রহ্মময়ী কিসের? যে সব-চেয়ে বড়—সব চেয়ে ব্যাপক, সেই-ত ব্রহ্ম? তবে আর তুই অভক্ত হ'লেও আমাদের হাত এড়াইতে পারিস কই? ভক্ত না হয় তোকে নিকটে ক'রে নিয়েছে, আর আমরা না হয় তা পারি নাই। তা বো'লে তোর স্বভাব গুণে তুই আমাদের নিকটে না রহিয়া থাকিতে পারিস্ কই? তা তোর ব্রহ্ম স্বভাবেই কি, আর স্নেহের স্বভাবেই কি? তা মা তুই এত নিকট বলিয়াই তো তোকে নয়নের অঞ্জনের মত আমরা দেখিতে পাই না, প্রকৃতির অতীত বলিয়াতো পাই-ই না। দে মা, দে—আমাদের নয়নের গতি ফিরাইয়া দে মা ফিরাইয়া দে—বিষয়ের দিক ছাড়াইয়া নিজের দিকে ফিরাইয়া দে,—ঐ ফিরানো নয়ন দিয়া নয়নের মাঝেই তোর দর্শন লাভ করি।

গৌর পূর্ণিমার জয়, গৌর এল—প্রবন্ধ দুটি ফাল্গুন পূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিত। গৌরলীলা স্মরণ করিয়া মরমী লেখক কি ভাবে নিজেকে সুদূর অতীতে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষাতেই বলি—গৌর পৌর্ণমাসি, তোমাকে দেখিলেই আমরা কেমন আপনহারা হইয়া যাই। এই শোক সন্তাপের রাজ্যই যেন তখন কেমন অমিয়ময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সে কি এক আবেশে কত যে মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাই, তাহা আর কি বলিব? প্রথমেই দেখিতে পাই শান্তিপুর নাথ শ্রীসীতানাথ ভক্ত চূড়ামণি হরিদাসের সহিত উন্মত্ত নৃত্য করিতেছেন,—আর প্রেমভরে ঘন ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়িতেছেন। শ্রীনিবাস, আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া গিয়াছেন। ভুবনময় ভুবনমঙ্গল হরিধ্বনি উত্থিত হইতেছে। জয় জয় উলু উলু ধ্বনিতে নদীয়া নগরীর চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কাংস্য করতাল মৃদঙ্গ মন্দিরা সহকৃত সংকীর্ত্তনের সুমধুর

আরাবে ভাগীরথীর পবিত্র তীর ভরিয়া গিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহার পর আরও দেখিতে পাই,—চারিদিকেই দান পুণ্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে কখনও কিছু দান করে নাই, কোন্ দাতৃ শিরোমণির প্রভাবে জানিনা, সে-ও আজ মুক্তহস্তে দান করিতে বসিয়াছে। দানের কথা অধিক কি বলিব, আকাশের পূর্ণ শশী গ্রহণের ছলে আপনার সমস্ত সুধা ধরায় ঢালিয়া দিয়া—সমগ্র সংসার সুধাময় করিয়া আপনি অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের কারণটি তিনি বলেন—গৌর আমার চুরির দায়ে দেশান্তরী। তোমরা হয়তো জান না; ও চোর গো চোর,—ভারি চোর। সেই ছেলে বেলায় মা-যশোদার মাখন-চুরি থেকে ও'র চুরির কারবার সুরু; তার পর পূতনার প্রাণ চুরি, ব্রজবালার বসন-চুরি, যে দেখে তার নয়ন চুরি, মন-চুরি, প্রণতের পাপ-চুরি প্রভৃতি ক'রে ক'রে বেশ হাতটা পাকিয়ে নিয়ে, করতো কর একেবারে চুরি নয় ডাকাতি—শ্রীবৃষভানু—নন্দিনীর প্রেমের গুপ্ত ভাণ্ডারটাই লুট! এই চুরি আর ছাপা থাক্‌লো না; মুখে মুখে প্রচার হয়ে পড়্‌লো। তখন আর তথায় টেঁকা দায়। তাই একেবারে গা ঢাকা দিয়ে স'রে পড়'তে হোলো; পশ্চিম দেশ থেকে একেবারে পূর্ব্ব দেশ। দেশান্তরী হ'য়েও রক্ষা নাই সদাই ভয়; পাছে কেউ চিনে ফেলে। তাই একেবারে সব ওলোট পালোট ক'রে ফেলতে হোলো,—ছিল কালো, হ'তে হোলো গৌর,—ছিল বাঁকা, হতে হলো সোজা,—ছিল চাঁচর চুল হতে হোলো নেড়া,—ছিল বংশীধারী, হ'তে হোলো দণ্ডধারী,—ছিল গোয়ালা, হ'তে হোলো বামুন। কালোর নাম গন্ধ আর রাখ্‌লে না—কালোর উল্টো গৌর সেজে বস্‌লো! ব্যাপার খানা বুঝ্‌লে কি?

শ্রীশ্রীহোলী-লীলা, শ্রীশ্রীদোললীলা, হোলি হ্যায়, ও ফাগুনের ফাগ খেলা চারিটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ের লেখা একই দোলযাত্রা সম্বন্ধে। লেখক বাস্তবের সঙ্গে কতদূর ঘনিষ্ঠ

ভাব রক্ষা করিয়াও উহারই প্রতি আনন্দ স্পন্দনে অনন্ত লীলাময়ের মধুর সঙ্গ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। কোথায় জনকোলাহল সহরের আবীর গুলালে লালে লাল দোলের আনন্দ নর্ত্তন, আর মধুবসন্তের নবসমাগমে বৃন্দাবনের মাধুর্য্য পরিপূর্ণ নিকুঞ্জ কানন! বর্ণনা চাতুর্য্যে বর্ত্তমান ও অতীত সীমা রেখা হারাইয়া মিলিয়া গিয়াছে হোলী লীলার মাধুরীতে। ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও কিশোরী শ্রীরাধার সখীগণ সঙ্গে ফাগুযুদ্ধ সে কি অভিনব লীলা! পাঠককে পর্য্যন্ত সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিবার আমন্ত্রণ। "ভাই সব! তোমরা একবার এই আনন্দ দৃশ্য দেখিবে না কি? এই নয়ন-জুড়ানো মন-মাতানো দৃশ্য যদি দেখিতে হয়তো একবার বাহিরের নয়ন মুদিয়া ফেল। বাহিরের আলোক নিবাইলেই ভিতরের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেই আলোকে পলক-হীন প্রেম চক্ষে দেখ,—ঐ—ঐ দেখ,—

দোলার উপরি, কিশোর কিশোরী,
দুইজন শোভা পায়।

শ্রীশ্রীদোললীলায় আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনায় তিনি বলেন—শাস্ত্রের কথায় তুমি—"আনন্দঘন" কি না—মূর্ত্তিমান আনন্দ। তরল আনন্দের মূর্ত্তি নাই। তরলভাব ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তরল দুগ্ধে মূর্ত্তি গড়া যায় না, তাহাকে ঘন করিয়া ক্ষীরে মূর্ত্তি গড়া যায়। তরল জলে মূর্ত্তি গড়া যায় না, ঘন জমাট জলে—বরফ খণ্ডে মূর্ত্তি গড়া যায়। তুমিও আনন্দ ঘন—আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তরল আনন্দ ব্রহ্মের মূর্ত্তি নাই; মূর্ত্তিমান আনন্দ বা আনন্দ ঘন, তুমি সেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় স্থান। কলিকাতা সহরে হোলীর কথা বলিতে তিনি ঐতিহাসিক কথা অবতারণা করিয়াছেন। কলিকাতা এখন সভ্য হইয়াছে। তাই অন্যান্য প্রাচীন উৎসবের মত এই হোলী-লীলা

উৎসবও এখন এখান হইতে একরূপ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একদিন এই কলিকাতাতেই এই হোলীখেলার এত মাতামাতি ছিল যে, লাল আবীর বিক্রয় উপলক্ষে লালবাজার নামের সৃষ্টি হইয়াছে। রাধাবাজার হইতে রাধারাণীর পক্ষ হইয়া কতক লোক এবং শেঠেদের শ্যামরায়ের পক্ষ হইয়া কতক লোক বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট আফিসের অধিকৃত বিস্তৃত ভূমিতে সম্মিলিত হইতেন। ঐখানেই উভয় পক্ষের আবীরে তুমুল লড়াই চলিত। আবীরে আবীরে ঐ স্থানটা লালে লাল হইয়া যাইত। পোষ্ট আফিসের পূর্ব্বদিকের দীঘীর জলও লালে লাল হইয়া যাইত; তাই অদ্যাবধি দীঘীটি লালদীঘী নাম ধারণ করিয়া তাহার ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব মরমীয়া প্রভু **ফাগুনের ফাগুখেলায়** শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণেরই ন্যায় অন্তর্মনা হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিলেন তাই তিনি বলেন— ফাগুখেলার উপদ্রবে শ্যাম আর নয়ন উন্মীলন করিতে পারেন না, ইত্যবকাশে কিশোরী যাইয়া তাঁহার হাত হইতে বাঁশরীটি কাড়িয়া লইলেন। সকলেই হো হো উচ্চ হাসি হাসিয়া বলেন,—এইবার ?—এইবার কানু! এইবার ? বাজাও,—কুলনাশা বাঁশী বাজাও ?

শ্যাম আর কি করেন ? একা তিনি, অনেক গোপী, পারিবেন কেন ? হার মানিতেই হইল আর তাঁদের কাছে কবেই বা তিনি জিতিতেই পারিয়াছেন ? শ্যামসুন্দর তখন ফাঁপরে পড়িয়া কাণামাছি খেলার মত দুই হস্ত বিস্তারিয়া বংশীহারিণীকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহার সকল অঙ্গ সকল ইন্দ্রিয়ময়, নয়ন নিমীলনে তাঁহার আর কোন্ কাজটা আটকাইবে বল ? তবে ভক্তের অন্তরে আনন্দ দিবার জন্য তাঁহাকে নয়ন থাকিতেও অন্ধ সাজিতে হইল। ফলে তিনি খানিকক্ষণ কাণা ভাণ করিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাঁশরী সমেত রাই কিশোরীকে ধরিয়া ফেলিলেন, অমনি দুঁহু অঙ্গ পরশনে দুঁহুজনে ভাব-বিবশ হইয়া পড়িলেন। সেই

অপ্রাকৃত যুগলমাধুরী দেখিয়া সখিগণের নয়ন-মন ভুলিয়া গেল।···পাঠক! ওই সেই আনন্দের দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন সার্থক কর।

নাম ব্রহ্মের অবমান প্রবন্ধে প্রভুপাদ প্রাচীন তথ্য সমূহ উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবান যে অভিন্ন ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। দেবতার মন্দিরে চলাচল করিবার স্থানে নিজের নাম বলিয়া ভগবানের নামাক্ষর ব্রহ্ম পাথরে খোদাই করিয়া বসানো হয়, উহা অত্যন্ত দোষের। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করিয়া পরিশেষে সকলের প্রতি সবিনয় নিবেদন করিয়া তিনি বলেন,—কেহ যেন নামের লোভে কোন দেব মন্দিরের চলাচলের পথে আপন নাম মুদ্রিত না করেন। যদি নিতান্ত লোভ সামলাইতেই না পারেন, তাহা হইলে সোপানাদির বদলে দেয়ালের গায়ে খোদিত করিবেন। আর দেবমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের নিকটেও বিনীত প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন যৎসামান্য অর্থের লোভে ধর্মের স্থানে এই ধর্মবিগর্হিত অনুষ্ঠানের সহায়তা না করেন।

দেবতার অবমান—প্রবন্ধটির ভাষা জোড়ালো প্রতিবাদ ব্যঞ্জক এবং উপদেশ পূর্ণ। লেখক বড় দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—আমার পরম স্নেহাস্পদ ঋতুভায়ার,—শ্রীমান ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুদীর দোকানে" বিবিধ স্বদেশী সামগ্রীর মধ্যে একটি সামগ্রী দেখিলাম,—"দেবনামে অনাদর"। সহৃদয় ভায়ার আমার হৃদয়ের ব্যথা দিয়া সামগ্রীটি গঠিত। আমরা যে কথায় কথায় "ধেড়ে কেষ্ট, গোবর গণেশ" প্রভৃতি দেব নামের অবমানসূচক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, শ্রীমান তাহা সহিতে পারেন নাই। শ্রীমান আদি সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম; সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, প্রতিমা পূজার পক্ষপাতী নহেন; অথচ কথাটা বাজিল তাহার অন্তরে। আর তুমি আমি—দেবমূর্ত্তির উপাসক বলিয়া যাহারা পরিচয় দিই

তাহাদের হৃদয়ে এ কথাটা জাগিল না—বা বাজিল-না। কি লজ্জা কি পরিতাপের কথা !

তিনটি বিষয়ের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বাবুদের কলিকাতা শহরে বিলাস কৌতুক আর তাহাদের দেশের বাড়ীতে গৃহ-দেবতার উপবাস এবং অনাদর। দ্বিতীয়তঃ কসাই দোকানে পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তাঁহার কাছে জীব জবাইয়ের জঘন্য ব্যবসা। তৃতীয়তঃ যেখানে সেখানে দেব-দেবীর ছবির অনাদর। সমাজ সংস্কারক প্রভুপাদ সুতীব্র ভাষায় উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

রাম ও শ্যামের বিবাদ প্রসঙ্গে **ভগবান্ ভিখারী** প্রবন্ধে লেখক সকাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, অনেক বিষয়ে সৎসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। রাম বলে—ভগবানের ভিক্ষে নিজের জন্য নয় জীবের জন্য। জীবের প্রতি করুণা ক'রেই তিনি ভিখারী সেজে থাকেন। আরও বলেন—প্রতিবিম্বকে ভাল দেখতে হোলে বিম্বটিকেই ভাল করা দরকার। বিম্বে যাহা কিছু দেওয়া যাবে প্রতিবিম্বে তাহাই দেখতে পাওয়া যাবে। তোমার আসল মুখখানি 'বিম্ব' আর আরসির ভিতরের মুখখানি 'প্রতিবিম্ব', বিম্ব মুখখানিকে সাজাইলেই প্রতিবিম্ব মুখখানিও আপনা-আপনি সেজে উঠে, তাহাকে আর স্বতন্ত্র কোরে সাজাতে হয় না। এইরূপ ভগবান হলেন 'বিম্ব', আর জীব হচ্ছে তাঁহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। জীব ভগবানকে যে সাজে সাজাইবে, আপনিও সেই সাজে আপনা আপনি সেজে উঠবে। বিম্বস্বরূপ ভগবানকে জীব যাহা কিছু আপনি করবে, প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীব তাহা আপনা-আপনি অবশ্যই লাভ করবে।

হামমারা হ্যায় গল্পটির মধ্যে অহঙ্কার এবং অভিমানই যে জীবের একমাত্র বন্ধনের কারণ তাহা এক পালোয়ানের দৃষ্টান্ত দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

দৈব ও পুরুষকার—বিষয়ে চিরকালই বিরুদ্ধ তর্ক চলিয়াছে। কেহ স্বভাবত অদৃষ্টবাদী আর কেহ বা কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া জীবনপথে সগৌরবে অগ্রসর হইয়া থাকে। তত্ত্বকথার বিচার করিতে করিতে অনেক সময় হাতাহাতির উপক্রম হয় প্রবন্ধে উহার আভাস আছে। শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধের গল্পে সব সমাধান। তিনি বুঝাইয়া দিলেন দৈব ও পুরুষকার উভয়েই সমান—উভয়েরই প্রভাব অতুলনীয়।

বুড়ার বড়াই—উপদেশপূর্ণ কথোপকথন মুখে প্রবন্ধ—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্" এই প্রাচীন নীতি অনুসরণে লেখা হইলেও নূতন ছাঁচে ঢালাই করা—।

ছোঁড়ার বড়াই—সেই শ্যাম ও রামের কথাই বটে। দুরন্ত প্রকৃতি লোকের কাছে যমকেও হার মানিতে হয়। রসিক লেখক বৃদ্ধেরা কেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর রসিক হইয়া উঠে আর ছেলেরা কেমন করিয়া বৃদ্ধের বেশভূষা অনুকরণ করে এবং অকাল পক্বতার পরিচয় দেয় তাহার কারণ বলিতে গিয়া যম ও মদনের এক রাত্রিতে একই স্থানে অবস্থানের কথা পাড়িয়াছেন। "প্রথমে যাইলেন যমরাজ। যাইবার ব্যস্ততায় আপনার দণ্ড গাছটি লইতে মদনের ফুলধনুটী লইয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রে দু'জনের দণ্ড ও ফুলধনুটী রাখিয়া দেওয়ায় এই গোল বাধিয়া গেল। মদন আপন ধনু লইতে গিয়া দেখেন কি সর্ব্বনাশ! ধনুর বদলে যমের দণ্ড রহিয়া গিয়াছে। কি করেন? একটা কিছু অস্ত্রশস্ত্রতো সঙ্গে চাই। তাই সেই যমের দণ্ডগাছটা লইয়াই বিষণ্ন মনে গমন করিলেন। ঐদিন হইতেই যম ও মদনের অস্ত্র বিনিময় হইয়া গেল। ফলে হইল কি বুড়ারা হইল যমের অধিকৃত। সেই যমের হাতে পড়িল ফুলধনু। তাই সেই পর্য্যন্ত বুড়াদেরও রস বাড়িয়া গেল। আর ছোকরারা হইল মদনের অধিকৃত। সেই মদনের হাতে পড়িল যমদণ্ড। তাই যত ছোকরার দল সেই পর্য্যন্ত

বাবু বেশ ছাড়িয়া থান চাদর চটিজুতা সার করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দুটি তিনি প্রবন্ধে দিয়াছেন উহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নেই। তিনি বলেন খিলানটা পাকাপোক্ত হইবার পূর্ব্বেই কালবুতটা খুলিয়া লওয়া কি ভাল? বিষ নামিবার আগে ভাগেই তাগার বাঁধনটা খুলিয়া দেওয়া কি কল্যাণকর? গাছের বেগুনটা পুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহার মুখের ফুলটা খসাইয়া ফেলা কি লাভজনক? ১৩১০ সালে প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। তখন শ্রীরঙ্গনাথজির বাজী পোড়ান উৎসব দেখিতে গিয়াও কিভাবে বর্ণাশ্রমের কথা তিনি ভাবিয়াছেন তাহার একটী সুন্দর বর্ণনা তিনি দিয়াছেন। পরমহংসের কথায় রঙ্গনাথজি আসিবার আগে বাজীতে আগুন লাগাইলে সবই মাটি। কথাটিকে বিশ্লেষণ করিয়া পরমহংস বলিলেন,—তোমরাও তাহ'লে যতক্ষণ সেই রঙ্গনাথের সাক্ষাৎকার লাভ না করছো যতক্ষণ না তিনি তোমাদের এক অদ্বিতীয় আরাধ্য দেবতারূপে অন্তরের রত্নাসনে এসে আসন গ্রহণ ক'রছেন ততক্ষণ আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আগুন লাগাইও না। সময় আসিলে বাজীকরের হুকুমে যাহারা আগুন লাগাইবার ভিতর হইতে তাহারাই বাজীতে আগুন লাগাইবে। সেই অগ্নিক্রীড়া দর্শনে স্বয়ং রঙ্গনাথ প্রীত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র দর্শকও আনন্দ অনুভব করিবেন। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে তোমাদেরও ভিতরের রশ্মিতে অন্তর্তেজেই সকল ধর্ম্মের অনল সংকার হইয়া যাইবে।

নকলে সকল নষ্ট ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী গুলি পর্য্যন্ত কেমন করিয়া নকলে সকল নষ্ট হইয়াছে তাহা সুন্দর রসিকতার সহিত বর্ণনা এই প্রবন্ধে।

নুড়ির আওয়াজ—বাজারে নুড়ি ঠুকিয়া নকল পাথর আসল বলিয়া বিক্রয় হয়। লেখক বলেন ঐ যে উপধর্ম্মীর দল তাহাদের চকচকে ধবধবে চটক ওয়ালা বাটিগুলি বাজারে নিয়া বিক্রয় করিতেছে। তাহাও সেই বেদরূপ নুড়িরই জোরে। বেদের দুই চারিটা বড় বড় কথা আওড়াইয়াই না উহারা উহাদের ধর্ম্ম বিক্রয় করে।

চাতক সম্ভাষণ—একটী ক্ষুদ্র চাতকের—কাতর ক্রন্দনে ভক্ত কবি তুলসীদাস ভগবৎপ্রীতির শুদ্ধরীতি শিক্ষা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও বৈষ্ণবাচার্য্য চাতকের ক্রন্দনে শ্রীরামচন্দ্রের করুণা, রাধাশ্যামের লীলামাধুরী, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনের প্রেমের আভাস পাইয়াছেন। সেই অনর্পিত প্রেমের আভাস না পাইলে আর ক্ষুদ্র পক্ষীর অত সাহস, অত আনন্দ আসিবে কোথা হইতে ?

সিমলার বাড়ীতে একটা পোষা কোকিল ছিল। উহাকেও আমরা দেখিয়াছি। উহাকেই **পিঞ্জরের কোকিল** প্রবন্ধের নায়ক করা হইয়াছে। পিঞ্জরে বদ্ধ আবাল্য ব্রহ্মচারী কোকিলেরও পূর্ব্বরাগ বিরহিণীদের উপকার করিবার ইচ্ছা অদ্ভুত অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী কেমন জীব পাখীর সঙ্গে তুলিত হইতে পারে তাহা এই লেখায় দেখান হইয়াছে। পাখীটা আপন পিঞ্জর মুক্ত হইয়া গেল, কিন্তু পিঞ্জরে অবরুদ্ধ তাহার পাখার জোর কমিয়া গিয়াছে। খাঁচার পাখীকে খাঁচায় পূরিয়া রাখা হইল। এখানে পাখীর সঙ্গে লেখক নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রাণের ভিতর হইতে বাঁশীর স্বরে কেবল এই কয়টি কথা শুনিতে পাইলাম—তুমি বৃন্দাবনের পাখী। তুমি সেই মিলনের মূলকেন্দ্র বৃন্দাবনে রাধারাণীর প্রেমের বনে মনে মনে উড়িয়া যাও। অধ্যাত্মবাদী প্রভু বলেন—এখানে তোমার বৎসরে একবার বসন্ত বৈ ত নয়। সেখানে তুমি বারমাসই বসন্ত পাইবে। বারমাসই তথায় প্রকৃতিরাণী ফুলসাজে

সাজিয়া আছেন। বারমাসই তথায় যমুনা, জল, কণবাহী ধীর সমীরণ সঞ্চালিত, বারমাসই তথায় কেলি কুঞ্জ ও কুটির কোকিল কলনাদে মুখরিত। বারমাসই তথায় অন্তরের আশা জাগাইতে পারিবে। বারমাসই তথায় বিরহবিধুরতা বাড়াইতে পারিবে। যাই প্রাণভরা ব্যাকুলতা প্রস্তুত হইয়া যাইবে আর তোমার মিলনের ভাবনা নাই।

বায়স কোপ—প্রবন্ধটির শিরোনামা দেখিয়া মনে হয় বিদ্রূপাত্মক কার্য্যতঃ কিন্তু ইহা একটী দার্শনিক প্রবন্ধ। বিদ্রূপ, রসিকতা, ব্যঙ্গ রসের মধ্য দিয়াও একটী কাকের মহিমা। রামায়ণ, মহাভারত ও দর্শন শাস্ত্রের প্রামাণ্যে কাক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে।

জলিবোট—প্রবন্ধে আনন্দময় ভগবানকে নিরভিমানিতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া পাইতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। জলিবোটের মুখে তিনি বলেন—তোমার ভগবানই কি আর আমাদের আশ্রয়দাতা জাহাজই বা কি! যেখানে যত বড় দেখিবে ক্ষুদ্রকে আদর করিয়াই সকলে বড়। ক্ষুদ্রের কাছে আপনাকে অধিকতর ক্ষুদ্র করিয়াই সকলের বড়। তাই আজ জাহাজের কাছে ক্ষুদ্র আমাদেরও এত আদর। তা বলিয়া মহান্ কখনও ক্ষুদ্র হইয়া যান না। বরং তাহাতে তাঁহার মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে ক্ষুদ্র সে ক্ষুদ্রই থাকিয়া যায়। এই দেখনা কেন জাহাজ আমাদের মাথায় করিয়া রাখিলেও আমরা যে ক্ষুদ্র সেই ক্ষুদ্রই আছি। আর জাহাজ যে মহান্ সেই মহানই আছে। বুঝলে ভাই বুঝলে! জাহাজের এ ভালবাসা গরজের নয় স্বভাবের। বয়ার ভাষা বোঝা কঠিন। সে বলে ভগবান না হইলেও আমার ধাত ধরণটা ঐ ভগবানেরই মত……জল, ঝড়, বাছি না, রৌদ্র, হিম বিচার করি না—একই স্থানে একই আসনে তাঁহাতে উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছি। বাহিরে আমার উপর কত লোকের

কত উপদ্রব। ছেলেরা সব খেলার ঝোঁকে আমার উপর উঠিয়া লাফাইয়া পড়ে। মাঝিরা সব অবিশ্রান্ত লগীর গুঁতা মারে। পদপ্রহার করে তাহার উপর তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত তো চলিয়াছেই আমি কিন্তু অকাতরেই তাহা সহিয়া থাকি। জড়বস্তু বয়াটির মধ্যেও পরম ভাগবত লেখক চিৎবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। বয়া বলে পাঁচজন বিপন্ন আসিয়া আশ্রয় লইবে বলিয়াই আমার মস্তকের উপর একটা মস্ত কড়া আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি। জাহাজ হও, নৌকা হও আর জেলে ডিঙ্গিই হও—ছোট বড়, মাঝারি যে আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, আমাদিগের সহিত যে এক রজ্জুতে আবদ্ধ করিবে আপনা হইতে কাহারও দিকে না চলিলেও আমরা তাহার দিকে চলিয়া থাকি। আর যে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করেনা সে যত বড় জাহাজ বা অন্য কিছু হোক না কেন আমরা তাহার দিকে একচুলও অগ্রসর হই না। ভাগবতের উপদেশের মত বয়ার উপদেশ শুনিয়া লেখক বলিতেছেন—আমরা কেবল ভগবানকেই দোষ দিই, পক্ষপাতি, দয়ারহিত বলিয়া গালি দিই কিন্তু কই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া তাঁহাকে আমাতে মিলিত করিতে একটি দিনও যত্ন করি না?

"ফুটবলের" রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শব্দ পরিচয় লইয়া যে রসিকতা করিয়াছেন, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য মনে করাইয়া দেয়। সেকেলে পণ্ডিত ধরণের কথা কাটাকাটি করিয়া অর্থ আবিষ্কার হইলেও উহার তত্ত্বনিরূপণে অনেক রস উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিচারের পর যে অধ্যাত্মতত্ত্বের মধ্যে পাঠককে প্রবেশ করানো হইয়াছে উহা কিন্তু সাধারণ ফুটবল খেলাই নয়, উহা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে হর্ষশোকময় আসুর ও দেবভাবের দ্বন্দ্ব। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং মন এই এগারো জন খেলোয়ার আসুর ভাব ও দেবভাবে দুই দল হইয়া খেলা করে

জীবাত্মা তাহাদের ফুটবলের মত আর মন তাহাদের গোলকিপার। মনের যোগ্যতার উপরেই এই দেহক্ষেত্রের খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। ইন্দ্রিয় ও মনকে দেবভাবের অনুগত করিয়া খেলাইতে পারো তো আসুর ভাবের হাত হইতে তুমি আপনাকে মুক্তও করিতে পারিবে।

যে বিশুদ্ধ দৃষ্টির প্রভাবে প্রাকৃত জগতের অতি সাধারণ সামগ্রীও অপ্রাকৃত আনন্দ রাজ্যের সমাচার প্রদান করে প্রভুপাদ সেই প্রেমদৃষ্টি প্রভাবে ট্রেণের কামরায় **আলারাম সিগনালকে** পর্য্যন্ত সচেতন করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এই সব জড় পদার্থের মধ্যেও যে চেতনের আলোক সম্পাত দর্শন করা, ইহাদের উপদেশ শুনা প্রভৃতি এটি তাহার একটি রোগ বিশেষ। যখন তখন এই রোগ দেখা দিত। শিকলী বলে—প্রথম দ্বিতীয় মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সাজ সরঞ্জামের বাহ্য শোভার অনেক তারতম্য আছে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন ইতর বিশেষ ভাব নাই।

এই শিকল হইতেছে সূত্রাত্মা বা অন্তরাত্মা। ইহার নাম সকলের মতে সমান নয়। বেদশাস্ত্র এই স্থান ও শিকলকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্' বা 'বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি' প্রভৃতি। শিকলী ফের বলে—দেখ ভাই, যে আমায় দেখার মত দেখে সে আরও বুঝিতে পারে, এই বিরাট ট্রেণের গার্ড বা কর্ত্তা হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই হৃদয়ের শিকলীতে হাত পড়িলেই তিনি ছুটিয়া আসেন। এ রেলগাড়ীর গার্ডের মত যাহার কামরায় হাত পড়িয়াছে, তাহার কামরাতেই ছুটিয়া আসেন। তা তার হাত পড়াটা যে ভাবেই হউক। তারপর ভাবের অনুরূপ ফল দেওয়া তো আছেই। এ রেল গাড়ীর গার্ডের মত তাঁহারও বাঁশী লইয়া কার কারবার।

লেখক লিখিতে বসিয়া গভীর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতেন, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন।

শিকলীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন। তাহার করুণ হৃদয় অজ্ঞানীদের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবিয়াছেন যে অন্ধ পঙ্গু, শিকলী দেখিবার বা ধরিবার যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার দশা কি হইবে? তাহার ভয়-বিপদ বিনাশের উপায় কি? তাহার প্রাণের কথা গার্ডের কাছে পঁহুছাইবার উপায় কি? শাস্ত্র বলেন—সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং নয়নদ্বয়ম্।—হায়, এই সৎসঙ্গ বা বিবেক দুইটি নয়নই যে আমার নাই, তাহার উপর মহা কর্ম্মজড়, আমার দশা কি হইবে? শিকলীর আকর্ষণ প্রণালীই বা কে আমায় শিখাইয়া দিবে? হায়, তবে কি আমার গাড়ীর গতিরোধ হবে না? কৃষ্ণ গার্ডের দেখা কি আমি পাব না? হায়, অন্ধ অসাবধান পাইয়া কামাদি দস্যু যে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া পঙ্গু করিয়া ফেলিল?—এখন আমি করি কি?

লেখকের এই দৈন্য কাতরতা, অসহায় অবস্থা, মরমীর একান্ত অন্তরের কথা। নিরাশ অধ্যাত্মবাদী সত্য সন্ধানে যে অদ্ভুত আন্তর প্রেরণা লাভ করিয়া জীবনের রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই আভাস পাওয়া যায় পরের কথাগুলিতে। তিনি বলেন—সোহাগের সুধায় চুবানো সুরে শিকলি বলিয়া উঠিল, করিবে আর কি,—কাঁদো গার্ডের নাম লইয়া কাঁদো, কেউ না কেউ তোমার হইয়া আমায় টানিয়া দিবেই দিবে। ... ... কান্নার তো রেয়াজ আছে, তাহা হইলেই হইল। এ না হয় বাপ-রে, মা-রে, যাদু-রে, প্রাণ-রে, গেলাম-রে, মলাম-রে প্রভৃতি বোলে কান্না, আর সে না হয় কৃষ্ণরে, নন্দনন্দনরে, যশোদাদুলালরে প্রভৃতি বোলে কান্না। এ আর পারবে না? নাও, কাঁদো—কৃষ্ণবোলে কাঁদো, কৃষ্ণবোলে কাঁদো।

পৃথিবীতে যেখানে যত মরমী সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সকলেরই এই এক স্বর—কাতর প্রাণে প্রিয়তমের জন্য ক্রন্দন এই একটি লক্ষণ সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শ্রীরথ মহাশয়—পুরীধামে জগন্নাথের রথ নন্দী ঘোষ। তাহার জড়মূর্ত্তি চিন্ময়রূপে আবির্ভূত মরমিয়া লেখকের সমীপে। জড়ের চৈতন্যসত্তা উপলব্ধি অধ্যাত্মবাদীর বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সাধনার একটি বিশেষ উপলব্ধির চিত্র এই প্রবন্ধ। নন্দী ঘোষ মানবকণ্ঠে বলেন—শ্রীজগন্নাথ বিভুবস্তু, তিনি তাহার বিভু স্বভাবে এই নীলাচলে থাকিয়াও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন। নীলাচলনাথ! নীলাচলনাথ! বলিয়া ব্যাকুলভাবে যে যেখান হইতে তাহাকে ডাকুক না কেন, তিনি তখনি তথায় আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নীলাচলনাথ রূপেই দর্শন দিয়া থাকেন। তিনি যেমন বিভু, তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা পরিকর, বেশভূষা যানবাহন প্রভৃতিও সেইরূপ বিভু। সুতরাং তাঁহার যেরূপ অন্যত্র প্রকাশ তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধাম প্রভৃতিরও সেইরূপ অন্যত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। বিভু-বৈকুণ্ঠ তত্ত্বের এরূপ অকুণ্ঠ বর্ণনা একমাত্র সত্যকার মরমী ব্যতীত অন্যত্র আশা করা যায় কি?

উপনিষদ্ দেহরথের বর্ণনা করিয়াছেন, উহারই আধারে রথযাত্রার মরমুমি লেখা বিষয়টি অধ্যাত্ম সাধনার দিগ্‌দর্শন করিয়াছে।

ফানুসবাবু নামটি শুনিয়া মনে হয় ঐ নামে কোনো ভদ্র সন্তান গল্পের নায়ক হইবেন আসলে তাহা নয়। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার রাত্রে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ক্রমে জন্মদিনে মরমী প্রভু একটি রংচঙে ফানুষের নামকরণ করিয়াছেন ঐ ভাবে। ফানুষ ঠিক মানুষের মতই এই আত্মহারা আকুল প্রাণ সাধকের কানে তাহার বাণীর অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। দুঃখবাদী মরমীয়ার ভাবে ফানুষ বলে—বাহিরটাই দেখে সকলে, ভিতরটাতো তেমন দেখা যায় না। বাহিরে হয়তো ফিটফাট্ বাবু, ভিতরে কিন্তু দাউ দাউ দাবানল,

সহজে কে বুঝিবে বল? ভিতরে আগুন জ্বলিলে আবার কাহারও স্থির থাকিবার জো নাই, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেই হয়; তা সে আগুন যে প্রকারই হউক। সমুদ্র অবিশ্রান্ত অস্থির এই আগুনের দায়ে, পৃথিবীরও বিরতিহীন পরিভ্রমণ কিংবা থাকিয়া থাকিয়া কম্পন, ভিতরে আগুন আছে বলিয়া। জঠরের হুতাশন বিশ্ববাসীকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে, কামের অনলেও কত জীব ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইতেছে। অমন যে ভগবানের ভক্ত যাঁহাদের অন্তরে শান্তির অমৃত প্রস্রবণ, তাঁহাদেরও এক প্রকার অনলেরই প্রেরণায়,—জগজ্জীবের দুরন্ত দুঃখদুর্গতি দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের মাঝে যে দারুণ আগুন জ্বলিয়া উঠে উহারই প্রেরণায়। বিরহের বহ্নিতাপে প্রেমিকের চিত্তও চঞ্চল বিকল করিয়া তুলে, তাই সেই প্রেমের ঠাকুরকেও কখনও জলে গিয়া ঝাঁপ দিতে হইয়াছে কখনও বা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। আর আমি যে ফানুবাবু, বাহির চটক যতই থাকুক, আমারও ভিতরে একটা আগুন সদাই জ্বলিতেছে তাই আমাকেও প্রায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

ফানুবাবুর মুখে ভক্তিরহস্য, গুরুকৃপা, সৎসঙ্গ, ভক্তের দর্শন, সাকার নিরাকার অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফানু বলে—যে ষ্টীম বা ধূমের (ভক্তি) সাহায্যে আমরা তোমাদের হাত ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া যাই, সেই ষ্টীম (ভক্তি) যদি পূরাপূরি না হয় তাহা হইলে একটু উঠিয়াই আমাদিগকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। এই দেখ না ভাই, আমারই দশা কি হইয়াছিল? ষ্টীম বা ধূম কিছু কম পড়িয়াছিল বলিয়াইত উপরে উঠিয়াও আবার আমাকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। তোমার এই পিয়ারা গাছের উপর নিরুপদ্রব স্থানে বসিয়া আমি গুরুদত্ত দীপের সাহায্যে শক্তি সংবর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছি, এইবার ষ্টীম পূরা হইয়া উঠিয়াছে, উপর

হইতে প্রবল টান ধরিয়াছে আর আমার এখানে থাকিবার যো নাই। ভাই, কিছু মনে করিও না, আমি চলিলাম।

সাধকের উত্থান পতনের চিত্র, গুরুকৃপার মহিমা, একান্তে বসিয়া নিরুপদ্রবে শক্তি সঞ্চয়ের ইঙ্গিত কি ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা চিন্তনীয়।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ—ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইলেও ইহাতে আপাত দৃষ্টিতে লাভ লোকসানের অন্তরালে যে বিরাট রহস্য রহিয়াছে উহার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যায় সাধকের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। **মনোজয়ের সহজ উপায়**—এক ব্রাহ্মণের উপাখ্যানে বেতালকে বশীভূত করিবার অভিনব চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মণ একটি লম্বা বাঁশের একশত আটটি পাব গণনা করিয়া উঠা নামা করিতে বলায় বেতাল পরাজয় স্বীকার করে। গল্প বলিয়া আসল শিক্ষাটি যাহা দেওয়া হইয়াছে উহা প্রভুর ভাষাতেই বলি—আমাদের মন হইতেছে এই বেতালের মত। আমরা যদি তাহাকে খাটাইয়া লইতে পারি তবেই সে খাটিবে, নচেৎ সে-ই আমাদিগকে খাটাইয়া লইবে। মনের গতি সর্ব্বত্র অবারিত। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশ-পাতাল স্বর্গ নরক সকলই ঘুরিয়া আসিতে পারে। সে ভারি চঞ্চল। কি করিব—কি করিব করিয়া সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাগোল করিয়া তুলে। ফরমাস করিয়া করিয়া তাহাকে আর কাবু করা যায় না। আদেশ পাইলে সে আমার কাছে সকলই আনিয়া হাজির করিয়া দেয়। আমরা মনে মনে কি না দেখি, কি না শুনি, কি না পাই, কোথায় না যাই? তাহার ফরমাসের দায়েই আমরা সর্ব্বদা অস্থির। এখন ইহাকে যদি একবারে রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহারও সহজ উপায় আছে। সে উপায় অষ্টোত্তর শত পর্ব্বযুক্ত বংশের মত একশত আট মণিযুক্ত জপের মালা। তুমি যদি মনকে সহজে জয় করিতে চাও,—তবে তাহাকে এই নামের মালায় উঠা নামা করাও, আর যখন আবশ্যক পড়িবে তখন তাহাকে দিয়া অপর

কার্য্যও করাইয়া লও। ইহাতে সে তোমার বশীভূত থাকিবে। তাহা না হইলে সে-ই তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইবে,—তোমাকে মনের অধীন হইতেই হইবে। তাই বলি ভাই, যদি সহজ উপায়ে মন জয় করিবার বাসনা থাকে, তবে এই একশত আটটী মণিতে গাঁথা নামের মালা আশ্রয় কর,—তাহাতেই মনকে নিযুক্ত রাখিয়া দাও। সে অনুলোম—বিলোম ক্রমে তাহাতেই উঠা নামা করিতে থাকুক, তাহাকে জয় করিবার জন্য আর চিন্তা করিতে হইবে না।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্কের সমাধানরূপে গবেষণাপূর্ণ এই গ্রন্থ। ১৩১০ সালে বান্ধব পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় রায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ বিষয়ে বলিয়াছেন—পুস্তকের মুখ্য কথা শ্রীগৌরাঙ্গ—দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জাতি নির্ণয়। কেহ বলেন, ঈশ্বরপুরী জন্মসম্পর্কে শূদ্র, কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ। ইহার কোন্ কথা সত্য? গ্রন্থকার গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মণত্ব পক্ষ প্রতিপাদনে যত্নপর হইয়াছেন এবং আপনার সে সদুদ্দেশ্য সাধনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। প্রতারিত হইয়া পুরী মহাশয়কে আমরাও এতকাল শূদ্র মনে করিয়াছি কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে মুহূর্ত্তের তরেও কুণ্ঠিত নই যে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর এই গ্রন্থ পাঠে আমাদের সেই সংস্কার একেবারে উন্মুলিত হইয়াছে।

পূজার গল্প—প্রভুপাদ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী রচিত 'পূজার গল্প' গ্রন্থটী ১৩১৬ হইতে ১৩১৯ পর্য্যন্ত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত পূজাসংখ্যায় চারিটি গল্প সঙ্কলন। (১) সদানন্দের সন্ধিপূজা, (২) মনে মনে মায়ের পূজা, (৩) মুখুয্যে মশাই ও (৪) তারাসুন্দরী।

সদানন্দের সন্ধিপূজা—এই গল্পে তিনটী চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সদানন্দ, শ্যামাসুন্দরী ও যোগানন্দ। সদানন্দ গল্পের নায়ক।

তিনি সরল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাচারনিষ্ঠ ও শক্তি উপাসক। হালিসহর নিবাসী। গ্রামের জমিদারের সভাপণ্ডিত। আয়ের পথ ছিল ব্রহ্মোত্তর বৃত্তি ও যজমানের কাজ। সহধর্ম্মিণী জগত্তারিণী (সাতটী সন্তানের মা হইলেও) পতিব্রতার মাধুর্য্যে ও স্বভাবের সৌন্দর্য্যে সুদুর্লভ স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তা তাহার দেহে বিকশিত। পাঁচটী সন্তানই অকালে বিদায় নিয়েছে। বর্ত্তমানে দুইটী আছে পুত্র যোগানন্দ ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্যামাসুন্দরী।

যোগানন্দের চরিত্র বিচিত্র। দুর্ব্বৃত্ত, মাতাল ও খুনী। শক্তি উপাসক হইলেও সঙ্গদোষে পঞ্চ-মকার উপাসনা বলিতে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, (মদের চাট) ও মৈথুনকে বুঝিয়াছিল। অল্পবিদ্যা তাহাকে অপব্যাখ্যা করিবার সুযোগ দিয়াছিল।

শ্যামাসুন্দরী বালবিধবা। কুসুম লোভনীয় যৌবন লাবণ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের দীপ্তি থাকিলেও জীবনটী তাহার সঙ্গিহীনতার ব্যথায় পূর্ণ।

পুত্র যোগানন্দ ও কন্যা শ্যামাসুন্দরীর এই দুঃখময় জীবনের স্পর্শ ঈশ্বর-বিশ্বাসী সদানন্দকে নিজ আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

সদানন্দ দুর্গাপূজায় গ্রামের জমিদার ও প্রজাবর্গের নিকট হইতে যথাসাধ্য সাহায্য পাইতেন। শ্যামাসুন্দরী ও জগত্তারিণী পূজার কয়দিন রান্না, পূজার উপচার সাজানো প্রভৃতি কাজ করিতেন। সদানন্দ পূজা লইয়াই মশ্‌গুল্। জাঁকজমকহীন পূজা। সার্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা ও ঘৃতপ্রদীপ। এই দুই-ই পূজার বাজনা আর আলোক। সদানন্দ সন্ধিপূজায় বসিলেন। মৃন্ময়ে চিন্ময় দর্শনে সদানন্দ তন্ময়। 'তারা তারা মা মা' ভক্তের আকুল কণ্ঠের ধ্বনি পূজামণ্ডপ, বৃক্ষবল্লরী, আকাশ বাতাসে খেলিতে লাগিল। জমিদার বাড়ীর কামান দাগাতেও মা মা ধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল। সদানন্দ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। দেবীর চামুণ্ডা মূর্ত্তির পূজায়

ব্রাহ্মণ সেইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে তাহার জগত্তারিণী ও শ্যামাসুন্দরী দীপ মালিকা প্রজ্বলিত করিতেছে।

মাতাল যোগানন্দ খেয়ালে টলিতে টলিতে অজ্ঞাতসারে বাড়ীতে পূজামণ্ডপের একদিকে হাজির। তারা-তারা মা-মা ধ্বনিই তাহার হৃদয়কে আকুল করিয়াছিল। তাই সে আসিয়াছে। যোগানন্দ মাতাল হইলেও তারা নামে মা নামে প্রাণঢালা অনুরাগ। তাই ভুবনমোহিনীর ভুবন ভরা রূপ, যোগানন্দ দেখিতে লাগিলেন। ছবির মত তাঁহার চোখের সামনে মায়ের ভীষণামূর্ত্তি প্রকটিত হইল। চোখ বুজিয়া থাকিলেও যোগানন্দ ভিতর বাহিরে একই রূপ দেখিলেন। যোগানন্দের পশুভাব বিমোচনের জন্য মা চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে নয়ন বুজিলেও তাহাকে শাসাইয়া বলিতেছেন, "সাবধান আমার নামে কলঙ্ক—আমার দোহাই দিয়া অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান? এখনও সময় আছে, সাবধান যোগানন্দ! সাবধান!" যোগানন্দের বুকের ভিতরে একখানা প্রকাণ্ড পাথর সরিয়া গেল। স্নিগ্ধশীতল আলোভরা করুণাময়ী দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি সহাস্যবদনে তাহাকে কাছের লোক হইতে বলিতেছেন। এদিকে সদানন্দের পূজাও চলিতেছিল। পূজামণ্ডপে জগন্মাতার এই বিমোহিনী রূপ মহিমায় স্তম্ভিত যোগানন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সিক্তকণ্ঠে মা মা বলিয়া আরতি দেখিলেন। সকলের প্রণামের সঙ্গে যোগানন্দও মাকে প্রণাম করিলেন। প্রণতিই তাহার ক্ষুদ্রতা হীনতা দীনতার পূর্ব্ব স্মৃতিকে স্মৃতিপথে জাগ্রত করিল। বাবা, মা, পাড়াপ্রতিবেশী সকলকেই তো আমি দিয়াছি বেদনা। যোগানন্দ ভাবিলেন, বাপ মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিব কি করিয়া? চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া যাইবার নয় এই দেহ? পাপময় ঘৃণিত দেহকে সন্ধি পূজায় বলি দেই। যোগানন্দ দুঃখে ধিক্কারে অনুতাপে কোমরের ভুজালি নিজগ্রীবায় বসাইলেন। পশুপাশ ছিন্ন হইবে ভাবিয়া জয় মা-তারা জয় মা বলিয়া শাণিত ভুজালি গ্রীবায় সজোরে আঘাত

করিলেন। সদানন্দ মাকে প্রণাম করিয়া পূজাসনে বসিয়া পরিচিত কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইলেন। শ্যামাসুন্দরী, জগত্তারিণী ও সদানন্দ আসিয়া দেখিলেন এই ভয়াবহ অবস্থা। সদানন্দ ধরাধরি করিয়া পুত্র যোগানন্দকে মায়ের সম্মুখে লইয়া গেলেন। সদানন্দ পুত্রকে কখনও দুর্ব্বাক্য বলিতেন না। নীরবে মায়ের কাছে পুত্র যোগানন্দের কল্যাণ কামনায় সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিয়া বলিতেন, "মা! এই অজ্ঞানের সকল দোষ সকল অপরাধ ক্ষমা কর মা! নশ্বর বিষয় রস ভুলাইয়া তোমার শাশ্বত অমৃতরসের আস্বাদনে ইহাকে আনন্দিত কর মা!"

পিতার স্নেহধারা রুদ্ধ ছিল নিম্নগামিনী হইয়া বাহির হইল। হাত বুলাইয়া যোগানন্দ বলিয়া ডাকিলে কোনও উত্তর পাইলেন না। সদানন্দ এদিকে মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মায়ের বক্ষঃস্থল ক্ষত। ভক্তিমান্ সদানন্দের মন পূজার অনিয়ম হইয়াছে বলিয়া ভাবিত হইল। পত্নী জগত্তারিণী চীৎকার করিয়া বলিলেন, যোগানন্দ কি প্রলাপ বকিতেছে। সদানন্দ দেখিলেন, দিব্য জ্যোতিতে মুখমণ্ডল পূর্ণ। আর গম্ভীরস্বরে বলিতেছে, যোগানন্দ কে? তোরই তো পুত্র? তুই আমার, আমিও তোর, তোর যোগানন্দ আমারও বটে। তোর সম্বন্ধ ধোরেই আমি তাহাকে অহরহ আপদ বিপদ হইতে আবরিয়া রাখি। তার উপর সে যখন আমায় মা মা বলিয়া ডাকে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর সোহাগ মাখা মাতৃ সম্ভাষণের মত আমার তাহা বড়ই মিষ্ট লাগে। তাই আমি আজ আপন বক্ষ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছি। ভুজালির প্রহার তাহার গলায় না লাগিয়া আমার বুকেই বাজিয়াছে।" যোগানন্দ নিদ্রা ভঙ্গের ন্যায় জাগিয়া বসিল।

মনে মনে মায়ের পূজা—গল্পাংশটি এইরূপ-ব্রহ্মানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ চাকুরী স্থান হইতে পত্নী ও পুত্র

সমভিব্যহারে দেশের বাড়ী যাইতেছেন। পূজার সময় ঝড়ের মুখে নদীর বুকে নৌকাডুবি। কে কোথায় গেল তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ব্রহ্মানন্দ জেলেদের জালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তীরে আনিত হইলেন। দুনিয়াদাস বাবাজী পরোপকারী আদর্শ সাধু। তাঁহারই যত্নে ব্রহ্মানন্দ ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন তাঁহারই কুটিরে। পূজা আসিয়া পড়িল। ব্রহ্মানন্দ চিরাচরিত পূজা এবার হইল না ভাবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সাধু দুনিয়াদাসের উপদেশে তিনি মনে মনে মায়ের বোধন হইতে নবমীবিহিত পূজা শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। বিজয়া দিনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ব্রহ্মানন্দকে লইয়া দুনিয়াদাস জমিদার বাড়ীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখাইতে নদীর ধারে যান। সেখানে পুত্র শিবানন্দ তাহার পিতাকে সাধুর সঙ্গে তীরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। ব্রহ্মানন্দ তারা ব্রহ্মময়ীর অপার করুণায় পত্নী শান্তি ও পুত্র শিবানন্দের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন। তাহাদের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গিয়াছিল, জলে ডুবিয়া যায় নাই বলিয়া রক্ষা পাইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দের একাগ্রতা, প্রাণের সৎসঙ্কল্প, পূজার আবেশ এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুনিয়াদাস বাবাজী হইলেও ব্রহ্মানন্দের শক্তিসাধনার সমাদর করিয়া অভিনব সদয় ভাব এবং হৃদয়ের প্রসারতার পরিচয় দিয়াছেন, মানস পূজার উপযোগিতা, আদর্শ ও সফলতা দর্শনীয়।

মুখুয্যে মশাই—পুরা নাম হরিহর মুখোপাধ্যায় গেঁজেল বলিলে অত্যন্ত ছোট কথা হয়। ইহার যে নেশার আড্ডা তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বহু গবেষণা। সে যে কত রঙ্গ কত রস তাহা সেই আড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলে কাহারও সাধ্য নয় যে উহার চমৎকৃতি ব্যাখ্যা করে। জলপথে স্থলপথে কত বিচিত্র অভিযান। এরূপ গবেষণা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন যে ডক্টর উপাধির জন্য দেওয়া হয় নাই তাহাই ভাবিবার বিষয়। বাড়ীতে মায়ের প্রতিমা গড়া হইয়াছে—রং লাগানো হইয়াছে। শুভ ষষ্ঠী। চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের সজ্জিত মূর্ত্তি। সন্ধ্যাকালে মায়ের শুভ গন্ধাধিবাস হইয়া গেল। রাত্রি হইয়াছে কোথাও কেহ নাই। আছেন কেবল মা, আর দুই পার্শ্বে দুইটী প্রজ্জ্বলিত ঘৃত প্রদীপ। এমন সময় মুখুয্যে মশাই নেশার ঘোরে সেখানে আসিলেন। মায়ের সম্মুখে 'আবোল তাবোল বকিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বলেন—দ্যাখ্ মা আমি মাতাল হই যাই হই আমার মনটা বড় সাদা, আর দ্যাখ্ মা আমার দালান টালান যা কিছু সকলই সাদা, তুই বেটি! কেবল পাঁচরঙ্গা হয়ে থাকৃবি, তা কি কখনও হয়? আমি থাকতে কিছুতেই তা হ'তে দেবো না। এই বলিয়া নেশাখোর মুখুয্যে মশায় সেই সজ্জিত প্রতিমার আগাগোড়া চুণকাম করিয়া ফেলিলেন।

পরদিন মুখুয্যে গৃহিণী মহামায়া প্রতিমার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখে সন্তাপে অর্দ্ধমৃত হইয়া গেলেন। প্রতিমার আর পূজা হইল না। ঘটেই পূজা হইল। মহামায়ার অনুরোধে পূজার কদিন মুখুয্যে মদ খান নি। মহামায়া কিছুদিন পর পরলোক গমন করিলেন। তখন মুখুয্যে মশায়ের পরিবর্ত্তন আসিল। তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। সেখানে সাধুসঙ্গ প্রভাবে তিনি এখন সারাদিন মা মা বলিয়া কাঁদিয়া পাগল। জাগতিক নেশার শেষ হইয়াছে। এখন তাঁহার অধ্যাত্ম নেশা। নেশাখোরের নিখুঁত ছবি। আদর্শ গৃহিণী মহামায়া।

তারা সুন্দরী—বিশ্বরঞ্জন বিদ্যাভূষণ একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইঁহারই কন্যা মাতৃহারা তারা সুন্দরী। বিদ্যাভূষণের কৃতিছাত্র শ্যামাকান্তের সঙ্গে তারার বিবাহ হইল। বিবাহের পর শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের টোল হইতে বিদায় লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কাশীধামে যাইয়া

বেদান্ত পড়িতে লাগিল। তারার যৌবনের সৌন্দর্য্যে গ্রামের জমিদারের লোভ পড়িল। দুর্দ্দান্ত কুচক্রী জমিদার নানাপ্রকার জাল পাতিয়া তারাকে ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করে। এমন কি বিদেশগত তারার পতি শ্যামাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রটনা করে দুষ্টা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া তারাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। তারা আদর্শ পিতার আদর্শ চরিত্র কন্যা। সে প্রলোভনে মুগ্ধ হইবার নয়। শ্যামাকান্তের দাদা কাশীতে যাইয়া ভাইয়ের সন্ধান করে। শারদীয়া পূজা। মহা নবমীর নিশায় বিদ্যাভূষণ যখন মায়ের ধ্যানে নিমগ্নচিত্ত তারা সুন্দরী যখন পিতারই সমীপে বসিয়া—তখন দুর্বৃত্ত জমিদার লোকজন লইয়া বিদ্যাভূষণের গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয় উদ্দেশ্য ব্যস্ততার সময় তারাকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া। পিতা ও দুহিতা বিশ্বজননীর আনন্দ মূর্ত্তির ভাবে বিভোর। আগুন লাগিবার সংবাদ তাহারা রাখে না। নিজেদের আগুনে দুর্বৃত্তেরা নিজেরাই পুড়িয়া মরে। সকাল বেলা সমাধিভঙ্গে ব্রাহ্মণ চণ্ডীমণ্ডপের বাহির হইলেন। প্রাতঃকৃত্য করিয়া দশমী পূজার আয়োজন করিতেছিলেন। তারা তখনও নিদ্রার আবেশে ছিল। তাহাকে ডাকিতে সে জাগিয়া উঠিল সে বলে—বাবা! বাবা! মায়ের মুখে ফুঁ দিয়া দাও বাবা ফুঁ দিয়া দাও। আহা মা আমার অনেক আগুন খাইয়াছেন; বাবা অনেক আগুন খাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন রাত্রে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে জগদম্বাই তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দশমী দিনে সন্ধ্যার সময় বড়দাদাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামাকান্ত দীর্ঘ অদর্শনের পর বিদ্যাভূষণের গৃহে ফিরিয়া আসিল। তারার মুখে হাসি দেখিয়া বিদ্যাভূষণ অভীষ্ট লোকে চলিয়া গেলেন।

বিদ্যাভূষণের চরিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার সহিষ্ণু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিঁখুত আদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। টোলের পণ্ডিতগণ আজিকার দিনেও যে জাতীয় ত্যাগ এবং পবিত্রতার ভিত্তির উপর তাহাদের শাস্ত্রচর্চার সুদৃঢ়

মন্দির রচনা করেন তাহার একটি অনিন্দ্য চিত্র বিদ্যাভূষণের গৃহে। দুর্বৃত্ত জমিদার প্রেরিত স্ত্রীলোকটির সহিত আলাপ প্রসঙ্গে তারাসুন্দরীর বাক্যে আদর্শ পতিব্রতার তেজ এবং দৃঢ়তা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সব কিছুর উপরে জগদম্বার অনির্ব্বচনীয় করুণা কটাক্ষ গল্পটির পরিণাম যেভাবে করিয়া দিয়াছে উহা বিশ্বাসীর অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দেয়।

ভক্তের জয়—উৎকল ভাষায় প্রচারিত দার্ঢ্য-ভক্তি রসামৃত নামক ভক্তমাল হইতে ভক্তচরিত্র সঙ্কলন। এই গ্রন্থের তিনটি উল্লাস পর পর প্রকাশিত। প্রথম উল্লাসে গণপতি ভট্ট প্রভৃতি আটটি, দ্বিতীয় উল্লাসে গৌরচন্দ্র প্রভৃতি এগারটি এবং তৃতীয় উল্লাসে চতুর্দ্দশটি ভক্ত চরিত্র মধুর ভাষায় উপবর্ণিত। এই গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এই ভক্ত চরিত্র কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থের হিন্দী, গুজরাটি ও কোনো কোনো চরিত্রের ইংরাজী অনুবাদ। বন্ধু মহান্তীর চরিত্রকে "দীনবন্ধু" নামে যাত্রার পালায় পরিণত করা হইয়াছে, রাম বেহারার চরিত্রটি মুচীরাম দাস নামে পদ্যগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। রঘু অরক্ষিত প্রভৃতি চরিত্রগুলি ভক্তের ভগবান নামে সরল পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আরো অনেক পাঠক ব্যাখ্যাতা শাস্ত্র উপদেষ্টা মৌখিকভাবে এই সকল চরিত্র অবলম্বনে তাহাদের উপদেশ প্রদান করিয়া এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের গৌরব প্রচার করিয়াছেন।

চরিত্র অঙ্কনে প্রভুপাদ যেরূপ মাধুর্য্য ও রসপরিবেশনে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে অননুকরণীয়। প্রাকৃতদৃষ্টি সমালোচকের প্রত্যুত্তরে তিনি প্রথম উল্লাসের দ্বিতীয় বারের বক্তব্যে বলেন—লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাই কোন কোন সমালোচকের সমালোচনাতেও দেখিতে পাই, এই গ্রন্থগত চরিত্রগুলি অতি-প্রাকৃত—ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ভগবান এবং ভক্তের চরিত্রতো অতি-প্রাকৃত বা

অলৌকিক হইবারই কথা। ভগবান প্রকৃতির অতীত, তাঁহার শক্তিতে সম্পন্ন ভক্তও তাঁহারই মত প্রকৃতির অতীত। সুতরাং এই প্রকৃতির রাজ্যের সাধারণ লোকের সহিত ভক্ত বা ভগবানের চরিত্রগত একতা কখনও হইতেই পারে না, চিরদিনই তাহা লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন হইবেই হইবে। কাহারও বিশ্বাস অবিশ্বাসের মুখাপেক্ষা করিয়া তাহা কখনও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। যে ভাগ্যবান সে-ই ভক্ত ও ভগবানে এবং তাঁহাদের অলৌকিক আচরণে বিশ্বাস করিতে পারে, অপরে তাহা পারিবে কোথা হইতে?

বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তাহাও স্থানে স্থানে গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন। নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল বাঙ্গালী পাঠকের সহজবোধ্য নয়। সেই গ্রন্থের প্রিয়দাসকৃত হিন্দী টীকা অবলম্বনে লালদাস অপর নাম কৃষ্ণদাসের বাংলা পদ্যে ভক্তমালগ্রন্থ (প্রভুপাদ অতুল ও প্রভুপাদ বলাইচাঁদ সংস্করণ দেখ)। এই ভিন্ন অপর ভক্তমাল নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চরিত্র অঙ্কননৈপুণ্যের কথা তো আর বলিবারই নয় যে সকল ক্ষেত্রে প্রভুপাদ তাঁহার জীবনের সাধনার আলোকে নিজের প্রাণের আবেগ ঢালিয়া দিয়াছেন উহা যে কত মধুর হইয়াছে তাহা পাঠকমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ।

বেশ্যা সঙ্গী **বলরাম দাসের** প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা দর্শন করিয়া গ্রন্থকার বলেন—প্রভু, সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে প্রমত্ত জীবের তো পদে পদে পদস্খলন হইবারই কথা। সেই হতভাগ্য পতিত জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া না থাকিলে কি আর তোমায় পতিত পাবন বলিয়া কেহ ডাকিত, না কেহ তোমার বিশুদ্ধ ভজনপথ অবলম্বন করিত? নিরপরাধের প্রতি করুণা তো সকলেই করিয়া থাকেন।

সাপরাধের প্রতি করুণা বিতরণ করাই না কঠিন! সে শক্তি কি সকলের আছে? সাপরাধ জনেও তোমার এই অবাধ করুণার ধারা বর্ষণ হইতে দেখিয়া আমাদের কেবল শ্রীরূপগোস্বামিপাদের এই মহাবাক্যই মনে পড়ে,

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্ বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্॥

আর সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারের মধুর ঝঙ্কার আমাদের কানের কাছে বাজিয়া উঠে,—

ঈশ্বর স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে, আত্মপর্যান্ত প্রসাদ॥

দীনবন্ধু দাসের ন্যায় অকপট অতিথি-সেবক গৃহস্থের চরিত্র বর্ণনার পর গ্রন্থকার বলেন—এবার জয় ঘোষণা করিব গার্হস্থ্য আশ্রমের এই আশ্রমেই না এই অমৃতোপম অতিথিসেবার ব্যবস্থা। এই অতিথি সেবাই না ভগবানকে কোন্ অমৃতধাম হইতে অতিথির বেশে আকর্ষণ করিয়া আনিল। ভাই গৃহী, তোমার আশ্রমে যখন অতিথি-সেবা রহিয়াছে, তখন তোমার ভয়ই বা কি, আর ভাবনাই বা কি? তুমি শ্রীহরির প্রীতি কামনায় অতিথির কামনা পূর্ণ করিও। ক্ষমতায় না কুলাইলে, দুইটী মিষ্টকথা বলিয়াও তাহাদের সন্তোষ সম্পাদন করিও, দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে, দীনবন্ধুদাসের মত তোমার দ্বারেও একদিন অনাথনাথ অতিথি বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন!

ব্রহ্ম অরক্ষিতে তিনি বলেন—যদি বিশ্বাস কর তো সততই তাঁহার দয়ার হস্ত ইতস্ততঃ দেখিতে পাইবে, করুণার অমিয় ঝঙ্কারে কর্ণযুগল শীতল করিতে পারিবে। বিশ্বাস কর মন! বিশ্বাস কর। ঈশ্বরে তাঁহার

শক্তিতে—তাঁহার অলৌকিক আচরণে বিশ্বাস কর মন। বিশ্বাস কর। তাহা হইলে তোমাকে আর তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

কৃষ্ণপ্রিয়ার জড়িত অক্ষরে দানপত্রখানি লেখা হইলেও প্রভুপাদের ভাষায় উহা পরিষ্কার বুঝা যায়—

ওহে জগতস্বামি !
এ বিশ্ব সংসার সকলি তোমার
তোমারে কি দিব আমি ॥
শুধু মনটি তোমার নাই।
যত গোপনারী রেখে দেছে হরি
তাহাতো তোমার চাই ॥
এই ধর নাও মন।
দিয়া হ'নু দাসী নীলাচল শশি
দানপত্র এ লিখন ॥

গৌরচন্দ্র চরিত্রে—ধর্মরাজার ভগবন্নিষ্ঠা পরমেশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুত্র গৌরচন্দ্রেরও ত্যাগ নিষ্ঠার সুপরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। একটু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও উহার বর্ণনা হৃদয় গলানো। ভগবানের মন্দিরে দর্শন করিতে আসিয়া বহুলোকের মাঝে এক সাধু প্রাণত্যাগ করেন। রাজা আসিয়া নিজের শাসননীতির দোষ বুঝিতে পারিয়া মন্দিরে ভগবানের শরণাপন্ন। দেবতা শ্রীরামেশ্বর স্বপ্নে নির্দেশ দেন রাজার একমাত্র পুত্রকে শূলে নিক্ষেপ করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইবে। রাজা পুত্র ও পত্নীর নিকট সেই কথা জানাইলে পুত্র গৌরচন্দ্র অনায়াসে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাহার কথা—হায় আমার কি এতই ভাগ্য হইবে, শ্রীরঘুবীর আমায় আত্মসাৎ

করিবেন? এই মর্ত্ত্যধামে দেহ ধারণ করিয়া না মরিয়া কে-ই বা থাকিতে পারে? কেহ আগে কেহ বা পাছে গমন করে এই মাত্র; কিন্তু নিশ্চল হইয়া কেহই নাই।···মাগো! তুমি আর বিলম্ব করিও না; আমায় লইয়া চল, প্রভুর সম্মুখে শূলের উপর চাপাইয়া দিবে চল।

জগদ্বন্ধু মহাপাত্র—রাজা প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক জগন্নাথ সেবক। একদিন রাজা মন্দিরে আসিলে নিজের মাথার ফুল লইয়াই জগন্নাথের ফুল বলিয়া রাজাকে নির্মাল্য দেন। উহাতে মাথার চুল লাগিয়াছিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কারণ অনুসন্ধান করেন। মহাপাত্র সত্য কথা গোপন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন জগন্নাথের মাথায় চুল উঠিয়াছে। রাজাজ্ঞায় পরীক্ষার আয়োজন হইল। মহাপাত্রের একান্ত কাতর প্রার্থনায় সত্যসত্যই জগন্নাথ কেশ ধারণ করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষা করিতে আসিয়া কেশাকর্ষণ করিতে রক্তোদ্গম হইল। তখন ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথ কেমন করিয়া ভক্তের অনুরোধে অসম্ভবও সম্ভব করেন সে সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

গোবিন্দ দাস—সংসার বিরাগী তীর্থযাত্রী। তাহার মনের ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে তাই সে বলে—ছার সংসার রসে রসিয়া থাকিয়া কি না সেই সারাৎসার শ্রীহরিকে ভুলিয়া রহিয়াছি? হায় একবারও মনে হয় না যে, যিনি এই জগতের কর্ত্তা সকল জীবের অন্নদাতা তাঁহাকে একবার ভাবি? এই ভাব লইয়া সে গৃহত্যাগ করে। তাহার তীব্র ব্যাকুলতার মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে নিবিড় অরণ্যে শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণকে দর্শন করেন। শুধু তাহাই নয় ভগবান শবরবেশে শীত নিবারণের নিমিত্ত অগ্নিপাত্র এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গরম খিচুরী আনিয়া ভক্তের নিকট উপস্থিত করেন।

গীতাপণ্ডা—গীতাপাঠে সন্তুষ্ট ভগবান তাঁহার বাক্যরক্ষার জন্য ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন, তাহারই দৃষ্টান্ত এই চরিত্র। ভক্তমাল

গ্রন্থের অর্জ্জুন মিশ্রের চরিত্রের সঙ্গে একটু অমিল থাকিলেও বিষয়বস্তুর পার্থক্য নাই।

শান্তোবা—ধনবান ব্যক্তি। বিষয়বৈরাগ্যে নবজীবন লাভ। একদিন ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ছিল প্রধান লক্ষ্য আজ তাহার গতি বিপরীত। পিঞ্জর মুক্ত পক্ষীর মত, কমলকোরকমুক্ত ভ্রমরের মত তাহার সংসার মুক্তির আনন্দ। সাধু হইলে হইবে কি তাহার পতিপ্রাণা পত্নী বনের আশ্রমে আসিয়া তাহার সঙ্গিনী হইলেন। একটির পর একটি পরীক্ষায় তাহার পুতিভক্তি ও সাধু স্বভীবের পরিচয় দিয়া শান্তোবা গৃহিণী নিজের ধর্মপ্রাণতার প্রমাণ দিয়াছেন। শুধু কি তাই ভগবান নাবিক হইয়া তাহাকে নদী পার করিয়া দিয়াছেন। নৌকাডুবির দুর্য্যোগে ভগবান তাহাকে পিঠে বহন করিয়াছেন। শান্তোবা বুঝিয়াছে, তাহার পত্নী ভগবানের করুণা লাভে ধন্য। শান্তোবার পরম উৎকণ্ঠার মধ্যে ভগবান দর্শন দিলেন। তখন তাহার আন্তরিক শান্তি আপন অন্তরেই আবদ্ধ রহিল না। শত শত লোকে তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইল। এই প্রসঙ্গে কপট বৈরাগীর কি প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ধৈর্য্যহারা অসংযত চিত্ত গৃহত্যাগী ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়া শান্তোবা বলেন,—বাপুহে বৈরাগ্যের পথ বড় বিষম পথ। এ পথে আসিলে সংযমের বিশেষ আবশ্যক। যে ফুঁকা শিশির মত টুস্‌কির ভর সহিতে পারে না, কথায় কথায় কচি খোকার মত প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে সে যেন কখনও এ পথের ত্রিসীমা না মারায়। মর্মান্তিক দৃঢ়তার যষ্ঠি অবলম্বন করিয়া অতি সতর্কপদে এই শাণিত ক্ষুরধারা সমন্বিত পথে বিচরণ করিতে হয়।

জগন্নাথ দাস—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ এই ভক্ত সরলপ্রাণে বিশ্বাসের সহিত ভজন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি ভগবৎ মহিমা কিছু দেখিতে চান। তাহার আকুলতায় স্বপ্নে ভগবান দর্শন দিলেন

তাহাকে দীক্ষাও দিলেন। ভগবান বলিলেন—সকল শাস্ত্রের মধ্যে সার একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ এই প্রণবমন্ত্র তোমাকে দান করিলাম, গ্রহণ কর। এই মন্ত্রই "ভাগবত" নাম দিয়া আমি অনন্তকে দান করিয়াছিলাম, তিনি ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মা বহুদিন অন্তরে অন্তরে জপ করিয়া এই মন্ত্রই চতুঃশ্লোকী-রূপে প্রকাশ করেন। তিনি আবার নারায়ণকে তাহা উপদেশ করিলেন। নরনারায়ণ তাহাকে দশটী শ্লোকে বিস্তৃত করিয়া নারদ মুনিকে কহিলেন। নারদ আবার শতশ্লোকে পরিণত করিয়া বেদব্যাসের অগ্রে কীর্ত্তন করিলেন। তিনি আবার হাজার শ্লোকে বিস্তার করিয়া আপন পুত্র শুকদেবকে শিখাই-লেন। তিনি আবার অগণিত মুনি-ঋষির সমাজে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিতের সমীপে তাহা কীর্ত্তন করিলেন। তাহাতেই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভীষণ ভবসাগরের পারে গমন করিয়া পরম-কারণ আমাকে প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাপুরাণ ভাগবতই ভবসাগরের পারে যাইবার একমাত্র উপায়। তুমি প্রাকৃত প্রবন্ধে এই পুরাণের গীতি রচনা কর। ভগবানের সার্থক প্রেরণায় অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পরম রমণীয় ভাষা—গীতি বিরচিত হইয়া গেল। দেশে দেশে সেই ভাগবত গান হইতে লাগিল। জগন্নাথের কণ্ঠে ভাগবত—গীতি শ্রবণে নারীবৃন্দও পরমানন্দ লাভ করেন, তাহাকে অনেক ধনরত্ন বসন-ভূষণ দান করেন। গোবিন্দ গীতি শ্রবণে সকলের এতই আগ্রহ—কিন্তু বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি খলজনের তাহা ভাল লাগে না। জগন্নাথ দাসের আদর যত্নটা যেন তাহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তাহার অযথা কুৎসা প্রচারের জন্য তাহাদের জিহ্বাগুলি নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। পরের প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দা প্রচার করাই যে তাহাদের স্বভাব,—উৎকৃষ্ট বস্তুকে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত করাই যে তাহাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম। উত্তম সামগ্রী নষ্ট করাই কাকের কার্য্য। তুলসীবৃক্ষ দেখিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহার অঙ্গে

মূত্র ত্যাগ করাই কুকুরের ব্যবহার। সেইপ্রকার সাধুর দোষ উদ্‌ঘাটন করাই জ্ঞানহীন খলের একমাত্র অনুষ্ঠান। জগন্নাথ দাস প্রতাপরুদ্র রাজার সমীপে অপরাধী। বিচারের ব্যবস্থা হইল। কারাগারে সেই ভক্তভয়হারী ভগবানের কৃপায় একনিষ্ঠ জগন্নাথ স্ত্রীমূর্ত্তিধারণ করিতে সমর্থ হইল। রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে বিস্ময় ভক্তি ও ভয়ের উদ্রেক হইল। তিনি সাধু নিন্দকের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া ভক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

চারিশত বৎসর হইয়া গেল। আজিও ৺পুরীধামে সমুদ্রকূলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির অনতিদূরে জগন্নাথ দাসের সমাধি মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। আজিও তাঁহার ভাষা-ভাগবত ইষ্টমন্ত্রের মত নিত্য আবর্ত্তিত—পঠিত, মুখে মুখে আলোচিত ও উদ্গীত হইতেছে। ইঁহার সম্প্রদায় অতি বড়ী সম্প্রদায়। এই মঠের 'তোড়ানী' (আমানী) সে দেশে দুরারোগ্য রোগনাশের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রবাদ—অন্যূন আড়াই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই তোড়ানী অতি যত্নে ও অতি পবিত্রভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

গঙ্গাধর দাস—অপুত্রক, ভক্তগৃহিণীর পুত্র লাভের তীব্র লালসা। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমাকেই এই ভক্ত দম্পতি পুত্রস্নেহে সেবা যত্ন করে। পুত্রস্নেহে লালিত গোপাল শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে পুত্রের ব্যবহার করিয়াই বিগ্রহ সেবার সাক্ষাৎ মহিমা প্রদর্শন করেন।

মণিদাস—প্রেমোন্মত্ত ভক্ত। তাহার নৃত্যগীতে স্বয়ং জগন্নাথের আনন্দ। পুরাণপণ্ডার পাঠব্যাখ্যার অসুবিধা হয় বলিয়া মণিদাসের উপর অত্যাচার। মণিদাস শ্রীজগন্নাথের উপর অভিমান করিয়া উপবাসী। রাজার প্রতি জগন্নাথের আদেশ, জগমোহনে পুরাণপাঠ বন্ধ। ঐ স্থান শুধু ভক্তের নৃত্যগীত স্তব স্তুতি প্রণাম প্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই চরিত্রের উপসংহারে গ্রন্থকার বলেন—ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য। তুমি

ভক্তের জন্য কি না করিয়া থাক? ভক্তের ভাবের লোভে তুমি আপন সম্মুখ হইতে পুরাণপাঠও মানা করিয়া দিলে?—মালাকারের (নারিকেলের) মালা বাজাইয়া নৃত্যগীতির নিকটে ব্রাহ্মণ পুরাণপণ্ডার পুরাণব্যাখ্যাও অপকৃষ্ট করিয়া দিলে? ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন তুমি ধন্য আর অহো ধন্য আমরা। যিনি জাতিকুল ধনসম্পদ্ বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কেবল একটু ভালবাসার বশীভূত,—একবার নাম লইয়া নাচিলে গাহিলেই গলিয়া যান,—এমন প্রভুকেও আমরা ভুলিয়া আছি? আমাদের গতি কি হইবে প্রভু?

রাম বেহারা—চরিত্রে একদিকে প্রাণের সরল ভাবের একটানা স্রোত আর এক দিকে ব্রাহ্মণের বিধি বিধান মর্য্যাদা জ্ঞানের মধ্য দিয়া ঐশ্বর্যের উপাসনার তাৎপর্য প্রদর্শিত। শেষপর্যন্ত বিধানের উপর ভাবের জয় ঘোষণা। রামবেহারা মুচি হইলেও ব্রাহ্মণের চাইতে দামোদরের আকর্ষণ তাহারই উপর অধিক। ভগবানও ব্রাহ্মণের মূর্ত্তিতে আসিয়া রামবেহারার নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে অসমর্থ। বেহারা বলে—ওহে ব্রাহ্মণ গোঁসাই! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য; তবুও আপনাকে একটা কথা বলি। স্বামী যদি ভালবাসে,—স্বামী যদি আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয়, পত্নী যতই কেন কুরূপা, কুবুজা, কাণা, খোঁড়া, হাতনুলা বা গুণহীনা হউক, তাহাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকে। আর স্বামী যদি প্রীতিমমতার দৃষ্টিতে না দেখে, পত্নীর যতই কেন রূপ গুণ থাকুক, তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় না। দরকার হইল স্বামীর দয়া লইয়া। ঠাকুর বলিব কি, আমার স্বামী ত অগাধ দয়ার বারিধি,—অশেষ গুণনিধি, তিনি আমায় দেখা দেবেনই দিবেন। যদি দেখা না-ই দেবেন, তবে তিনি জোর করিয়া এ অশুচি মুচির ঘরে আসিবেন কেন, এ কদাচারী এ কদাহারীকে সকল ছাড়াইয়া তাঁহার নামে মাতাইবেন কেন?

নারায়ণ দাস—পত্নী মালতীকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যায় রামদর্শনে যাইতেছিলেন। বনের পথে দস্যুদল ইহাদিগকে আক্রমণ করে। সতী মালতী কাতর-ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলে ভগবান আবির্ভূত হইয়া দস্যুর আক্রমণ হইতে ভক্ত দম্পতীকে রক্ষা করেন। এই উপাখ্যান প্রসঙ্গে তীর্থযাত্রীর বিপদ—দস্যুদলের কপট-প্রীতি—নারায়ণের পরমেশ্বর নির্ভরতা—মালতীর পরম উৎকণ্ঠা—ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে।

বালিগ্রাম দাসের—কথা বলিবার মুখবন্ধ ভাবুক গ্রন্থকারের ভাবনার সূত্র ধরাইবার সুন্দর চাতুর্য্য ভাবিবার মত। তিনি বলেন—ভাবের প্রভাব ভাবনায় আনা যায় না। সে স্বভাবের উপরও কলম চালায়। তুমি উচ্চ জাতি, উচ্চ প্রকৃতিই তোমার স্বভাবসিদ্ধ হওয়া উচিত কিন্তু ভাবের গুণে তুমিও নীচ হইয়া যাইতে পার; আপনাকে একটা 'হাম বড়' ভাবিতে ভাবিতে তুমিও নীচের নীচ হইয়া যাইতে পার। আবার ঐ নীচ জাতি নীচতাই যাহার মজ্জাগত প্রকৃতি, ভাবের গুণে সে-ও উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে,—আপনাকে 'দীন হীন সামান্য' ভাবিতে ভাবিতে সে-ও উচ্চের উচ্চ হইয়া পড়িতে পারে। তুমি যতই কেন উচ্চ জাতি হও আপনাকে বড় ভাবিতে গেলেই ভাব তোমার ঘাড়ে ধরিয়া ছোট করিয়া দিবে; আর যত নীচ জাতিই হও না কেন, আপনাকে তৃণাদপি নীচের নীচ চিন্তা করিতে পার তো ভাব তোমায় বড়র বড় মহাবড় করিয়া দিবে। ইহাই ভাবের বিচিত্র বৈভব।

ভাব এ স্বভাব পাইল কোথা হইতে,—তাহা কি আর বলিতে হইবে? ভগবান ভাবনিধি, ভাব তাহার শক্তিতেই শক্তি সম্পন্ন। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরমধ্যে অবস্থিত, সেই বিশ্বম্ভর ভগবানকে যিনি মস্তক ভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি জাতি বিদ্যায় কুলে-শীলে ধনে মানে যতই

কেন বড় হউন, তাহার আর মস্তক উন্নত করিবার যো নাই। গিরিধারীর অসাধারণ গুরুভারে তাঁহার মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়ে,— তিনি আপনাকে ধরণীর ধূলিকণার অপেক্ষাও নগণ্য মনে করিয়া বিশ্ববাসী সকলেরই চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইতে থাকেন। আর যেখানে ভাবনিধি ভগবান্ নাই, এ ভাবও সেখানে নাই।

বালিগ্রাম দাস পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিয়া আসিয়াছে। জগন্নাথের নয়ন শোভায় তাহার নয়ন মন লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে ফিরিয়া সে ভাত খাইতে বসিবে। পত্নী নূতন হাড়ীতে ভাত রান্না করিয়া তার মধ্যস্থলে শাক দিয়া পতির সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে। ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট চিত্ত বালিগ্রাম দাস সেই হাড়ীর মধ্যে শ্রীজগন্নাথের নেত্রকমল শোভা দেখিয়া বিহ্বল। সকলে তাহার ভাব বুঝিল না। যাহারা বুঝিল তাহারা তাহাকে দেশের সুসন্তান বলিয়া বরণ করিয়া লইল। বালিগ্রাম দাস চণ্ডাল জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার প্রীতি প্রদত্ত নারিকেল ফল জগন্নাথ গ্রহণ করিয়া অহঙ্কারী ব্রাহ্মণের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। তাহারই জন্য জগন্নাথ নীলচক্রে অবস্থান পূর্ব্বক আম্রফল আস্বাদন করিলেন। ভগবান তাহাকে সেই স্থানে দশাবতার মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। এই প্রসঙ্গে ভক্তির পথে প্রেমের পথে জাতি ও কুলের গৌরব যে অতি তুচ্ছ তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভক্তের জয় তৃতীয় উল্লাসে তেরটি চরিত্র আছে। পূর্ব্বভাষ প্রসঙ্গে প্রভুপাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখের কথা কিছু কিছু বলিয়াছেন। আঘাতের পর আঘাত আসিয়া জীবনের ছন্দ কি ভাবে রূপায়িত করে তাহার প্রমাণ পাই প্রভুপাদের কথায়। পূজ্যপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী ছিলেন জ্ঞাতি-ভ্রাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ইঁহার সাহচর্যে ভক্তমাল গ্রন্থের সম্পাদনে সাহিত্যিক উৎকর্ষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তৃতীয় উল্লাস প্রকাশের সময় প্রভুর পারিবারিক নানা প্রকার অশান্তি। তিনি বলেন—যাঁহাকে সহায়

পাইয়া আমরা পরমোৎসাহে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই অকপট সাহিত্য সেবী এবং অকপট শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পূজ্যপাদ বলাইদাদা আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছেন। একটা সন্দেহ হইলে আর জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই,—কার্যে অবসাদ আসিলে উদ্দীপ্ত ভাষায় উৎসাহ দিবারও আর কেহ নাই। এ দুঃখের কথা কাহাকে বলিব ?

তারপর কয়েকটি পুত্র কন্যা ইতিপূর্ব্বে ভগবৎপাদপদ্মে স্থান লাভ করিয়াছিল, অবশিষ্ট ছিল একটি কন্যা সেটিও সেদিন (২৭শে কার্ত্তিক) শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। শ্রীভগবানের নামে এমন প্রাণভরা অনুরাগতো কখনো দেখি নাই। যখন মুখে বুলি ফুটে নাই, তখন হইতেই মা আমার নিতাই-গৌর, রাধা-গোবিন্দ কিংবা ভগবানের অন্য কোন নাম শুনিলেই আনন্দে মাতিয়া উঠিত এবং হাততালি দিয়া অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িত।...............দেহত্যাগও অদ্ভুত, যোগী মহাপুরুষের মত। দেহত্যাগের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও মা আমার দেবোদ্দেশে প্রণাম করিয়াছে এবং চাহিয়া চাহিয়াই ইহলোকের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। .... পূর্ব্বের পুত্র কন্যাগুলির বিরহে হৃদয়ে সামান্য বেদনাই অনুভব করিয়াছি কিন্তু এবারকার বেদনা ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। এতো সন্তান বিয়োগের দুঃখ নয়, এ দুঃখ যে ভক্ত-সঙ্গ বিয়োগের দুঃখ ! শ্রীরামানন্দ রায় ঠিকই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।

আহা, মাতা আমার সাধন-ভজনের কত সহায়তাই করিত। তাহার সঙ্কীর্ত্তন প্রীতির অনুরোধে আমারও যে বেগারের দায়ে গঙ্গাস্নান হইত।

ভক্ত ভক্তি গুরুদেব আর ভগবান।
চারি নাম ভেদ কিন্তু শরীর সমান॥

ইঁহাদের শ্রীচরণ করিলে বন্দন।
জগতের যত বিঘ্ন হয় নিবারণ॥

সালবেগ—দুর্দ্দান্ত৺ লুণ্ঠক লালবেগের পুত্র। উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে বিরোধের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রক্ষত লইয়া যুবা সালবেগ মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক ভোগ করিতেছে। তাহার গর্ভধারিণী হিন্দু রমণী। পুত্রের কল্যাণে তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিলেন। অত্যাচারী লুণ্ঠক-পিতার পুত্র হইলেও জননীর উপদেশে সালবেগ উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। নামমন্ত্রের মহীয়সী শক্তিতে সালবেগের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তাহার তখন চারিদিকেই নামের বেড়া সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারেই তখন নাম মূর্ত্তিমান। ভগবানের আনন্দময় দর্শনে তাহার নবজীবন লাভ হইল। ৺পুরীধামে বলগণ্ডি স্থানে সরকারী ডাক্তারখানার ঠিক বিপরীত দিকে—বড় দাণ্ডের উপর এক বটবৃক্ষতলে সালবেগের সমাধিস্তম্ভ আছে।

রামদাস—একজন অকপট অতিথিসেবক ভক্ত। তাহার চরিত্রের মুখবন্ধে প্রভু বলেন—ভাবনা এক বই দুই নয়। তাহার গতির দিক কিন্তু দুইটা,—বিষয় ও ভগবান। দিক দুইটা আবার এ ওর বিপরীত—একটা পূর্ব্ব তো আর একটা পশ্চিম গোছের। কাজে কাজে ভাবনার গতি একদিকে যাইতে আর একটা দিক তফাৎ হইয়া পড়ে। ভাবনা যখন বিষয়ের দিকে যায়, ভগবান তখন দূর হইয়া পড়েন, আর যখন ভগবানের দিকে ধাবিত হয় তখন বিষয়ও তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যায়। ভগবানের দিকে ভাবনার চালনা কিন্তু যার তার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যার হয়, তার মত ভাগ্যবান—অসাধ্য সাধনে ক্ষমতাবান আর নাই। কেননা বিষয় হইল রূপ রসাদি; তাহারা হইল জড়। জড়ের আর কতটুকু শক্তি? তাই বিষয়ের দিকে যাইতে যাইতে ভাবনাও জড় হইয়া পড়ে,—

শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবান হইলেন অনন্ত শক্তিমান, তাই তাঁহার দিকে যাইতে যাইতে সে-ও ঐশী শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া উঠে,—চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

রামদাস ঋণ করিয়াও অতিথি সেবা করে প্রতিদিন। প্রথমতঃ মহাজনেরা বিশ্বাস করিয়া ধার দেয় পরিশেষে তাহারা আর কিছুতেই দিতে চায় না। পতি পত্নী অতিথি সেবায় অসমর্থ হইয়া ঋণদায়ে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। ভগবানের হৃদয় গলিয়া গিয়াছে তাহাদের ভক্তসেবার আগ্রহে। রাত্রিকালে নিজেই রামদাস বেশ ধরিয়া মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাজনদের সহানুভূতি ও সমাদরে রামদাস বুঝিল ইহা সেই লীলাময়ের দীন-তারণ আর্ত্তিহরণ লীলা। মহাজনদের উপরেও ভগবানের প্রভাব পড়িয়া তাহাদিগকে রামদাসের অতিথিসেবার অনুকূল করিয়াছে। রামদাসও অতিথি সেবায় নিরত হইয়া কায়মনে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে। এই ভাবে দিন যায়। এই চরিত্রের উপসংহারে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে সেগুলি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ঠাকুর তুমি বেশ। তুমি তোমাকেও দেখাইলে, তোমার ভক্তকেও দেখাইলে। তোমাকে দেখাইলে কি? যে যাহা চায়, তাহাকে তুমি তাহাই দিয়া থাক। মহাজনেরা টাকা চায়, তাই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দেখা দিয়াও তুমি টাকাই দিয়া আসিলে, তোমার নিজের কিছুই দিলে না। তোমাকে আরও দেখাইলে কি? তুমি তোমার ভক্তের তফাতে তফাতে থাকিয়াও তোমার যাহা সর্ব্বস্ব—সমস্তই তাহাকে প্রদান করিয়া থাক; সামান্য ধন জন দিয়া ভুলাও না। আর তোমার ভক্তকে দেখাইলে কি? তোমার ভক্ত তোমার চেয়েও বড়; তোমার সম্পত্তিতে তাহারাই প্রকৃত মালিক। মহাজনগণ সাক্ষাৎ তোমাকে পাইয়া নশ্বর ধনের অধিক কিছুই

পাইল না। কিন্তু তোমার ভক্ত রামদাস তাহাকে তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারের গুপ্ত ধন প্রেমধনে ধনী করিয়া দিলে। হায় ঠাকুর, তুমি ধনী হইয়াও কৃপণ, আর তোমার ভক্ত কাঙ্গাল হইয়াও পরম দয়াল। ঠাকুর তুমিও বেশ তোমার ভক্তও বেশ।

রঘুদাস—ধীবর জাতি ভক্ত। সে গুরুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছে। গলায় তুলসীর মালা—অঙ্গে দ্বাদশ তিলক সে প্রতিদিন গুরুমন্ত্র জপ করে ভাগবত পড়ে, সাধুদের কাছে যাইয়া তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করে। তাহার দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গেল। সে তাহার উপাস্যকে সকল জীবের অন্তরে অন্তরে দেখে। সে আর জীবহিংসা করে না। জাতীয় ব্যবসা বন্ধ হইল। না খাইয়া মরিবার উপক্রম। অনিচ্ছায় একদিন সে মাছ ধরিল তাহাকে হত্যা করিবার সময় কিন্তু সে শুনিল "রক্ষা কর নারায়ণ" এই শব্দ। রঘু আর পারে না। সেই মাছকে সে এক জলাশয়ে রাখিয়া তাহাকেই ঈশ্বর জ্ঞানে প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণবেশে ভগবান তাহার কাছে আসিলেন—রঘুর আকুলতায় তাহার প্রার্থিত দিব্য মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। তাহার বৈরাগ্য ও সাধুবেশ দেখিয়া গ্রামবাসীগণ তাহার পিছনে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহার মহিমায় সকলেই অভিভূত। সে যাহাকে যাহা বলে তাহাই সিদ্ধ হয়। জগন্নাথ দেবকে সে ঘরে বসিয়া আদর করিয়া খাওয়ায়। ৺পুরীধামে পূজাপণ্ডা ভোগনিবেদন করে দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে। দর্পণে সেই প্রতিবিম্ব পড়ে না। জগন্নাথ রাজাকে আদেশ করেন—তখন আমি রঘুর ঘরে ভোজন করি, মন্দিরে থাকিলে তো দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়িবে। রাজা রঘুর ঘরে দশক্রোশ দূরে পিপিলীচটীতে আসিয়া দেখেন ভগবানকে রঘু ভোগ নিবেদন করিতেছে। তখন রাজা বলিলেন,—আহা আহা, আমার জীবন জুড়াইয়া গেল গো জুড়াইয়া গেল। ধন্য রঘুদাস! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জীবন! আহা, তুমি এ হরি-বশ-করার মন্ত্র পাইলে কোথা হইতে?

তুমি যে সেই বিশ্বপতিকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছ দেখিতেছি। তা আমি আর তোমায় ছাড়িতেছি না। চল আমার সঙ্গে সপরিবারে নীলাচলে চল, তোমার অনুগত হইয়া যদি তাঁহার কৃপা অধিকার করিতে পারি।

রঘু পুরীধামে আসিয়াছে। এইবার ভোগমণ্ডপে দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব পড়িল। পূজাপণ্ডা প্রীতমনে প্রভুকে ভোগ নিবেদন করিলেন। প্রভু ও তাঁহার ভক্তের জয় জয় রব উত্থিত হইল।

গোপাল—গোঁয়ারের একশেষ—জাতিতে গোয়ালা—কার্য তাহার গো-পালন। পঞ্চাশের উপর বয়স, দীক্ষা হয় নাই। সমবয়সীরা উপহাস করে, টিট্‌কারি দেয়, উপদেশও প্রদান করে,—গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে না, হরি ভজনও করিলে না; দুনিয়ায় আসিয়া তরিবার কি ঠাওরাইয়াছ বল দেখি? জাননা কি, ভবপারের কর্ণধার হইতেছেন একমাত্র গুরু। তিনি তোমার কর্ণে ধরিয়া মন্ত্রবর্ণ না বলিলে তুমি তরিবে কি প্রকারে? ভগবানের শ্রীমুখের বাণী কি শুন নাই? তিনি বলেন,—এই মানব দেহ সকল দেহের শ্রেষ্ঠ দেহ। দেহ তো নয় এ যেন একখানি সুগঠিত তরণী। এই তরণীখানির সাহায্যেই তোমায় ভবপার হইতে হইবে। আজ তুমি বহুভাগ্যে ইহাকে পাইয়াছ; তাই ইহা সুদুর্লভ হইয়াও তোমার কাছে সুলভ হইয়াছে। দাঁত থাকিতে তো কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না, তাই তুমি এই দেহের দুর্লভতা বা উপাদেয়তা বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে থাকিতে উহার সাহায্যে ভবপারে চলিয়া যাইতে হইবে। এ দেহ একবার হাতছাড়া হইলে,—মরণের হাতে চলিয়া গেলে, আর যে তুমি ইহাকে পাইবে সে পক্ষে বিশেষ সন্দেহ। তাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে, যত সত্বর সম্ভব এই দেহের সাহায্যে ভবপারে চলিয়া যাওয়া। নৌকা নাকি নিজে নিজে পারে যাইতে পারে না, তাই তাহার

একজন কাণ্ডারী চাই। এ দেহতরীর কাণ্ডারী হইতেছেন গুরু। যে কাণ্ডারী ছাড়িয়া নৌকাকে পরপারে লইয়া যাইতে চায় তাহার আর বিপদের অবধি থাকে না। প্রায় তাহাকে তরী ও পণ্যের সহিত প্রাণ হারাইতে হয়। তাই এই কর্ণধারের প্রয়োজন। তুমি গুরুকে কর্ণধার কর, তাঁহার কাছে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশমত তরীখানি চালাইতে চাও; আর তোমার চিন্তা নাই, ঝড়ঝাপটারও ভয় নাই, আমি অমনি অনুকূল বাতাস হইয়া তরীর সকল বাধা সকল বিঘ্ন কাটাইয়া দিয়া পরপারে পঁহুছাইয়া দিই। ক্লেশ তো তোমার দূরের কথা, তুমি জানিতেও পারিবে না যে তুমি কেমন করিয়া পারে আসিলে। তুমি তখন দুরন্ত দুঃখের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ভব-বারিধি পার হইয়া নিত্যানন্দের নিত্য-নিবাস আমার আবাসে গিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে; দুঃখের সম্বন্ধ তোমার চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে। মনুষ্য-শরীর পাইয়া তুমি যদি এ কার্য না কর তবে তোমার নাম হইবে—আত্মঘাতী। তোমাকে সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অসুর লোকে যাইয়া অবস্থান করিতে হইবে।

ভাই গোপাল এই তো হইল ভগবানের কথা। মানুষ হইয়া এ কথা কি কাহারও উপেক্ষা করা উচিত? তুমি আর বিলম্ব করিও না, যত সত্বর সম্ভব গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

সমবয়সীদের কথায় গোপাল ঠিক করিল সে দীক্ষা লইবে। সে কিন্তু গুরুর কাছে বার বার প্রণাম করিবে না, বা অনেক রকম আদেশ পালন করিতেও রাজী নয়। খুব বেশী হইলে একটা কথা সে মানিয়া চলিবে। পথের ধারে এক বৈষ্ণব ঠাকুরকে সে ধরিল গুরু হইতেই হইবে তবে শুধু একটা উপদেশ দিয়াই গুরুগিরি শেষ করিতে হইবে। দায়ে পড়িয়া বৈষ্ণব ঠাকুর দীক্ষা দিলেন এবং নতুন শিষ্য গোপালকে শুধু একটা কথা বলিয়াই বিদায় হইলেন। ভগবানকে চিন্তা করিয়া যেখানে ইচ্ছা তাঁহাকে খাদ্য

সামগ্রী নিবেদন করিয়া দিবে তাহার পর স্বয়ং আহার করিবে ; ইহাই আমার আজ্ঞা। গোপাল কায়মনোবাক্যে গুরু বাক্য পালনের জন্য প্রস্তুত। প্রতিদিন সে ভগবান্‌কে নিবেদন করে। ভগবান্ আসে না তাহারও ভোজন হয় না। এই ভাবে প্রাণ যাইবার উপক্রম তখন ভগবান গুরু রূপে দেখা দিলেন এবং স্বয়ং প্রসাদ দিলেন। এই প্রসাদে তাহার সাতাইশ দিবসের নয়, কত জন্ম জন্মান্তরের ক্ষুধা পিপাসার শান্তি হইয়া গেল। গুরুর কৃপায় আর গুরুর বাক্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে ইহলোকেই গোবিন্দকে পাইল।

পরমেষ্ঠি সিপুতি—দিল্লীর বাদশাহ দুটি "মুচুলি" চক্রাকৃতি পাশ বালিশ তৈরী করিবার জন্য নিপুণ দর্জি পরমেষ্ঠির কাছে জড়ির কাপড় দিয়াছেন। বালিশ তৈরী হইয়াছে মণিরত্ন খচিত অতি সুন্দর। সে দিন নীলাচলে পহুণ্ডীবিজয়। পরমেষ্ঠি হৃদয়ে সেই লীলা দর্শন করিতেছেন ভাবভক্তির চক্ষে। পহুণ্ডী বিজয়ে জগন্নাথের চরণ তলায় দেওয়া চক্রাকৃতি বালিশ একটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরমেষ্ঠি মনে মনে নিজে হাতে তৈরী বাদশাহের জন্য নির্মিত বালিশ দুটির একটি জগন্নাথকে সমর্পণ করিল। ভক্ত বৎসল জগন্নাথও উহা গ্রহণ করিলেন। অন্তর্জগতে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বাদশাহের হুকুম মত বালিশ লইয়া পরমেষ্ঠি দরবারে উপস্থিত হইবে। সে দুটি কোথায় পাইবে—একটি লইয়াই গেল। দিল্লীশ্বরের জিজ্ঞাসার উত্তরে দর্জি সত্য ঘটনাই বলিল। বিশ্বাস করিবে কে? তাহাকে বন্দী করা হইল—অনাহারে নির্যাতন ভোগ করে পরমেষ্ঠি কারাগারে। রাত্রিকালে ভক্তের ভগবান্ কারাগারে আসিয়া ভক্তের দুঃখ মোচন করিলেন, বাদশাহকে স্বপ্নে ভক্তের মহিমা জানাইয়া শাসাইয়া দিলেন। সকাল বেলা ভয়ে ভয়ে বাদশাহ কারাগারে যাইয়া দেখিলেন প্রহরীরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। পরমেষ্ঠির

হস্ত পদের বন্ধন নাই, কুঁজ নাই, কুরূপ নাই। তাহার দেহ দিব্য জ্যোতিতে ভরিয়া গিয়াছে। ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া সে যে প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হইবে না-ই বা কেন, নাম ও নামী তো আর ভিন্ন নয়?

মাধ্ববাচার্য—চরিত্রে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহারী লীলার সংবাদ বঙ্গভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থে নাই। প্রভুপাদ উৎকল ভাষায় এই লীলাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে কি ভাবে জনগণের চিত্ত মন অপহরণ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত এই মাধবাচার্য-কথায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ মাধব তাহার পত্নীকে লইয়া সাধারণ ভাবে সংসার করে। তাঁহাদের একটি মাত্র খোকা। একদিন রাত্রিকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে পরম প্রেমে উচ্চ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পথে যাইতেছেন। মাধব-গৃহিণী সেই নাম শুনিয়া ছুটিয়া যায়—শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন ভোলান মূর্ত্তি দেখিয়া বিহ্বল হয়—তাঁহার নৃত্য-মাধুরীতে আত্মহারা। সেই আবিষ্ট অবস্থায় অলাবু কুটিতে আপন প্রিয় পুত্রকেই কুটিয়া রান্না করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ দিকে মাধবাচার্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেরিত হইয়াই যেন ঘরে আসিয়া দেখেন ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ব্রাহ্মণীর সর্ব অঙ্গে রক্ত আর সে শুধু আপন হারা হইয়া বলিতেছে হরিও রাম হরিও রাম। পুত্রের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে পতিপত্নী উভয়েই শোকসাগরে নিমজ্জিত। তখন কি করেন যে পাত্রে পুত্রের দেহ শেষ রহিয়াছে—উহাই বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী চলিল মহাপ্রভুর চরণ উদ্দেশ্যে। তখনও কীর্ত্তন চলিয়াছে। সেই পাত্র কীর্ত্তন মণ্ডলীর মধ্যস্থলে রাখিয়া উচ্চ স্বরে কীর্ত্তন চলিল। দয়াল শিরোমণি নিতাইচাঁদ নিজের মস্তক হইতে তুলসী দল সেই পাত্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল কীর্ত্তনের পর

দেখা গেল সেই পাত্রে শিশুটি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিশুর নাম রাখিলেন কৃপাচার্য এবং তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট সমর্পণ করিলেন।

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র—ইনি ছিলেন আদর্শ অতিথি সেবক। আতিথ্য সৎকারে পরীক্ষা দিতে গিয়া তাহাকে আপন পত্নীকে পর্য্যন্ত অপরিচিত অতিথির সেবায় ও সন্তোষ বিধানে নিযুক্ত করিতে হয়। সেই অতিথি স্বয়ং ভগবান ছদ্মবেশে। রাজা ও রাণী তাঁহাদের নিষ্ঠা ও অকপট ভাবের মধ্য দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রভু এই প্রসঙ্গে বলেন—বিদ্যালয়ে পরীক্ষা, কর্মস্থলে পরীক্ষা, গুরুশিষ্যে পরীক্ষা, প্রভুভৃত্যে পরীক্ষা, স্বামী স্ত্রীতে পরীক্ষা, পিতাপুত্রে পরীক্ষা—চারি দিকেই পরীক্ষা। পরীক্ষার পরিখা যে কতদূর বিস্তৃত কল্পনা তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ।

মানুষের পরীক্ষাটা কেবল যে মানুষেরই হাতে তাহা নয়, অনেক অমানুষেও পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া বসে। বলিতে কি বাড়ীর পোষা টিয়া পাখীটা—কুকুর বিড়ালটা কি গরু ঘোড়াটাও বড় অল্প পরীক্ষা না করিয়া প্রীতি প্রকাশ করে না। আসল কথা, যাহার কাছেই হউক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারো তো ভালবাসা পাইবে, অভিলষিত বস্তু করায়ত্ব করিতে পারিবে, না পারো তো তোমার আর কাহারও সহিত পোষাইবে না, সকলেই তোমার প্রতি বিরূপ হইয়া বসিবে।

সর্বান্তর্যামী বিশ্বস্বামী কি আর বুঝেন না যে, তাঁহার কাছে পরীক্ষা দেওয়াটা আমাদের কত কঠিন? তবুও না জানি লীলাময়ের কেমনই লীলা,—তিনি মানুষকে একটু মানুষের মত চলিতে দেখিলে,—একটু মানুষের মত বলিতে দেখিলে,—একটু তাঁহার দিকে চলিতে দেখিলে, একটু আধটু পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন না। বোধ হয় তিনি এই পরীক্ষার ভঙ্গীতে জগৎকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহার রচনা নৈপুণ্যের চরম

উৎকর্ষ মনুষ্যের মধ্যে কত অসীম শক্তি,—সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিয়াও তাহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি বিরাজ করিতেছে,—কত দৃঢ়তা, কত সহিষ্ণুতা, কত ঐকান্তিকতা, কত ত্যাগশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণরাজি তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। **অনন্তশবর**—ব্যাধ, পাখী ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন বনে কার একটা পোষা পাখী সে ধরিয়া ফেলে। পাখীটা রাধাকৃষ্ণ নাম বলে। সেই নাম মাধুরী এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল যে কঠিন প্রাণ শবর উহা আর ভুলিতে পারে না। মৃত্যু সময়েও সে ঐ নাম স্মরণ করিয়া অজামিলেরই মত সদ্গতি লাভ করে। এই চরিত্রে শ্রীনামের মহিমা পরিস্ফুট। প্রভুর কথা—ভগবানের নামের কি মহীয়সী শক্তি, ভাবে বা অ-ভাবে তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না। ঠিক যেন অগ্নি; জ্ঞানপূর্বকই হাত দাও আর অজ্ঞানপূর্বকই হাত দাও সমান কথা,—হাত তোমার পুড়িবেই। ভগবানের নামও ভাবভরে গ্রহণ কর, আর ভাবহীন হইয়াই গ্রহণ কর, সমান কথা—পাপরাশি ভস্মীভূত হইবেই। তা না হইলে কি আর অনন্তশবরের সদ্গতি লাভ হইত? **কৃষ্ণদাস**—একজন কবি। তবে প্রাকৃত বিষয়ে তাহার কাব্য নয়। তাহার গান শুধু জগন্নাথকে লইয়া। রাজা দিব্য সিংহ এই প্রসিদ্ধ কবিকে সভায় ডাকিয়া গান শুনিলেন—মুগ্ধ হইলেন। তাহার ইচ্ছা এই কবি রাজার মহিমা সূচক গান রচনা করে। কবি নির্ভিকভাবে উত্তর দিয়া বলে—আমার গান জগন্নাথের মহিমা, অপর কাহারও মহিমা আমি গাহিতে পারি না। ক্রুদ্ধ রাজা কবিকে দণ্ড দেন, কারাগারে বন্দী করেন। প্রসন্ন জগন্নাথ নিজ করপল্লব দ্বারা কবির সর্বাঙ্গ মার্জন করিয়া তাহার বেদনা দূর করেন। রাজা স্বপ্নে বলদেবের তিরস্কার শ্রবণ করিয়া ভক্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। এই চরিত্রে কৃষ্ণদাসের নিষ্ঠা, মনোবল এবং শুদ্ধ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

[illegible]—এই চরিত্রটী বিস্ময়কর ঘটনাবহুল, বাঁ[illegible]

রামের সংসার ত্যাগ-সাধনা-সিদ্ধি বিষদভাবে বর্ণিত। নানাপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হইবার কিরূপ সম্ভাবনা থাকে ইহাতে তাহারও ইঙ্গিত আছে। লোকে কিছু ক্ষমতা না দেখিলেও যে সাধুকে মানিতে চায় না তাহাও বেশ দেখানো হইয়াছে।

নন্দ মহান্তী—সাধারণতঃ জ্ঞানী সাধুরাও লোকের চক্ষে পাগল বলিয়া অবহেলিত হয়। তাহারই দৃষ্টান্ত এই নন্দ মহান্তী। ইনি ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন পরম প্রীতি পাত্র পাঞ্জিয়া বা রেকর্ডকীপার। পরে ইনি পট্টনায়ক উপাধি লাভ করেন। সর্বত্র সমভাবে পরমেশ্বর মহিমা দর্শন ছিল ইহার সিদ্ধ বিদ্যা। এইজন্য তাঁহার অনেক রকম নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। অপরের অঙ্গে আঘাত করিলেও ইহার অঙ্গে সেই আঘাতের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। চরম পরীক্ষায়ও তিনি স্থির চিত্ততার পরিচয় দিয়া প্রতাপরুদ্রের মত রাজাকেও বশীভূত করিয়াছিলেন। প্রভু ইহার সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া দুঃখ করিয়া বলেন—ভাব লইয়া ভাষা। ভিতরে ভাবের ভাষা নীরবে ফুটিয়া উঠে, তারপর মুখ দিয়া সেই ভাষা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সকলের ভাব সমান নয়। তাই একের ভাষা অপরের ভাষার সহিত সমান হয় না। তবে এখানকার ঘট-পট ধন-দৌলত বিষয়-বিভব লইয়া যাহারা ব্যাপৃত তাহাদের ভিতরের ভাব প্রায় একপ্রকার, সুতরাং মুখের কথাও প্রায় সমশ্রেণীর। আর যাহারা এ সংসার ছাড়া সামগ্রী লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহাদের ভাবও এক ধরণের,—ভাষাও তা-ই। সংসারী আমাদের কাছে জ্ঞানিগুরু মহাদেব, পরমহংস শিরোমণি শুকদেব, আর প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানি-ভক্ত সকলেই পাগলের শ্রেণীভুক্ত।—নচেৎ নন্দ মহান্তীর মত একজন ভজননিষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখন 'পাগল' বলিয়া নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত না।

নীলাম্বর দাস—ভগবানের আকর্ষণে পড়িয়া তিনি সর্বত্যাগী। স্ত্রীপুত্র ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা শিশুর মত কাতর প্রাণে নীলাম্বর ভগবানের জন্য লালায়িত। জগন্নাথ দর্শনে চলিয়াছেন অফুরন্ত আবেগ লইয়া। নদী পার হইবেন। এক ধীবর নৌকায় চাপাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সঙ্গে যাহা ছিল সবই কাড়িয়া লইতে চায়। ভগবানের স্মরণে নীলাম্বর। নদীতীরে ধনুকধারী ক্ষত্রিয় রক্ষক। নৌকার মাঝি তাহার কাছে আসিতে বাধ্য হইল। তাহার নির্দেশ মত নীলাম্বরকে পার করিয়া দিল। এই ক্ষত্রিয় রক্ষক আর কেহ নয় যাঁহার দর্শনে ব্যাকুল ব্রাহ্মণ নীলাম্বর ইনি সেই শ্রীভগবানই। প্রভু বলেন হায় হায়, ভক্তের মহা মহিমা আমরা বুঝিলাম না গো বুঝিলাম না। ভক্তকে বধ করিতে যাইয়াও ধীবর ভগবানের দেখা পাইল গো, না জানি ভক্তের সেবায় কি অমিয়ময় ফলই ফলে গো, কি অমিয়ময় ফলই ফলে! নীলাম্বর দাস শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে তাঁহার বদনকমল দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। বিষয় এবং ভগবান্ এই দুইএর মধ্যে কাহার আকর্ষণ অধিক? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই হয়তো বলিবেন, বিষয়ের আকর্ষণই অধিক। সংসারে আসক্ত অল্পজ্ঞ আমাদের এইরূপ উত্তরই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহানুভব ব্যক্তিগণ এ কথায় কিছুতেই সায় দিতে পারেন না। কেন না তাঁহারা জানেন, কোন্ এক অলক্ষ্য কারণে কি জানি কাহার ইঙ্গিতে মানুষ যখন দিগবিদিগ্ জ্ঞান হারাইয়া ভগবান ভগবান বলিয়া উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন ত্রিভুবনের কোনো প্রলোভনের সামগ্রীই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না।

তুলসীদাস—রাজপুত জাতির রামভক্ত। 'রামায়ণ শুনিতে যাইয়া জানকী হরণের কথায় তাহার ভাবাবেশ হয়। সে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে যাইয়া সীতা উদ্ধারের উৎকণ্ঠায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়।

শ্রীভগবান্ তাহাকে সমুদ্রতীরে জানকীর সহিত নিত্য মিলিত রূপ দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন। তারপর এক বৈষ্ণবের সভা মধ্যে তুলসীদাস ভক্তির বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে শ্রীরাম সীতারূপে দর্শন করাইয়া ভক্তির মহিমা বিস্তার করেন। এই চরিত্রে শ্রীরামভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের একটি প্রীতির সমন্বয় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

তুলসীমঞ্জরী—তুলসীদাসের শ্রীনাম মহিমা বর্ণনাময় ৮০টী দোঁহার ব্যাখ্যা ১৩৪০ সালে শ্রীরথযাত্রায় প্রকাশিত। শেষ নিবেদনে প্রভু লিখিয়াছেন—'এই ভেটই বোধ হয় আমার শেষ ভেট।' তাঁহার কথাই সত্য হইল ইহার পর প্রভুপাদের লেখা আর প্রকাশ হয় নাই। জঙ্গমবৃক্ষ মুখবন্ধে তিনি অনেক দিন পূর্ব্বের একটি রহস্যময় কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন—তখন আমাদিগের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় জীবিত। প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করা তাঁহার অভ্যাস। একদিন স্নান করিয়া তিনি ফিরিতেছেন, মুখে গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে দ্রুত গতিতে চলিতেছেন। চলিতে চলিতে তাঁহার মুখ হইতে যাই—"সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ" এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, অমনি কোথায় ছিল একটা মাতাল, টলিতে টলিতে তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বোল্‌ছো বাবা? যাহার মন যে দিকে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় গঙ্গার প্রণাম আওড়াইলে কি হইবে, লম্পট মাতালটা মনে করিল—সুখদা, মোক্ষদা, গঙ্গা এ সবই তো মেয়ে মানুষের নাম, বুড়ো বামুনটা এদের কথা কি বলে একবার শুনাই যাক্ না কেন? মাতাল দেখিয়া তো স্মৃতিরত্ন ভয়ে জড়সড়; পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু "কম্‌লি নেহি ছোড়তা।" মাতালটা দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে আগলাইল, জিদ্ করিয়া ধরিয়া বসিল, তোমার ঐ সুখদা মোক্ষদা গঙ্গার কথা না শুনিয়া ছাড়িতেছি না বাবা! স্মৃতিরত্ন মহাশয়

তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন, কি জানো বাপু! এই যে মা গঙ্গাকে দেখিতেছ, ইনি ইহকালে সুখ এবং পরকালে মোক্ষ দান করেন। আমাদের মত পতিতের পতিতপাবনী মা গঙ্গাই হইতেছেন একমাত্র গতি বুঝলে বাবা। মাতালটা তখন বলিল,—আমি বড় দুঃখ পেতেছি বাবা, এই দেখনা আমার গায়ের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিয়াছে পৌষের শীতে হি হি কাঁপিতেছি। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচেন। উত্তরে তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, যাও যাও মা গঙ্গার কাছে যাও, তিনি তোমার দুঃখ দূর করিয়া দিবেন। এই বলিয়া তিনি তো চম্পট; মাতালটা টলিতে টলিতে মা-গঙ্গার কাছে গিয়া হাজির। কিন্তু তার, কি করিয়া যে সুখ আদায় করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অকস্মাৎ ডান হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলটি গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দিল। দিবামাত্রই শীতের চোটে কাতর হইয়া সে আঙ্গুলটি তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল এবং ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল,—বলি, ও অভাগার বেটি, এই বুঝি তোমার সুখ দেওয়া? সুখ যা দিয়াছ তা আর বলে কি জানাব? আঙ্গুলটি আর নাই বলিলেই হয়। একেবারেই গিয়াছে। তা যদি তোমার পরকালের মোক্ষ দেওয়াটাও ইহকালের এই সুখ দেওয়ার মতই হয়, তবে বেটি! কি ঠকানটাই ঠকালি! গাভীর সর্বশরীরে দুগ্ধ আছে এ কথা সত্য কিন্তু তা বলিয়া শৃঙ্গ ধরিয়া টানাটানি করিলে কি আর দুগ্ধের ধারা নিস্থত হইবে? আসল জায়গার পরিচয় জানা চাই। বাঁটে ধরিয়া টান দেওয়া চাই।

ভাইরে এই আসল জায়গা না জানার গতিকে হতভাগ্য মাতালের দশা যাহা ঘটিয়াছিল, আমাদের সর্বদাই তাহা ঘটিয়া থাকে। আনন্দ আদায় করিবার কায়দা কিংবা আসল জায়গা না জানার গতিকে আমরা আনন্দলাভে বঞ্চিত হই প্রবঞ্চিতও মনে করি। শ্রীভগবানের নাম সম্বন্ধে প্রভু বলেন—"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্" অথচ ঐ নাম গ্রহণ করিয়াও আমি নামের

মাধুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এদিকে যেরূপ আবার রাশি রাশি তুলায় অগ্নি সংযোগ করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবন্নাম গ্রহণের প্রভাবে পুঞ্জীভূত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর অনেক কথা শাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি হেলায় শ্রদ্ধায় নাম গ্রহণ করিলেও রাশি রাশি পাপ ভস্মীভূত হইবার কথা শাস্ত্র মধ্যে বহু স্থানে পরিলক্ষিত হয়। পাপ যখন রহিল না, তখন পাপশূন্য আমাতে নামের মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকট হইবার কথা, তাহা যখন হইতেছে না, তখন ঐ মণি-মন্ত্র মহৌষধির মত একটা কোনরূপ প্রতিবন্ধ স্বীকার করিতে হয়। প্রতিবন্ধ রহি   য়া নাম করিলেই নামের প্রকৃত মাধুর্য্য আস্বাদনের বি‍ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই প্রতিবন্ধের নাম দিয়াছেন—নামাপরাধ। শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে নামের ফল অবশ্যই ফলিবে, তাহাতে সন্দেহ গন্ধও নাই, কিন্তু প্রতিবন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে ফল ফলিবে বহু বিলম্বে। আর প্রতি-বন্ধ শূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নামের ফল অচিরেই অনুভবের বিষয় হইবে।

তৃণ হৈতে সুনীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি অমানী সদা অন্যে দিবে মান॥

প্রভু আরও বলেন যে, যবনাধিকারের পূর্ব্বে রমণীমণ্ডলীর অন্তঃপুরের ব্যবস্থা এদেশে ছিল না এরূপ অনেকে বলেন, তাঁহারা যাহাই বলুন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত লইয়া তাঁহারা প্রীত থাকুন, আমরা কিন্তু আমাদের এই মনুষ্য শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই—রমণীগণের জন্য অন্তঃপুরের ব্যবস্থা দেহরচয়িতা দেহপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই করিয়াছেন। একথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সকলকেই নিজ নিজ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিব? দেখার মত দেখিলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাইব যে, আমাদের বাহিরের কার্য্যনির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়গুলি হইতেছে পুরুষ, আর ভিতরে যে দুইটির দ্বারা আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহ

হইয়া থাকে, তাহারা হইতেছে স্ত্রী জাতি। এই দুইটীর একটী হইতেছে রসনা, একটী হইতেছে বুদ্ধি। স্ত্রী-জাতি কেমন কোমল। এই জিহ্বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ব বিধাতা প্রহরিরূপে বা পরিজন রূপে বত্রিশপটি দন্তকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন; এই পরিজনগণের সাহায্যেই জিহ্বা রসাস্বাদন গ্রহণ করে এবং বাগ্‌ব্যবহারও করিয়া থাকে। জিহ্বা যদিও অন্তঃপুরের, বাহিরের সহিত তাহার খুব নিকট সম্বন্ধ। তাই তাহাকে বড় সাবধানে রাখিতে হয়। সেই নিমিত্ত শাস্ত্রে সর্বাগ্রে তাহাকে বশীভূত করিবারই ব্যবস্থা আছে—জিতং সর্বং জিতে রসে।

রসনেন্দ্রিয় জয় করিলেই সহজে সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে পারা যায়। ভগবন্নিবেদিত বিশুদ্ধ অন্ন ভিন্ন অন্য অন্ন জিহ্বাকে প্রদান করিলে তাহার হয়ত তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বভাব বিগড়াইয়া যাইবে। প্রভু বলেন—আমরা যত কিছু ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করি, করিয়া অবশেষে তাহার বৈগুণ্য নিবারণের জন্য শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া থাকি। সুবর্ণের ছিদ্র সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু দিয়া নিশ্ছিদ্র করিতে পারা যায় না। নামের আশ্রয়েই সকল ধর্ম অবস্থান করেন বলিয়া পরম ধর্ম স্বরূপ প্রভাবশালী নামের সহায়তায় সর্ববিধ ধর্মের বৈগুণ্য সমাধান হইয়া থাকে।

তুলসীমঞ্জরীর প্রতিটি দোঁহার ব্যাখ্যায় প্রভুপাদ যে অভিনব ভাব যোজনা করিয়াছেন তাহা প্রেম পরিপাক দশার, উহা সাধকের হৃদয় ভূষণ হইয়া রহিয়াছে। প্রভুপাদ গ্রন্থের শেষ বলেন—বিষয় বৈভবের জন্য নয়, মুক্তির জন্যও নয়, কেবল ভগবানেরই জন্য যে ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতাই প্রকৃত অকপট ব্যাকুলতা।

এই ব্যাকুলতায় অন্তরের ভক্তি ভাব ফুটিয়া উঠে, এ ব্যাকুলতার বিশুদ্ধ গন্ধে বিশ্ব আমোদিত হইয়া উঠে এবং এই মনোমদ গন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া মধুলুব্ধ মধুকরের মত বিশ্বেশ্বর আপনি আসিয়া জুটে। ভক্তের এই "সাঁচিলী চাহের"—বিশুদ্ধ ব্যাকুলতার জয় হউক! জয় হউক!